ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব

অনুবাদ— নির্মল দত্ত

লেখাপড়া। কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৮৭

প্রকাশক : রাখাল সেন

লেখাপড়া : ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

মুদ্রাকর : পরাণচন্দ্র ঘোষ

পরাণ প্রেস : ৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

দীপ্তির জন্য

সূচী

নিবেদন ৯
প্রথম অধ্যায় : ভারতীয় রাজনীতিতে
চরমপন্থী মতবাদ : ভাবগত পটভূমি ১৭
বিবেকানন্দ ও চরমপন্থীর আদর্শ ৩১
চরমপন্থা এবং দয়ানন্দ ৪০
দ্বিতীয় অধ্যায় : চরমপন্থার রাজনৈতিক
পটভূমি ৫৫
একটি মতবাদের সংহতি সাধনা ৬৭
তৃতীয় অধ্যায় : বঙ্গ-ভঙ্গ ৯৩
চতুর্থ অধ্যায় : সক্রিয় চরমপন্থা ১১৩
পঞ্চম অধ্যায় : মুসলীম লীগ
প্রতিষ্ঠা ১৫৯
ষষ্ঠ অধ্যায় : মর্লে-মিন্টো সংস্কার ১৭৩

নিবেদন

আজ থেকে কুড়ি বছর আগে যখন আমার *The Extremist Challenge* প্রকাশিত হয় তখন উদ্দেশ্য ছিল ১৮৯০ থেকে ১৯১০ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসকে একটু নতুন ভাবে দেখব। মানুষের জৈব, আধ্যাত্মিক ও নান্দনিক দিকগুলো, তার প্রবৃত্তি, বুদ্ধি ও কর্মের খেলা আলাদা করে দেখা যায়। সেজন্য সৃষ্টি হয়েছে নানা বিজ্ঞান (discipline) এবং এক একটার ওপর জোর দিয়ে লেখা হয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ইতিহাস। কিন্তু এভাবে খণ্ড খণ্ড করে দেখলে মানুষকে (বা সমাজকে) সমগ্রভাবে বোঝা যায় না। কোন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (রবীন্দ্রনাথ বলতেন 'জীবন দেবতার' খেয়ালে) এ সব বৈচিত্র্য মিলে মিশে মানুষের সংহত ব্যক্তিত্বের বা জাতির সজীব চরিত্রের সৃষ্টি হয়? ১৮৯০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যবর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরকম কোন ঐকতান কি বেজে উঠেছিল?

ঠিক এক বছর পরে বেরিয়েছিল অধ্যাপক অনিল শীলের *The Emergence of Indian Nationalism* এবং তার পর বন্যাস্রোতের মত কেমব্রিজ-গোষ্ঠীর অন্যান্য ঐতিহাসিক (গ্যালাহার ও শীলের শিষ্যপ্রশিষ্য) লিখিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস। তাঁদের প্রাথমিক উগ্রতা ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত *Locality, Province and Nation*-এ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলেও মূল বক্তব্য অপরিবর্তিত থেকে যায়। তাঁদের মতে, ভারতবর্ষের ইতিহাস বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থের বেসুরো আর্তনাদ। তার মধ্যে সঙ্গতি খুঁজতে চায় শুধু অজ্ঞ, রোমান্টিক, কিছু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় ঐতিহাসিক। প্রথমাবধি বৃটিশ বণিকের চোখে পড়েছিল সম্পদ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা নিয়ে প্রতি অঞ্চলে ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলেছে। এখানকার মাটিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে একাংশকে পক্ষে নিতে হবে এবং অন্য পক্ষ অবশ্যই ক্ষুব্ধ ও বিরোধী হবে। সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ এই সহযোগিতা ও বিরোধিতার ইতিহাস। ভারতীয় রাজনীতির সামান্য পটভূমিকা বা সাধারণ লক্ষ্য নেই, কোন অকৃত্রিম আদর্শবাদ নেই। শক্তিশালী ব্যক্তিত্বকে (সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ফিরোজ শা মেহ্‌তা, গোখ্‌লে, তিলক, ইত্যাদি) কেন্দ্র করে তা ঘুরেছে। আঞ্চলিক গোষ্ঠী-বিবাদ প্রসারিত হয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের সভামণ্ডপে। ক্ষমতা রক্ষা ও দখলের জন্য এক অঞ্চলের গোষ্ঠী অন্য অঞ্চলের সমস্বার্থ গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ দখলের চেষ্টা করেছে। কংগ্রেস তাই চিরদিন একটা "নড়বড়ে কোয়ালিশান" থেকে গেছে। ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র জয়পরাজয়, নতুন চক্র গঠন—এই হ'ল জাতীয়তাবাদের ইতিহাস। এর মধ্যে কোন ইডিওলজির, কোন আদর্শবাদের স্থান নেই। ১৯৭৩ সালে শীল লিখেছিলেন, "Ideology provides a good tool for fine carving, but it does not make big buildings."

দেশ কংগ্রেস শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯০৭)' প্রবন্ধে দেখিয়েছি কি পরিস্থিতিতে কেমব্রিজ গোষ্ঠীর মতবাদ নেমিয়ার দর্শন অবলম্বন করেছিল। সমকালীন পূর্ব ইউরোপের জাতীয়তাবাদের ছকে সব দেশের জাতীয়তাবাদকে ফেলে নেমিয়ার বলেছিলেন, জাতীয়তাবাদ মাত্রই যুক্তি-বিবর্জিত, আবেগপ্রবণ ও নৈরাজ্যপ্রসূ। তেমনি অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের রাজনীতির ছকে সবদেশের সবকালের রাজনীতিকে ফেলে (এখানে তাঁর গুরু ইতালীর সমাজতাত্ত্বিক পেরেটোর প্রভাব পড়েছে) তিনি ঘোষণা করেছিলেন, রাজনীতি (elite) শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোষ্ঠীর স্বার্থসংঘাত মাত্র, পৃষ্ঠপোষক (patron) ও অনুগৃহীত (client) এর লেনদেনের খেলা। রাজনীতির উদ্দেশ্য ক্ষমতা রক্ষা ও বৃদ্ধি, বৃহত্তর বা মহত্তর কিছু নয়। এই হবসীয় সমাজে, ডারুইনীয় অস্তিত্ব-সংগ্রামে আদর্শবাদের স্থান নেই। আদর্শবাদের মুখোশের তলায়, বৈপ্লবিক উগ্রতার আড়ালে চলে ব্যক্তি ও দলের সুবিধাবাদী সমঝোতা। "Idealism and idealist are misnomers...when bestowed merely because self-interest or ambition is not writ large on the surface."

হার্বার্ট বাটারফিলড্, ক্রিষ্টোফার হিল, ই· এইচ· কার প্রভৃতি ঐতিহাসিক নেমিয়ারের ইতিহাস-দর্শন ও তৎপ্রসূত নৈরাশ্যবাদী সিদ্ধান্ত মানেননি। *The Extremist Challenge* ছিল এ ধরনের নঙর্থক দর্শনের প্রতিবাদ। ভাগ্যক্রমে তা কেমব্রিজ-গোষ্ঠীর ইতিহাসেরও প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়াল। একাধারে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক, 'চরমপন্থী' নামধেয় একটা ভাবনার আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ এই গ্রন্থ। সে ভাবনা প্রায় দুই দশক ধরে ভারতবর্ষের বহু নেতাকে আচ্ছন্ন করেছিল, প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছিল বিরোধী নেতাদের মধ্যে, গভীর আলোড়ন তুলেছিল জনমানসে, প্রকাশিত হয়েছিল নতুন এক ধরনের রাজনৈতিক রচনায় ও কর্মকাণ্ডে। ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর, তার ওপর আবার ঔপনিবেশিক শাসনপ্রসূত অর্থনৈতিক দুঃখদুর্দশার প্রভাব পড়েছিল। ১৮৫৮ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরবর্তী সাংস্কৃতিক জীবনের আমূল পট পরিবর্তনের ফলে জটিল হয়েছিল তার প্রবাহ।

ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণের ফল সুখকর হয়নি কিন্তু সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। গান্ধী ও গান্ধী-বিরোধী উভয় মতবাদই তাকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। গান্ধীর চিন্তায় তিলক ও অরবিন্দ যে ছাপ ফেলে গেছেন তা গোখ্‌লের চেয়ে বেশী বই কম নয়। মূল্যবোধের দিক থেকে তাঁর অসহযোগ আন্দোলন ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ভিন্ন গোত্রের—কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে স্বদেশী আন্দোলনের কার্যক্রম গান্ধীও গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধী-বিরোধী বৈপ্লবিক চিন্তা ত' আরো গভীর ভাবে চরমপন্থার কাছে ঋণী। চরমপন্থা জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা। তারপর আর সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংগ্রাম ছাড়া উপায় ছিল না।

প্রথম অধ্যায়ে এই ভাবনার আদর্শগত পটভূমিকা বর্ণিত হয়েছে। তা রচনা করেছিলেন তিনজন বিরাট পুরুষ—বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ। রামমোহন থেকে বঙ্কিমের পূর্ববর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত শিক্ষিত ভারতীয়গণ বৃটিশ শাসক তথা পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে একটা সহযোগিতা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অস্পষ্টভাবে হলেও তাঁরা বুঝেছিলেন ঔপনিবেশিক পরিবেশে পশ্চিমী ধাঁচের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নীলকরদের স্বাগত জানিয়ে পরে তাদের সম্ভাব্য অত্যাচারের প্রতিবিধানকল্পে রামমোহনকে মানবের প্রকৃতিদত্ত অধিকার,

প্রশাসন ও বিচার বিভাগ বিভাজন, প্রেস স্বাধীনতা ইত্যাদি দাবী করতে হয়েছিল। দ্বারকানাথ ১৮৩০-৩৩-এর এজেন্সি হাউসের সংকট দেশীয় ধনতান্ত্রিক বিকাশের কাজে লাগাতে গিয়ে য়ুনিয়ান ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানীর বিপদ ডেকে আনেন। তবু তাঁরা বুঝেছিলেন ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক প্রগতির পূর্ব সর্তরূপে অনুকূল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা রচনা করতে হবে। নিছক দেশীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করলে তা হবে না। আধুনিকীকরণের কাজে তাঁরা পশ্চিমী সংস্কৃতি ও দেশীয় ঐতিহ্যের প্রয়োজনীয় কিছু কিছু অংশ বেছে নিয়ে মেলাতে চেয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে সবকিছুর জন্য দায়ী করার তীব্র বাসনায় অনেক বামপন্থী ঐতিহাসিক এঁদের ভুল বুঝেছেন। তাঁরা ভেবে দেখেননি ১৮৩০-এর নীলকর ও নীলদর্পণেব নীলকর একই রকম অত্যাচারী ছিল না।

রামমোহন বেছে নিয়েছিলেন বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ, খৃস্টীয় নীতিবোধ ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষা। উপনিষদের বিশ্বজনীন, যুক্তিবাদী ও মানবিক ধ্যানধারণার সঙ্গে তিনি মিশিয়েছিলেন লক, মঁতেস্কু ও বেন্থামের চিন্তাধারা। এ বেদান্তের সঙ্গে শঙ্কর ভাষ্যের অমিল লক্ষণীয়। রামমোহনপ্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম সন্ন্যাসের ওপর জোর না দিয়ে ইহলৌকিক জীবনচর্যাকে গুরুত্ব দিয়েছিল, মায়াকে অলীক না বলে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রকৃতি (nature) রূপে ব্যাখ্যা করেছিল, শুধু শুষ্ক জ্ঞানমার্গকে প্রাধান্য না দিয়ে জ্ঞানাশ্রিতা ভক্তি-অনুপ্রাণিত জীবনচর্যার ওপর ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এ সব করতে গিয়ে তিনি তান্ত্রিক একেশ্বরবাদ, মুসলিম মুয়াহিদিন তত্ত্ব, খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদ থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের সন্তান তিনি, তাই যুক্তিবাদ, এম্পিরিসিজম, এমনকি কাণ্ডজ্ঞান (Common Sense)-কেও বাদ দেননি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন ধর্মের ব্যক্তিগত লক্ষ্য 'মোক্ষ' হলেও তার সামাজিক লক্ষ্য—"রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখ।"

এত অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তিনি একদিকে গোঁড়া হিন্দু ধর্ম অন্যদিকে গোঁড়া খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সতীদাহ, মূর্তিপূজা, অবতার, জাতিপ্রথার মতই ত্রিত্ববাদ ও ব্যাপটিষ্ট কর্মকাণ্ড তাঁর শাণিত যুক্তির আস্বাদ পেয়েছিল। খোলা মনে খোলা হাওয়া লাগাতে চেয়েছিলেন বলেই এরাসমাসের মত বেদান্ত সূত্র ও উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন তিনি, আধুনিক বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের সাহায্যে বর্তমান দুরবস্থা অপনোদন করতে হবে বলেই বেকনের বাগ্মিতা নিয়ে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। আবার হিন্দু কলেজ প্রবর্তিত ধর্মহীন শিক্ষাও তিনি চাননি। যাঁরা তাঁকে আধুনিক সেক্যুলারিজমের জনক বলতে চান, তাঁরা ভুলে যান যে 'বেদান্ত প্রতিপাদিত সত্যধর্ম' ছিল তাঁর সব কর্মের কেন্দ্রে।

এত বিচার ও বিতর্কের মধ্যে আমরা যুগবদলের পালা লক্ষ্য করি। দেখতে পাই নিছক অধ্যাত্মচর্চা বা নিছক দেশাচার পালন ছেড়ে ভারত ব্যক্তি ও সমাজের উৎকর্ষ চাইছে। রাজনীতির ব্যাপারটা অত সহজবোধ্য নয়। বৃটিশ শাসনকে রামমোহন ঈশ্বরাদিষ্ট (Providential) মনে করতেন বটে কিন্তু চিরন্তন মনে করেননি। যতদিন তা মানবে ভারতীয়দের প্রকৃতিদত্ত অধিকার (অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রকাশ স্বাধীনতা, কোম্পানীর বিরুদ্ধে জমিদারের ও জমিদারের বিরুদ্ধে রায়তদের অধিকার, স্ত্রী জাতির সম্পত্তিতে অধিকার), তার অস্তিত্ব ততদিনই। দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব (১৮৩০) এবং ওয়েনপন্থী ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের প্রভাব তাঁর ওপর অল্পবিস্তর পড়েছিল। অসংখ্য অভিনব পরিবর্তনের আবর্তেও তিনি স্থৈর্য হারাননি, কারণ তাঁর সংস্কৃতির মূল ছিল দেশের মাটিতে প্রোথিত।

ডিরোজিয়োর বহু শিষ্য কিন্তু স্থৈর্য হারিয়েছিলেন এবং ঝুঁকে পড়েছিলেন বিপ্লবী ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর রোমান্টিক ব্যক্তিবাদের দিকে, হিউমের সংশয়বাদের দিকে, রুশো ও পেইনের সাম্যভাবনার (egalitarianism) দিকে। হিন্দুশাস্ত্র তাঁদের চোখে অযৌক্তিক ও যুগধর্মবিরোধী, হিন্দু দেবদেবী—অধঃপতিত অতীতের প্রতীক, হিন্দু নীতি ও আচার—অমানবিক বা অবান্তর। ডিরোজিয়োর ব্যক্তিগত নৈতিক আদর্শ উচ্চ হলেও ভাষাজ্ঞানের অভাবে ও সংশয়বাদের প্রভাবে ভারতীয় নীতির ভিত্তি (ধর্ম ও দর্শন) গুরু বা শিষ্য কারুরই বোধগম্য হয়নি। উত্তরাধিকার সূত্রে যে ভাবধারা তাঁরা পেয়েছিলেন তার সঙ্গে পশ্চিম থেকে আমদানী করা ভাবধারার তুলনা করা সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে, তাই বিচার করে কোনটা শ্রেষ্ঠ, কি কি মেশাতে হবে, তা বোঝা সম্ভব হয়নি। জন্মে হিন্দু কিন্তু শিক্ষায় আধা সাহেব, যুক্তিবাদ ও সংশয়বাদের দ্বন্দ্বে দোলাচল, পরিবার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিপরীত টানে পঙ্গু, দেশের রাজনীতিতে অবহেলিত ও অর্থনীতিতে অপাংক্তেয়, বিদ্রোহী এই তরুণের দল মূলহীনতার প্রতিক্রিয়ায়, বিচ্ছিন্নতাবোধের দুঃখে আশ্রয় নিলেন পশ্চিমের বাহ্যিক অনুকরণে—গোমাংস ভোজনে ও সুরাপানে, আক্রমণাত্মক বিতর্ক ও রচনায়, পরস্পর বিরোধী আচরণে ও শেষে করুণ আত্মকৃপায়। পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে ত্রিশঙ্কু এই দল উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারেনি।

তবে কারো কারো চোখে বৃটিশ শাসনের শোষক রূপ প্রতিভাত হচ্ছিল। কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য, নীলকরদের অত্যাচার বৃদ্ধি, প্রশাসনে শ্বেতাঙ্গদের প্রাধান্য, ধনশোষণ ও করভার বৃদ্ধি, আইনের একদেশদর্শিতা ও বিচারের ব্যয়বাহুল্য তাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। রায়তদের অধিকার, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন, সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে সোচ্চার ছিলেন কয়েকজন। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল হলেও কাজের ক্ষেত্রে এঁদের সাহস ছিল না। প্রদর্শমূলক উগ্রতায় রক্ষণশীলদের অনেককে এঁরা প্রতিক্রিয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। এঁদের আশাভঙ্গজনিত "আত্মবিলাপ" শুনি ইয়ং বেঙ্গলের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ মধুসূদন দত্তর কণ্ঠে, তাঁর হাতে দেখি "একেই কি বলে সভ্যতা ?"র তীব্র কশা। "মেঘনাদবধকাব্যে"র নায়ক রাবণের বিদ্রোহ মধুসূদনের প্রজন্মের বিদ্রোহের মতই আড়ম্বরে আরম্ভ হলেও আর্তনাদে শেষ হয়েছিল।

অ্যালবিয়নের মোহিনী কণ্ঠে মুগ্ধ, ঘরছাড়া তরুণের দল একদিন প্রবীণ হ'ল, আপন ঘরে ফিরতে চাইল। তারা দেখল মফঃস্বলের দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত শিক্ষিত বিদ্যাসাগর, শুধু অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্ব দ্বারা ঐতিহ্যকে কত সার্থক ভাবে আধুনিকীকরণের কাজে লাগিয়েছেন। আপন সংস্কৃত শিক্ষাকে তিনি বাতিল দেশাচার সমর্থনে নিযুক্ত করেননি। তাকে সহজ করে, তার সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের বিশ্ববীক্ষার সুর লাগিয়ে, বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন। সমাজ সংস্কারের জন্য তিনি নির্ভর করেননি পশ্চিমী যুক্তিবাদ বা বেন্থামী প্রয়োগবাদের ওপর। পরাশর সংহিতায় খাঁটি ঐতিহ্য আবিষ্কার করে, তাকে সমাজতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও মানবতাবাদ দ্বারা পরিশীলিত করে, আধুনিক প্রচার মধ্যমের সাহায্যে ব্যাপক করে, একদিকে গোঁড়া হিন্দুদের নিরস্ত করেছেন, অন্যদিকে নিশ্চেষ্ট সরকারকে বিধবা বিবাহ আইন চালু করতে বাধ্য করেছেন। তাঁর দৃষ্টান্ত দেখার পর উদারপন্থী হিন্দুরা আর হীনমন্যতায় ভোগেননি—তার প্রমাণ পশ্চিম ভারতের রানাডে ও গোখ্‌লে।

সাংখ্য ও বেদান্তের আদর্শবাদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি, যেমন জাপানী বুদ্ধিজীবীরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বিশুদ্ধ কনফুসীয়বাদ। কেউ কেউ বলেন ঈশ্বরকেও। তাঁর উচ্চ

শিক্ষাক্রমে প্রাধান্য পেয়েছিল ইংরেজী ভাষা, অঙ্ক, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইতিহাস। স্ত্রীলোক সহ জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষ নিয়ে তিনি লড়াই চালিয়েছিলেন সরকারের সঙ্গে এবং শুধু কর্মোন্নতি নয়, প্রাপ্ত পদমর্যাদা বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেননি। মধুসূদনের করুণ পরিণতির মত কর্তৃপক্ষের চাপে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ মধ্যবিত্ত সহযোগিতার নীতিতে বড় ফাটল ধরিয়েছিল। তবু নিজের প্রশস্ত স্কন্ধে তিনি তুলে নিয়েছিলেন অসমাপ্ত জনশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের দুরূহ ভার। স্বাবলম্বনই স্বরাজের প্রথম সোপান সে কথা দেখিয়ে গেছেন এই বীর ব্রাহ্মণ। তাঁর একক ও সর্বস্বপণ সংগ্রাম জাতীয়তাবাদকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

(২)

দু'বছরের সিপাহী বিদ্রোহের আগুনে জ্বলে গেল প্রবল প্রতাপান্বিত কোম্পানীর রাজত্ব। ধোঁয়া সরলে দেখা গেল বৃটিশ রাজের আমলে শাসনের বাতাবরণ বদলে গেছে। জন স্টুয়ার্ট মিলের উদার গণতান্ত্রিক দর্শন বর্জন করে নতুন শাসককুল নিয়েছেন ফিট্জেমস ষ্টিফেন, জন ষ্ট্রেচি ও হারবার্ট রিজলের জাতিবৈরপ্রণোদিত, সাম্রাজ্যবাদী, স্বৈরতন্ত্রী দর্শন। আধুনিকতার মাধ্যম—রেলপথ, কৃষিবাণিজ্যায়ন, মুক্ত বহির্বাণিজ্য ও দক্ষ প্রশাসন—বৈদেশিক ধনতন্ত্রের আওতায় ব্যাপকতর শোষণের যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য শিক্ষিত ও দেশী ভাষায় শিক্ষিত উভয় দলই প্রতিবাদ করেছিল। তাদের মুখে দৃপ্ত ভাষা দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। হিন্দু ঐতিহ্য ও পশ্চিমী দর্শন থেকে সুনির্বাচিত উপাদান নিয়ে জাতীয়তাবাদের নয়া ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তিনি। তা আচার-সর্বস্ব পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম নয়, কেশবচন্দ্র সেনের খৃষ্টঘেঁষা ও রামকৃষ্ণ থেকে ধার করা জগাখিচুড়ি নয়, এমনকি রামমোহনের বৈদান্তিক সমন্বয়ও নয়। তার উৎস মিল, কোঁৎ ও স্পেন্সারের মানবধর্ম কিন্তু পরিণত রূপ মহাভারত, গীতা ও ভাগবতের ভক্তিবাদ দ্বারা পরিশীলিত অনুশীলন ধর্ম। তার কেন্দ্রগত চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মনুষ্যজন্ম ধারণ করে, মানুষের সকল বৃত্তি সম্যক অনুশীলন করে, তাকে 'মনুষ্যে প্রীতির' জন্য উৎসর্গ করে, ঈশ্বরত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অতিমানব অর্থেই তিনি অবতার।

এখান থেকে আমাদের গ্রন্থের সুরু। প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছি চরমপন্থী চিন্তা কোথায় বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দের কাছে ঋণী, আবার কোথায় তাদের মৌলিক পার্থক্য। দয়ানন্দর অবদান স্বতন্ত্র, কারণ তাঁর আর্যভাবনা পশ্চিমের আমদানী সব কিছু ম্লেচ্ছ বলে বর্জন করেছিল, এমনকি দেশীয় ঐতিহ্যের বেদোত্তর পর্বকেও। এই অবাস্তব উচ্চমন্যতার সঙ্গে তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল মিশিয়েছিলেন তান্ত্রিক-পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আবেগ (গণপতি পূজা, শক্তি পূজা), বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র ও কৃষ্ণ চরিত্রের আদর্শ, বিবেকানন্দের জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও ওঠবার, জাগবার, আত্মবলি দেবার অভয় আহ্বান। 'আনন্দমঠ'-এ সত্যানন্দের গুরু পশ্চিমী জ্ঞান বিজ্ঞানকে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বিদ্যার পরিপূরক মনে করতেন। বিবেকানন্দের বৈদান্তিক ভাবনায় পূর্বাপরের আত্যন্তিক ভেদ ছিল না। তিনি একের সত্ত্বের সঙ্গে অন্যের রজঃকে মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী সকলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আনতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে চরমপন্থীদের মধ্যে উদারতা লক্ষ্য করি না। দয়ানন্দকে অনুসরণ করে অরবিন্দ জড়বাদী, ভোগবাদী, ইহ-সর্বস্ব পশ্চিমী সভ্যতাকে তার যন্ত্র বিজ্ঞান সহ বিসর্জন দিয়েছিলেন। বরং স্বাধীন ভারতই একদিন পশ্চিমকে মহতী বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করবে এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল। এ যেন সুরাসুরের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি। ইংরেজরা

অবশ্যই অসুর। এ ধরনের messianic দৃষ্টিভঙ্গী শুধু চরমপন্থীদের মধ্যে দেখি না, উনিশ শতকের জার্মান রোম্যান্টিক, রুশ স্লাভোফিল ও পশ্চিমী ক্লেন্টিক আন্দোলনে দেখি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে চরমপন্থার রাজনৈতিক পটভূমিকা—যার এক রূপ নরমপন্থার পরমুখাপেক্ষিতা, অন্যরূপ তদীয় কর্মসূচীর শোচনীয় বিফলতা। এডমাণ্ড বার্কের রাজনৈতিক দর্শন ও পার্লামেন্টারী মডেলের প্রতি আনুগত্যে এবং ইংরাজের ন্যায়নিষ্ঠায় অন্ধ বিশ্বাসে প্রতিফলিত হয়েছিল নরমপন্থীদের শিক্ষা ও বৃত্তির স্বভাব, তাঁদের শ্রেণীর স্বার্থ। তাঁদের আদর্শ উঠে এসেছিল ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইতালীর ইতিহাসের পাতা থেকে—পিম্, হ্যামপডেন, মাৎসিনি রূপে। কিন্তু যে মাৎসিনি কার্বোনারির প্রেরণা, সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পক্ষশাতন করেছিলেন। 'নতুন দল' এ সব মডেল বিজাতীয়, তাই বর্জনীয়, মনে করলেন। তাঁরা বেছেছিলেন স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে শ্রীকৃষ্ণকে, যাঁর লক্ষ্য ছিল এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতকে বেঁধে মহাভারত সৃষ্টি, আর সে লক্ষ্য ভেদের জন্য হিংসা অহিংসা, সৎ অসৎ উপায় ভেদ যিনি করেননি। এখানেই চরমপন্থীদের নিজস্ব গীতাভাষ্যের তাৎপর্য নিহিত। আত্মীয় বধও তাতে সমর্থনীয় আর যুদ্ধে জীবনদান স্বর্গ প্রাপ্তির সোপান। ইতিহাস থেকে তাঁরা বেছে নিলেন শিবাজীকে। তিলক প্রবর্তিত শিবাজী-উৎসব শুধু মহারাষ্ট্র নয়, সমগ্র ভারতকে অনুপ্রাণিত করল।

এঁদের সুবিধে করে দিলেন রিপনের পরবর্তী বড়লাটরা, বিশেষতঃ কার্জন, তাঁদের নানা ভারতীয় স্বার্থ বিরোধী আইন ও অনুশাসনদ্বারা। ন্যূনতম দাবী আদায়ে ব্যর্থকাম নরমপন্থীর কর্মসূচীকে ব্যঙ্গ করলেন বঙ্কিম 'আবেদন, নিবেদন, প্রতিবেদনে'র রাজনীতি বলে, এমনকি 'সারমেয়' নীতি বলে। অরবিন্দের দল 'ব্যানার্জি-বনার্জি-ঘোষের' কংগ্রেসকে 'বিজাতীয়' আখ্যা দিল। তার সঙ্গে সুর মেলালেন মহারাষ্ট্রের তিলক। ১৮৯০ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে কি ভাবে চরম পন্থার ইডিওলজি দানা বাঁধল আঞ্চলিক ভিত্তিতে তা বর্ণিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মের নয়া ব্যাখ্যার জোর বাড়িয়েছিল ইতিহাসের নয়া ব্যাখ্যা। তথ্য বা ন্যায়-বিরোধী, এমন কি মিথ, হলেও তার মনস্তাত্ত্বিক মূল্য অবিসংবাদিত।

তৃতীয় অধ্যায়ের উপজীব্য—বঙ্গভঙ্গ। উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে সরকারী চিঠিপত্র বিশ্লেষণ করে আমি দেখিয়েছি কি ভাবে দীর্ঘকাল ধরে আমলাতন্ত্রের মনে বাঙালী বিদ্বেষ গড়ে উঠছিল এবং প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইংরেজবিদ্বেষ বাঙালীর মনে। কার্জন বাংলাভাগের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করে এতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে এ পরিকল্পনা আপন মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভাবন করেননি, শুধু পূর্বতন নানা পরিকল্পনাকে একটা সংহত, ব্যাপক ও সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়েছিলেন, এটা আমাদের জানা দরকার। তাঁর দায়িত্বের চেয়ে রিজলে, ফ্রেজার, ফুলার প্রভৃতি আমলার দায়িত্ব কম নয়। কার্জনের ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে আমিই প্রথম সে কাহিনী লিখি।

চতুর্থ অধ্যায়ে চরমপন্থীদের কার্যকলাপ, যাকে আমরা বাংলায় 'স্বদেশী আন্দোলন' আখ্যা দিয়েছি, ও তার শেষ বিস্ফোরণ—সন্ত্রাসবাদ—এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে। নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' ব্যাখ্যার গুণগত পার্থক্য দেখান হয়েছে। চরমপন্থীদের কাছে এ সব ছিল আত্মিক স্বনির্ভরতার পরীক্ষা, যা কিনা স্বরাজের পূর্বসর্ত। অরবিন্দ ক্রমশঃ মুখ্যভূমিকা নিচ্ছিলেন। তাই অরবিন্দের রচনা থেকে ব্যাপক উদ্ধৃতি সহযোগে তাঁর নিজস্ব মতামত ও তিলক এবং পাল থেকে তাঁর ক্রমবর্ধমান দূরত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিতর্ক চরমপন্থী দর্শনও ক্রিয়াকলাপের ওপর আলোক ফেলেছে বলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা রয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সীমিত সাফল্য, ত্রুটি ও

আপাতপরাজয়ের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে নানা পরিসংখ্যানের সাহায্য নিয়েছি। তার নির্দেশিকা গ্রন্থ শেষে কয়েকটি সারণীতে বিধৃত। সন্ত্রাসবাদের মূল্যায়নে অধ্যায় শেষ হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, মুসলিম এলিট ও জনসাধারণের ওপর আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া। এইখানে দুই স্তরের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়—(১) উপরের স্তরের সাম্প্রদায়িকতা, যা রূপ পেয়েছে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায়—এবং (২) নীচের তলার সাম্প্রদায়িকতা—যা হিন্দু জমিদার, নায়েব, মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে এক ধরনেব বিদ্রোহ। প্রধানত হিন্দুরা স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক ছিল বলে মুসলিম জমিদার ও পাট চাষে ধনী জোতদাররা তাতে যোগ দেয়নি। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ তার ফল। ইংরেজরা এতে প্রচ্ছন্ন মদৎ দিয়েছিল। তার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। মিন্টো ও মর্লের চিঠিপত্র থেকে সিমলা বৈঠকের কাহিনী রচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূল বিষয়—মর্লে মিন্টো সংস্কার। মিন্টো শুধু মুসলমানদেরই স্বদেশী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি, নরমপন্থীদেরও পক্ষে আনতে চেয়েছিলেন। মুশকিল হল, নরমপন্থী বলতে মর্লে বুঝতেন গোখ্‌লে ও সুরেন্দ্রনাথকে আর মিন্টো বুঝতেন দ্বারভাঙা-গিধৌড়ের মহারাজাদের। কলকাতা ও সুরাট কংগ্রেসের বিস্তৃত বিবরণ সহকারে নরম ও চরমপন্থীর ক্রমবর্ধমান বিভেদ ও শেষে সুরাটে সংঘর্ষের কারণ বিশ্লেষণ করেছি। সংস্কারের প্রস্তাবনা থেকে ১৯০৯ সালে আইন প্রণয়ন পর্যন্ত প্রতি পর্ব ও তার পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি কি ভাবে মুসলিম নেতারা পৃথক ভোটাধিকার অর্জন করেছিলেন। মর্লের দ্বিধাগ্রস্ত উদারপন্থা পর্যুদস্ত হয়েছিল মুসলিম নেতাদের চাপে, কিন্তু তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন মিন্টো ও আমলাতন্ত্র। সন্ত্রাসবাদের পূর্ণ সুযোগ নেন মিন্টো এবং সংস্কার শেষ পর্যন্ত প্রহসনে পরিণত হয়। এর ফল ভাল হয়নি। প্রথমত সরকারেব প্রতি নরমপন্থীদের বিশ্বাস টলে গিয়েছিল, দ্বিতীয়ত অত্যধিক ও অন্যায় অধিকার মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের ভিত্তি শক্ত করেছিল। বলতে গেলে সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার প্রথাই দেশভাগের বীজসন্ধি।

এ গ্রন্থে বহু বিচিত্র উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বড়লাট ও ভারতসচিবের চিঠিপত্র, ভারতীয় নেতাদের চিঠিপত্র ও রচনা, বিভিন্ন সরকারী বিভাগের প্রোসিডিংস, গোয়েন্দা বিভাগের কাগজপত্র (বিশেষত বাংলার গোয়েন্দা বিভাগের), আমদানী রপ্তানীর পরিসংখ্যান, দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির হিসাব, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিস্তার ও প্রকৃতি, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবীর তালিকা ও অপরাধীর শ্রেণী বিভাগ বই-এর মধ্যে, না হয় শেষে সারণীতে, উপস্থাপিত হয়েছে। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী (এখন বৃটিশ লাইব্রেরীর অঙ্গ), বৃটিশ ম্যুজিয়াম, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগার, ভারতের জাতীয় অভিলেখাগার এবং লর্ড সিন্‌হা রোডের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ তাঁদের হেফাজতে রক্ষিত অমূল্য দলিলাদি দেখতে দিয়ে আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এই গ্রন্থের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন সেন্টপল্‌স্ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক, আমার অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র—শ্রী নির্মল দত্ত। যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে তিনি এ কাজ সম্পন্ন করেছেন তার তুলনা নেই। প্রয়োজনে আমি পরিমার্জনা ও পরিবর্ধন করেছি। এ গ্রন্থকে ***The Extremist Challenge***-এর আক্ষরিক অনুবাদ বলা উচিত হবে না। আবার সম্পূর্ণ ভাবানুবাদও নয়। পাঠকের সুবিধার্থে কোথাও ভাব সম্প্রসারণ করা হয়েছে, কোথাও

বা সংক্ষিপ্ত। দীর্ঘদিনের পঠন-পাঠনের ছাপ পড়েছে গ্রন্থে। অনেক নতুন উপাদানও ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য ভাষাকে কিঞ্চিৎ গুরুগম্ভীর করা হল। আশা করি সহৃদয় পাঠক তা গ্রহণ করবেন। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশনার ভার নিতে সম্মত হওয়ার জন্য শ্রী অভীক সরকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর যোগ্য প্রতিনিধি শ্রীবাদল বসু প্রথমাবধি মুদ্রণ ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থায় যে যত্ন নিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এশিয়াটিক সোসাইটি

অমলেশ ত্রিপাঠী

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থী মতবাদ : ভাবগত পটভূমি

ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে চরমপন্থী মতবাদের সঙ্গে টয়েনবী কথিত 'আর্কেইজম্'-এর সাদৃশ্য বিস্ময়কর। উনবিংশ শতকে এ দেশের জাতীয় জীবন, চিন্তা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে প্রতীচ্যের যে বাহ্যিক এবং ব্যর্থ অনুকরণ ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছিল (ইতিপূর্বে এক সুষম-সমন্বয়ের দ্বারা তার প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন রামমোহন) তার প্রতিক্রিয়া রূপে চরমপন্থার অভ্যুদয়। প্রতিরোধের এই আন্দোলন তিনটি সুস্পষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্ম ও উপযোগিতাবাদ এবং তদ্দারা প্রভাবিত ব্রাহ্ম ধর্ম প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক জীবন ও ঐতিহ্য-সম্বিত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে আচ্ছন্ন করছিল। চরমপন্থীরা তা মেনে নেননি। দ্বিতীয়ত, যে যান্ত্রিক এবং ভোগবাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বিদেশ থেকে এসে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করতে উদ্যত হয়েছিল তাকে এঁরা ঠেকাতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, অসংখ্য বিষম উপাদানে গড়ে ওঠা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে জাতীয় সত্তার নিশ্চিত অবলুপ্তির পথ রোধ করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন চরমপন্থীরা। অক্ষম ভারতীয় জনগণের দায়িত্ববহনের তত্ত্ব সাড়ম্বরে প্রচার করলেও ইংরেজরা যে আসলে ঔপনিবেশিক শোষণের দুঃসহ বোঝা তাদেরই কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে—এ নগ্ন সত্যটা বুঝতে চরমপন্থীদের দেরী হয়নি।

কিন্তু ঘড়ির দোলক যেমন অনিবার্য গতিতে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সঞ্চরণ করে, তেমনি পাশ্চাত্যের নিষ্ফল অনুকরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে চরমপন্থা প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল সনাতন ভারতীয় ধ্যানধারণার প্রায়-নির্বিচার অনুকরণে। সব হারানোর ভয় থেকে জন্ম নিয়েছিল বলেই হয়তো তার মেজাজ ও ভাষা এতো আক্রমণোদ্যত। নরমপন্থীদের প্রকট হীনমন্যতা চরমপন্থীদের মধ্যে যে বিরূপতার সৃষ্টি করেছিল তা ক্রমশ অস্বাস্থ্যকর উচ্চমন্যতায় পরিণত হয়। ধর্ম ও রাজনীতির ব্যাপারে মুক্ত ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিহার করায় তাঁরা অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ ও অতীতের প্রতি রোমান্টিক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ইংরেজী শিক্ষাসঞ্জাত ও ইংরেজ-সৃষ্ট বিধি বিধানের দ্বারা পুষ্ট' উনবিংশ শতকের দুটি মহামূল্যবান অবদান—ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও উদারনীতির প্রতি বিমুখ হয়ে চরমপন্থীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সমষ্টি-নির্ভর আদর্শের মধ্যে। তাঁদের প্রায় সবাইকেই তাই ভারতীয় ইতিবৃত্তের স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা করতে দেখি ; প্রায় সকলেই লিপ্ত ছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের অতিরঞ্জনে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মোহিনী-মায়া ছিন্ন করা এঁদের সকলের কাছেই যেন একটা পবিত্র কর্তব্য হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' প্রকাশিত হবার পর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় শ্রীকৃষ্ণই হয়ে ওঠেন চরমপন্থী মাত্রেরই আদর্শ পুরুষ। তিলক রচনা করলেন গীতার মারাঠী ভাষ্য— 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতারহস্য', অরবিন্দ তৎপর হলেন গীতার দীর্ঘভূমিকা লিখতে এবং

লাজপৎ রায়কেও দেখা গেল উর্দু ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী-প্রণয়নে। এই সময়েই ভাগবত ধর্মের মূল বিষয়বস্তু—ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা লিখতে শুরু করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম হিসেবে সুখ্যাত বিপিনচন্দ্র পাল বিজয় গোস্বামী প্রচারিত 'নব বৈষ্ণবীয় তত্ত্বে' প্রভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে 'ভারত-আত্মা' রূপে বরণ করতেও দ্বিধা করেননি।[২] এমনকি ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখে ফেললেন—'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব'।

চরমপন্থীরা অবশ্য নিকট অতীতেরও শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত বিরচিত 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' প্রকাশিত হওয়ার (১৮৭৮) দুই দশকের মধ্যে ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতিচারণের অস্ফুট গুঞ্জন পরিণত হয় দেশব্যাপী শিবাজী-উৎসব পালনের সমারোহে। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। এই নবমূল্যায়ন পূর্ণতা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় (১৯০৪)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে প্রায় পুরো উনিশ শতক জুড়ে পশ্চিমী ভারতবিদ্‌গণ এ দেশের সুপ্রাচীন ও গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[৩] কিন্তু চরমপন্থীরা তারও উপরে উঠে দেশমাতাকে জগজ্জননী দুর্গার সঙ্গে একাসনে বসালেন। 'কেল্টিক' পুনরুজ্জীবনবাদ, জার্মানি রোমান্টিক আন্দোলন অথবা স্লাভ-প্রেমী আন্দোলনের মতো বাস্তববিমুখ পলায়নী মনোবৃত্তি চরমপন্থী আদর্শের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিগত শতকের শেষ লগ্নে ভারতীয় জীবনে ঔপনিবেশিক শোষণ ও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব যে আবর্ত সৃষ্টি করেছিল বা ইউরোপের প্রযুক্তি বিদ্যার অসামান্য সাফল্য ও সামরিক শক্তির প্রচণ্ডতা যে অসহায় মনোভাব সৃষ্টি করেছিল, হয়তো-বা তার থেকে ত্রাণ পাবার জন্যই অতীতের গর্ভে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন চরমপন্থীরা। এ দেশের শিক্ষিতদের বাল-সুলভ ইংরেজ-বিশ্বাস ও নবলব্ধ গৌরববোধ শাসককুলের অবজ্ঞা বা করুণা-মিশ্রিত অহমিকার বর্মে বারবার প্রতিহত হচ্ছিল। তাই পার্থিব সম্পদে 'দীনা' কিন্তু আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে মহিমময়ী দেশমাতৃকার শরণাগত হয়ে তাঁরা পাশ্চাত্যের এই আক্রমণের প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। তবে শুধুমাত্র এই কারণে চরমপন্থীদের অবিমিশ্র পুনরুজ্জীবনবাদী হিসেবে চিত্রিত করা অসমীচীন হবে। শেষোক্তদের মতো তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহিরঙ্গের নির্বিচার পুনঃপ্রবর্তনে তৎপর হননি। হিন্দু সংস্কৃতির অন্তর্লীন আধ্যাত্মিকতার পুনরুদ্ধার এবং তার দ্বারা নবজাগ্রত ভারতবর্ষের জীবন সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করাতেই তাঁরা উৎসাহী হয়েছিলেন।

ইউরোপের অধিকাংশ পণ্ডিত (এঁদের তালিকায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন চার্লস হিমেসাথ (Charles Himesath)[৪] এবং ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কৃতির মধ্যে ধর্মীয় (হিন্দু) পুনরুজ্জীবনবাদ এবং চরমপন্থী রাজনৈতিক আদর্শের উৎস আবিষ্কার করেছেন।[৫] বিজাতীয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের অনুকৃতি বর্জন, দেশজ ধ্যান-ধারণার মধ্যে জাতীয়তাবাদের মূল অন্বেষণ, সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনকে জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক সোপান হিসেবে ব্যবহার ও দেশমাতৃকার একটি অত্যুজ্জ্বল ভাবমূর্তি রচনা—এ সমস্ত কিছুর পূর্বাভাস যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যেই মেলে তা এই পণ্ডিতেরা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রচ্ছন্ন বাঙালীয়ানাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী বলেও কেউ কেউ মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় হিন্দুধর্মশাস্ত্রের বহু তথ্য ও তত্ত্বের উল্লেখে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব যেমন পুষ্ট হয়েছে, তেমনি উগ্র হয়ে উঠেছে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ—এ যুক্তির সমর্থকদের সংখ্যাও কম নয়। রামমোহনকে ধর্ম সংস্কারক লুথারের সগোত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রতিক্রিয়াশীলতার মূর্ত প্রতীক লয়োলার ভূমিকায় কল্পনা করতে দ্বিধা করেননি বহু পণ্ডিত।

বঙ্কিমচন্দ্রেব ধ্যানধারণা ঘিরে অসত্যের এই উর্ণাজাল ছিন্ন করা জাতীয় কর্তব্য। 'প্রচার' নামক পত্রিকায় শশধর তর্কচূড়ামর্নি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করে যে তিনি যান্ত্রিক ও নির্বিচার পুনরুজ্জীবনের বিরোধী ছিলেন।[৮] 'মিল' ও 'মনু'র সমন্বয়ের ব্যর্থ চেষ্টায় ব্রতী হন নি তিনি। 'হার্ডার' বা 'ম্যাৎসিনী'র কোনও ভারতীয় সংস্করণও তাঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর সযত্ন বিচার-বিশ্লেষণে তাঁর গভীর ধী শক্তি ও তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতা সম্পর্কে যেমন নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তেমনি সমসাময়িক ভাবজগতের সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় পরিচয়েরও প্রমাণ মেলে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে ইউরোপের চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল যুক্তিবাদ, প্রত্যক্ষবাদ (positivism), উপযোগিতাবাদ, বিবর্তনবাদ এবং সর্বোপরি, ধর্মের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের অভিঘাতে। ভাবজগতের এই আলোড়ন তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো ভাবতবর্ষেব মনোভূমিও প্লাবিত করে দেয়। যুগ-সচেতন বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাব-প্রবাহের নিরিখে আপন ধর্মবোধ যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। যুগধর্ম সম্পর্কে তাঁর সদা-জাগ্রত মনোভাব আগের প্রজন্মের চিন্তানায়ক রামমোহনের থেকে বিশেষ আলাদা ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়েই অষ্টাদশ শতকের 'বুদ্ধি-বিপ্লব'-সমর্থিত সর্বজনীন সর্বকালীন, সর্বত্র প্রয়োগ-যোগ্য আদর্শ ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছিল। জার্মান বোমান্টিক চিন্তানায়ক জোহান গটফ্রিড হার্ডাব[৯] অথবা ইতিহাসবেত্তা লিওপোল্ড ফন র‍্যাঙ্কে-এর[৮] মতো বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করতেন যে ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় এবং সভ্যতাব বিভিন্ন পর্বগুলির একটা নিজস্ব চরিত্র আছে। সুতরাং সর্বজনীন কোনও মূল্যবোধ দ্বারা তাদেব বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করলে সেগুলি তাৎপর্য হারাবে। ফরাসী বিপ্লবজাত আন্তর্জাতিকতা নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে—এ তত্ত্বের সমর্থন যেমন জার্মান 'রোমান্টিক'দের কাছে মেলেনি, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রচারিত উপযোগিতাবাদকে সমস্ত সমস্যার সমাধান বলে মেনে নেননি। প্রতীচ্যের জীবনে যা অত্যাবশ্যক এ দেশের সমাজে তা একান্তই আরোপিত, তথা নিষ্ফল, এমন প্রতীতি তাঁর হয়েছিল। অথচ এই বাস্তব সত্যটা বিস্মৃত হযে এ দেশের বেশ কিছু সংখ্যক উদাবনৈতিক সংস্কারক বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ ও উপযোগিতাবাদেব ছাঁচে ভারতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঢালাই করার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন।

রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিকাশ যে বাঁধা-ধরা কোনও ছক অনুসারে ঘটে না—এই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। বিদেশ থেকে আমদানী করা কোনও তত্ত্ব নয়, এ দেশের আবহাওয়া, মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্যই তার ভিত্তি হতে পারে। সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা অস্বীকার না করলেও বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিষয়ে কোনও সংশয় ছিল না যে জাতির প্রবহমান জীবনের যথাযথ চিত্রায়নই ইতিহাসের প্রকৃত লক্ষ্য। আবার, নৃতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বাঙালী জাতির ইতিহাস ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ইতিবৃত্তের থেকে আলদা।[৮] ভাষা-প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা ভাষাকে ইংরেজী ও সংস্কৃতের নিগড় থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কেন না তাঁর বিচারে ভাষার মধ্য দিয়েই একটা জাতির সামগ্রিক জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয়। বাংলা ভাষাই ছিল তাঁর চিন্তার একমাত্র বাহন, বাংলা দেশ তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ-বিজয়ের পর থেকে (মাত্র সতেরোটি অশ্বারোহী সেনার সাহায্যে গৌড় দখলের কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র কোনও দিনই বিশ্বাস করেননি) ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই কাল-সীমার মধ্যে তিনি বিচরণ করেছেন বারবার, লিপিবদ্ধ করেছেন তার অবক্ষয়, অধঃপতন এবং পুনরুজ্জীবনের কাহিনী। কে ভুলতে পারে সত্যানন্দ-প্রদর্শিত

দেশমাতার সেই ত্রিমূর্তির কথা ? অবশেষে দেশজননী সমীকৃত হয়েছেন দেবী দুর্গার সঙ্গে। কেউ কেউ বলছেন এ তো জাতীয়তাবাদ নয়, উপজাতীয়তাবাদ (sub-nationalism). কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ১৮৮০ (আনন্দমঠের প্রকাশকাল) থেকে ১৮৮৬-র (কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম পর্ব মুদ্রণের তারিখ) মধ্যে ভারতীয়রূপে বাঙালীর উত্তরণ ঘটে গিয়েছিল, আর মহাভারত ও গীতার মধ্যে অবগাহনের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানের জন্মভূমি বৃহত্তর এবং মহত্তর একটি আযতন পেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের মতো কোনও অতিমানবের নেতৃত্বে তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে—এমন ইঙ্গিত তাঁর শেষের দিকের রচনায় অনায়াসেই পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ আর্য গবিমার কোনও আবেদন ছিল না যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। বাঙালীর শক্তি, সামর্থ্য, জাতীয়তাবোধের অভাব তিনি সবিনয়ে স্বীকার করেছেন।[১০] কিন্তু রোমান্টিক মানসের অধিকারী বঙ্কিম আবেগ ও কল্পনার মূল্য স্বীকার করতেন। ধর্মকে জাতিগঠনের কাজে লাগাবার কথাও ভেবেছিলেন। যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের মধ্যে যে ধর্ম-বিরুদ্ধতা অন্তর্লীন ছিল, মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার প্রতি যে নির্বিচার অবজ্ঞা ফুটে উঠেছিল—তার পরিমার্জনায় ব্রতী হয়েছিলেন এই বাঙালী সাহিত্যিক। কোল্‌রীজ এবং কীটস্‌-এর 'গথিক-চেতনা' যেমন তাঁদের ধূসর অতীতের বিলীয়মান ঐশ্বর্যকে নতুন একটা রূপ দিতে উদ্দীপিত করেছিল, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও বারবাব ফিরে তাকিয়েছেন পিছনের দিকে। তবে রোমান্টিকদের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি। সমাজকে প্রাণময় সমষ্টি হিসেবেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাই ব্যক্তির প্রযোজন বা দাবীর বহু উঁচুতে ছিল সজীব সমাজের আসন। স্বয়ং দেবীবরের বিধান অনুযায়ী নৈকষ্যকুলীন ব্রাহ্মণ হলেও[১১] অধঃপতিত, অস্পৃশ্য শূদ্রদের প্রতি সহৃদয়তার অভাব তাঁর মধ্যে কোনও দিন দেখা যায়নি ; বিত্তশালী মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মালেও শোষিত কৃষকদের প্রতি মমতা প্রকাশে তিনি কার্পণ্য করেননি।[১২] আবার, সমাজের সংহতি রক্ষার সংকল্প তাঁব মধ্যে এক ধরনের রক্ষণশীলতা সৃষ্টি করেছিল। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর দুর্দমনীয় ভোগলালসা বা বিবাহিতা শৈবলিনীর বিবাহিত প্রতাপের ওপর প্রেমের অবারণীয় দাবী বা নগেন্দ্রনাথ ও সীতারামের রূপতৃষ্ণাকে তিনি তাই সংযত করতে চেয়েছিলেন সমষ্টির স্বার্থে।

কিন্তু বঙ্কিম মানসের এই দিকটাকে সুমিত করে রেখেছিল তাঁব অসামান্য সৌন্দর্যচেতনা ও শিল্পবোধ, ভুল-ভ্রান্তি ভরা জীবনকে সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা। জীবনের সায়াহ্নকালে রচিত গ্রন্থগুলিতে চিন্তানায়ক বঙ্কিম শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে দিলেও, সাধারণ ভাবে তত্ত্ব বা বিমূর্ত ভাবনার চেয়ে তিনি দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকে মূল্য দিয়েছেন বেশী। নির্বিশেষের থেকে বিশেষ, প্রথানুগত্যের থেকে আত্মশক্তির উপর নির্ভরতা শ্রেয় বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে। আত্ম-বিকাশ ও প্রকাশ ছিল তাঁর মতে মনুষ্যত্বের পরম অভিজ্ঞান, আর তা যে একমাত্র চিত্তবৃত্তির নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন এবং শুদ্ধিকরণ ছাড়া সম্ভব নয় সে বিষয়েও তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না। অরবিন্দের ভাষায়, "এক অটল স্থৈর্য এবং নিবিড় প্রশান্তিকে দেবতার লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছিলেন এপিকিউরাস। যে সব মুষ্টিমেয় মানুষ অবিচলিতভাবে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন তার সামগ্রিকতা—তাঁরাই এই দৈব-ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়ে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই বিরল পুরুষদেরই অন্যতম।"

বেন্থামের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র উপযোগিতাবাদকে ধর্মের বিকল্প বলে স্বীকার করতে পারেননি। পার্থিব সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে নয়, নৈতিকতার মানদণ্ডেই

ভালমন্দের বিচার হওয়া উচিত—এই ছিল তাঁর অভিমত। একমাত্র সূক্ষ্ম গাণিতিক বিচারে সক্ষম মানুষের পক্ষেই বেন্থাম ও মিলের তত্ত্ব অনুসরণ সম্ভব।[১৩] সামাজিক বিষয়ে গাণিতিক মাপকাঠির উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের আস্থা ছিল না।[১৪] মিলের প্রতিবাদে তিনি বলতেন—আত্মসুখের বৃদ্ধি বা জনপ্রিয়তা-লিপ্সা নয়, মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসাই প্রকৃত হিতকর্মের ভিত্তি হতে পারে। তিনি মনে করতেন তৃপ্তি পাবার জন্য আমরা ভালবাসি না, ভালবাসি বলে তৃপ্তি পাই। সকল প্রাণীর মধ্যে পরমাত্মা বিরাজমান, তথা আত্ম পর কোন ভেদ নেই বলে অন্যের সুখ বিধানেই আমার সুখ।[১৫] দ্বিতীয়ত, মিলের কাছে মহত্তম প্রেরণা ছিল 'টেন কমাণ্ডমেন্টস'-এর দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ 'প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালবাসো' ; বঙ্কিমচন্দ্র বেছে নিয়েছিলেন প্রথমটিকে : 'তোমার ঈশ্বর, তোমার প্রভুকে, ভালবাসো'—কেন না এই প্রেম থেকেই উৎসারিত হয় স্বজন-প্রীতি, সকলের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা। তৃতীয়ত, যে ঐহিক সুখ-সন্ধান পাশ্চাত্যের সমস্ত কর্ম ও সাধনার কেন্দ্রে রয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র তার জায়গায় প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ-মোক্ষলাভকে বসাতে চাননি। আপাতবিরোধী এই আদর্শ দুটি সমন্বিত হতে পারে মোক্ষকে যদি সুখের চরমতম প্রকাশ বলে মেনে নেওয়া যায়। অকারণ বৈরাগ্য বা কৃচ্ছ্রসাধনের সমর্থন তিনি করেননি, পরলোকে সুখপ্রাপ্তির আশায় ইহলোকের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জনের তত্ত্বে তাঁর আস্থা ছিল না। তবে এ জন্য তাঁকে বস্তুবাদী বা ভোগবাদী ভাবা গর্হিত। ভারতীয়রাও যে পার্থিব সম্পদের জন্য পাশ্চাত্য মোহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে—এতে মর্মাহত হয়ে তিনি তাঁর অন্তরের সমস্ত বিতৃষ্ণা ঢেলে দিয়েছেন 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'আমার মন' নামক নিবন্ধে :

"হর হর বম্ বম্। বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্র শ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে পুরোহিত, এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিলতন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়…শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল ইহলোকে এবং পরলোকে অনন্ত নরক।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার অভিযোগ এনেছেন অনেকে, তাঁকে বারবার সামাজিক সংস্কারের চরম শত্রু এবং গোঁড়ামির মুখপাত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এ জাতীয় মতবাদের উৎস অজ্ঞতা বা ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা। সমসাময়িক বহু মানুষের চেয়ে সমাজ ও মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীরতর ও বিস্তৃততর। কোনো স্বর্ণযুগের উদ্দেশে মানব প্রগতির রথ সরল-রৈখিক ও অনিবার্য গতিতে এগিয়ে চলেছে—উনিশ শতকীয় এ ধরনের কল্পনায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাই বলে ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ মোহ তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট করে দেয়নি—যা বহু চরমপন্থীর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে পুরোহিত সম্প্রদায়ের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের তিনি বিরোধিতা করেছেন, উৎসাহী হয়েছেন নিরক্ষরতা দূরীকরণে, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে। যাঁরা 'কুন্দনন্দিনী' অথবা 'শৈবলিনী'র মর্মান্তিক পরিণতি থেকে তাঁর রক্ষণশীলতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁদের উচিত দাম্পত্য সম্পর্ক এবং স্ত্রী-পুরুষের অধিকার বিষয়ে 'সূর্যমুখী'র দৃঢ় মতামত অনুধাবন। বিধবা-বিবাহের পক্ষেও যুক্তি উত্থাপন করেছেন তিনি। 'সাম্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "কিন্তু যদি কোনও বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃ পরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি তাহাতে অবশ্য অধিকারিণী…বিধবার চির বৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্যা পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন ?" মেয়েদের অসূর্যম্পশ্যা করে রাখার বিরোধী বলেই তিনি লিখেছিলেন : "আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ

তাহাতে কিছু অপমান নাই ? কিছু লজ্জা নাই ?"[১৬] নারী-মুক্তিব্রতে নিবেদিত-প্রাণ বিদ্যাসাগর এবং ব্রাহ্ম সংস্কারকদের উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতজ্ঞতা। 'বৈদ্য' এবং 'ধর্মত্যাগী' কেশবচন্দ্র সেনকে তিনি ব্রাহ্মণ-সমাজের 'আদর্শ গুরু'রূপে অভিহিত করেছিলেন। এ দেশের তথাকথিত প্রগতিশীলগণ যখন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' সম্প্রসারণের মধ্যে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন জমিদার ও কৃষকের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কের বিশ্লেষণ করে সেই 'বন্দোবস্তে'র অন্তর্নিহিত অবিচার ও অন্যায়গুলি সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে দ্বিধা করেননি।[১৭] 'জন-বিস্ফোরণ' সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তার যাথার্থ্য বিষয়ে সে কালে একমাত্র তিনিই নিঃসংশয় ছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থক এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বিধি-বিধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন। সর্বোপরি এ তথ্যটি বিস্মৃত হওয়া অনুচিত যে এ দেশে অঙ্গুলিমেয় ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান তাঁকে আতঙ্কিত করেছিল।[১৮] বার বার তিনি আমাদের সতর্ক করে গেছেন যে ব্যক্তির সমৃদ্ধি বা বৈষয়িক উন্নতিই সামাজিক উন্নয়নের নিরিখ হতে পারে না। ভয়াবহ আর্থ-সামাজিক বিক্ষোভ যখন দেশীয় সমাজের সংহতি-নাশে উদ্যত তখন কতিপয় আলোকপ্রাপ্ত 'বাবু'র পাশ্চাত্য প্রগতির অলীক স্বপ্ন তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল।

নিজের প্রতি কর্তব্য পালনে প্রতি মানুষের প্রাগাধিকার বিষয়ে হারবার্ট স্পেন্সার-এর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন একমত। আত্মরক্ষা ত' সৃষ্টি রক্ষার জন্য একটা ঐশ্বরিক বিধান।[১৯] কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা ছিল—এই নিয়ম অনুযায়ী অপরকেও ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা কি সকলেরই কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয় ? 'সামাজিক ডারউইন তত্ত্ব' জীব বিদ্যার মৌলিক নিয়মগুলিকে নির্বিচারে সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু টি· এইচ· হাক্সলির মতো বঙ্কিমচন্দ্রও এই মতবাদের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছিলেন। স্বভাব-ধর্মের প্রক্রিয়াকে অনুক্ষণ সংযত করে, অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক বিধানকে তার স্থলাভিষিক্ত করেই, মানব-সমাজের উত্তরণ সম্ভব।[২০] আর, ডারউইন তত্ত্ব আন্তজার্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' নীতিই যে সর্বত্র প্রশ্রয় পাবে, নির্বাধ হয়ে উঠবে জাতিতে জাতিতে হানাহানি—সে সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা ছিল বিস্ময়কর।[২১] প্রতীচ্যের এই আগ্রাসী-দেশপ্রেম বা অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদের সংক্রমণ থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত থাক—বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের এই কামনা তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ পেয়েছে।[২২] দেশবন্দনার মন্ত্রে উদ্দীপিত হলেও 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের শেষের পৃষ্ঠাগুলিতে সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রতি তাঁর বিরাগ প্রচ্ছন্ন থাকেনি। দেশপ্রেমকে ধর্মের জায়গায় বসাতে তাঁর মন সায় দেয়নি।

স্বাভাবিকভাবেই এই পর্যবেক্ষণগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত ধ্যানধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত ধর্ম এবং তার স্বরূপ-বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক করে তোলে। তবে এ বিষয়ে অপব্যাখ্যা আজও অবসিত হয়নি। জন স্টুয়ার্ট মিল-এর 'থ্রি এসেজ অন রিলিজিয়ন' (১৮৫০—৫৮) বঙ্কিমের চিন্তাধারার উপর প্রগাঢ় প্রভাব ফেলেছিল।[২৩] ধর্ম সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণায় মিল-এর সত্যসন্ধী মন সায় দেয়নি। তাঁর মতে মানুষের আত্মসংস্কার ও আত্মশুদ্ধিতে সহায়তা করা এবং জীবলোকের উন্নতিসাধনই ধর্মের মুখ্য ভূমিকা হওয়া উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রও বিশ্বাস করতেন যে মনুষ্যত্বের প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য গুণই ইন্দ্রিয় জয়ের ফলে অর্জিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত 'কর্ষণে'র ফলেই (বঙ্কিমচন্দ্র 'অনুশীলন' শব্দ ব্যবহার

করেছেন) এই গুণগুলি মানুষের দ্বিতীয় চরিত্রে (বা সত্তায়) রূপান্তরিত হয়। ভলতেরের কাঁদিদের মতো মিলও সহজ আশাবাদে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। নবিস ও ডোমিসিয়ানের নিষ্ঠুরতাও যার পাশে ম্লান হয়ে যায়—প্রকৃতির সেই ভয়ঙ্কর হিংস্রতা করুণাময়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, কেন না তিনি তো সর্বদাই জীবলোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। জীবলোকে অমঙ্গলের এই দুঃসহ অস্তিত্ব হয়তো স্রষ্টার সীমাবদ্ধতারই প্রমাণ। সেজন্য মঙ্গলের নিত্যপ্রতিষ্ঠায় মানুষ মাত্রেরই উচিত তাঁর সহযোগিতা করা। মিল অবধারিত ভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য মানুষের সমস্ত অনুভূতি ও বাসনার প্রবাহকে সর্বোত্তম, সকল কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে, কোনও আদর্শের অভিমুখী করে দেওয়া। আর, একমাত্র 'মানব-ধর্ম'ই এই শর্ত-পালনে সক্ষম। অভিজ্ঞতাই বলে যে সৃষ্টির আদি কারণ (First Cause) অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। তা ছাড়া মন বা আত্মার চেয়ে বস্তুই আদি-কারণ হবার অধিকতর দাবীদার। আর, মহৎ হলেও ঐশ্বরিক ক্ষমতা যে শুধু সীমাবদ্ধ তাই নয়, তার মধ্যে আছে শুভ এবং অশুভ শক্তির সহাবস্থান। কোনও ঐশ্বরিক ঘোষণা (revelation)কেও ঐতিহাসিক বলে মানতে পারেননি তিনি। তাই মানব-ধর্ম ছাড়া উপযোগিতাবাদীর পক্ষে অন্য কোনও ধর্মের আশ্রয় নেওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু আশাবাদী ধর্ম ছাড়া মিল-এর চললো না। যাঁর মধ্যে আমাদের পূর্ণতা সম্বন্ধে ধ্যানধারণা সার্থক রূপে প্রকাশ পেয়েছে এমন পুরুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয়তা মানুষের অনুভূতিগুলির মধ্যে এমন এক শক্তির সঞ্চার করে যা কোনও কাল্পনিক আদর্শ থেকে আসবে না। মিলকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হলো যে যুক্তি আমাদের চিন্ময় জগৎ থেকে অনেক মিথ মুছে দিলেও খ্রীস্ট অবিনশ্বর, অলোকসামান্যরূপে তিনি থেকে যান আমাদের মর্মে। খ্রীস্ট ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র নাও হতে পারেন, কিন্তু তিনিই তো মানুষকে সত্য ও ধর্মের দিকে চালিত করার জন্য বিশেষভাবে আদিষ্ট পুরুষ।[২৪] কালধর্মে মানব-সমাজের নিত্য নতুন প্রয়োজনের উত্তর হিসেবে খ্রীস্টধর্মের প্রয়োজনীয়তা কমে গেলেও খ্রীস্টের অনুপম ও মহৎ আদর্শ কি বিসর্জিত হবে? মানুষের উদ্বর্তন, আত্ম-শুদ্ধির নিরবচ্ছিন্ন কিন্তু দুর্বল চেষ্টা কেন মানবপুত্রের বেদনাকীর্ণ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে উদ্দীপিত হবে না?

বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে কিন্তু মিল-এর সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না, আর সে কারণে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ধর্মানুভূতির কেন্দ্রে স্থাপন করতে তিনি দ্বিধা করেননি। সন্দেহ নেই, মিল-এর যুক্তিদ্বারা তিনিও প্রথম দিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[২৫] ভারতবর্ষের ধর্মীয় জীবনে দেশাচারের আধিপত্য সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। পৌরাণিক অলৌকিকতায় অবিশ্বাসী বঙ্কিম সত্যের পথ-রোধ-করে-থাকা ভক্তিরসে আপ্লুত ধর্মোপাখ্যানগুলির মোহ নির্মমভাবে ছিঁড়তেও দ্বিধা করেননি। ধর্মবেত্তা বঙ্কিম-মানসে অন্ধবিশ্বাসের স্থান একেবারেই ছিল না। বিশ্বাসের থেকে আচরণকে তিনি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন সব সময়। তাই বলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ধর্মানুশীলন-প্রসূত অন্তর্দৃষ্টির উপরে বসাতে তিনি রাজী ছিলেন না। পরম কারুণিক ঈশ্বরের যে সীমাবদ্ধতার কথা মিল বলেছিলেন তিনি তা মানতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারে ঈশ্বর ত্রিবিধ শক্তির আধার—তিনি একাধারে স্রষ্টা, ত্রাতা ও সংহার কর্তা। অপর পক্ষে, অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর মতো মানুষও অপূর্ণ। কিন্তু সে যদি প্রতিনিয়ত আপন সত্তায় পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করে, অন্তরে-বাহিরে, আচরণে এবং ধ্যানে তাঁকে উপলব্ধি করার সাধনা করে, তবে তার অপূর্ণতা দূর হবে, দিব্য জীবনের আস্বাদও সে লাভ করবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সাধনাকেই 'অনুশীলন' নামে অভিহিত করেছেন।[২৬]

প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্নিবার আকর্ষণের তথ্য সুবিদিত। কোঁৎ-এর দর্শনের দুটি বৈশিষ্ট্যকে তিনি লক্ষণীয় বলে মনে করতেন, (১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সফল বলে প্রতিপন্ন পদ্ধতি সব রকমের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং (২) অর্জিত জ্ঞানকে বিশ্বাস সঞ্চারে সক্ষম এমন এক সংহত মতাদর্শে রূপায়ন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' এই জাতীয় চিন্তার নির্যাস। তাঁর মতে কোঁৎ শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবের ব্যাখ্যাতাই ছিলেন না, তিনি কর্মের সুবিধার্থে মানসিক বৃত্তিগুলির সম্মার্জনাতেও বিশ্বাসী ছিলেন। তবে অন্তহীন উত্তরণের মৌলিক বিধান ভাঙতে তিনি রাজী ছিলেন না। বর্তমানকে তিনি অতীতের পরিণাম বলেই মনে করতেন এবং অতীতের সঙ্গে আকস্মিক কোনও ছেদ (যেমন ফরাসী বিপ্লব) সামাজিক সমস্যার মীমাংসা না করে নতুনতর জটিলতা সৃষ্টি করে সে বিষয়ে ছিলেন অসংশয়। এই বিশ্বাস ছিল বলেই অবিবেচনাপ্রসূত, হঠকারী, উপর-থেকে-চাপিয়ে দেওয়া সংস্কারের বিরোধিতায় বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অতন্দ্র। তাঁর বিচারে সংস্কার মাত্রই অশুভ নয়। কিন্তু নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনার উন্মেষের আগে সেগুলি প্রবর্তিত হলে তাদের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। এই উন্মীলন সম্ভব হয় ধর্মতত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি থেকে।

তবে অগুস্ত কোঁৎ চেয়েছিলেন মানবধর্মকে ঈশ্বর-আরাধনার স্থানে বসাতে এবং এখানেই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি। এতোদিন মানুষ এমন সব কাল্পনিক দেবতার উপাসনা করে এসেছে যাঁদের অস্তিত্ব মানুষের অন্তরে ছাড়া অন্য কোথাও নেই। প্রত্যক্ষবাদে (Positivism) এমন এক নতুন দেবতার (মানবতা) কথা বলা হয়েছে যা পরমাত্মার মতো নির্লিপ্ত ও উদাসীন না থেকে প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল, আর ভালবাসাই তার অস্তিত্বের একমাত্র ভিত্তি। কোঁৎ আরাধিত 'মানবতা' এতাবৎ প্রচলিত বিভিন্ন দিব্যপুরুষের থেকে স্বতন্ত্র, কেন না তার প্রকৃতি আপেক্ষিক, পরিবর্তনশীল ও পূর্ণতাসম্ভব। শুদ্ধির জন্য তার প্রয়োজন মানুষের নিরন্তর সেবা। কোঁৎ-এর কণ্ঠে তাই এই দ্বিধাহীন ঘোষণা : "ভালবাসাই আমাদের জীবনাদর্শ, শৃঙ্খলা জীবনের ভিত্তিভূমি, আর প্রগতি একমাত্র অন্বিষ্ট।" বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণভাবে এই আদর্শ মেনে নিয়েছিলেন, কেন না তিনিও 'মনুষ্যপ্রীতি'র কথা বারবার বলেছেন, শৃঙ্খলাবোধ ও প্রগতির মূল্য স্বীকারে তাঁর ক্ষীণতম আপত্তিও ছিল না। কিন্তু তাঁর মত ছিল—এ সবই তো মানুষের অধ্যাত্ম-চেতনার প্রতিফলন, তার সার বস্তু নয়। এই শৃঙ্খলাবোধের নোঙর, এই প্রগতির নিয়ন্ত্রক কে হবে? কিই বা হবে এই সর্ব-পরিব্যাপ্ত প্রেমের অনিঃশেষ উৎস? এই প্রশ্নের উত্তরে কোঁৎ অবশ্য বলেছিলেন—ধর্ম, কেন না ধর্মেই বিধৃত হয় সেই অনুপম একাত্মবোধ যা ব্যক্তি ও সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সবচেয়ে বড়ো অভিজ্ঞান। ধর্মই মানুষের অনুভূতিগুলিকে একটা পরম লক্ষ্যাভিমুখী করে দেয়। পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত ধর্মের ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে কোঁৎ-এর ব্যাখ্যাটিকেই বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করতেন। কিন্তু হিন্দু আদর্শকে তিনি গভীরতর ও ব্যাপকতর বলে মনে করতেন। 'পরম লক্ষ্য' যদি মানব সেবা হয় তার জন্য মানুষের আকুলতা যে অনির্বাণ থাকবে তার স্থিরতা কোথায়?—এ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে এসেছিল। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরকে বাদ দিতে পারেননি। একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল ঘটাচ্ছেন—"সূত্রে মণিগণাইব"। মানব-সেবার আগে তাই ঈশ্বরোপলব্ধি অত্যাবশ্যক।[১১] মানব-হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা তাঁর উদ্দেশে ধাবিত হলে, সর্বকর্ম ঈশ্বরে নিবেদিত হলে, তবেই সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবে মানব-প্রীতি, যথাবিহিত হবে মানব কল্যাণে আত্মোৎসর্গ। কোনও বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক-কৃত ঈশ্বর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি বঙ্কিমচন্দ্র। স্পেন্সার যাকে এক "দুর্জ্ঞেয় নৈসর্গিক শক্তি" বলেছেন, কোঁৎ-এর বিচারে যিনি মানবিকতার পরম

অভিব্যক্তি, বঙ্কিমের ধ্যানের এবং আরাধনার ঈশ্বর তিনি নন।

বলা বাহুল্য, পশ্চিমের সমাজতাত্ত্বিকদের বুদ্ধি যেখানে পৌঁছয়নি, প্রাচ্যের ঋষির ধ্যানে তা ধরা পড়েছিল। বঙ্কিমের সকল প্রশ্নের উত্তর মিলেছিল মহাভারত, ভাগবত ও গীতায় [একদা রামমোহন যেমন তা পেয়েছিলেন উপনিষদে]। ধর্মের ব্যাপারে কি ঐতিহ্য অনুসারী, কি যুক্তিবাদী—কোনও পক্ষের কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। বাইবেল-এর এই অমৃতবাণী অনুক্ষণ তাঁর মনে জাগ্রত ছিল যে—'শুদ্ধাত্মাগণই ধন্য কেন না তাঁরাই ঈশ্বর দর্শন পাবেন।' চিত্ত শুদ্ধির মধ্যেই যে সব ধর্মের, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের, সারাৎসার নিহিত আছে সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে কোনও সংশয় ছিল না; এই শুদ্ধতা ছাড়া হিন্দুদের প্রতিমা পূজা পরিণত হয় পুতুল-পুজোয়, ব্রাহ্মদের উপাসনা রূপ নেয় অর্থহীন শব্দোচ্চারণে। চিত্ত শুদ্ধির উৎস নিহিত মানুষের সকল বৃত্তির অনুশীলন ও সমন্বয়ের মধ্যে। দুরূহ এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটলে তা প্রকাশ পায় মানবপ্রীতি, শান্তি ও ভক্তিতে।

উপনিষদের 'অদ্বৈতবাদ' কি এই পরম-প্রার্থিতের সন্ধান দিতে পারে? বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিধাহীন উত্তর—না, কারণ 'এই ধর্ম অতি বিশুদ্ধ কিন্তু অসম্পূর্ণ'। 'নির্গুণ', 'নিরাকার' ব্রহ্মের কল্পনা ও তার সারূপ্য সন্ধানেই অদ্বৈতবাদীদের ধর্ম-সাধনার সমাপ্তি। বঙ্কিম এই অভিমত পোষণ করতেন যে "নির্গুণ-ঈশ্বর আরাধনার মধ্যে প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান বৃথা, কেন না যিনি নির্গুণ তাকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। নিরাকার, নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর মানুষের হৃদয়ে কোনও মহৎ অনুভূতি সৃষ্টি করতে অক্ষম। একমাত্র ব্যক্তিগত ঈশ্বরই তা পারেন।"[২৮]

ঐতিহ্যবাদীরা আবার, বহু দেবদেবীর পূজা করে অথবা আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্রকেই ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন জ্ঞান করে প্রকৃত ধর্মের পথ থেকে সরে গেছেন। বঙ্কিম ঘোষণা করলেন: "হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই"। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি ও সগুণ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিকে সমন্বিত করাই হিন্দু ধর্মের লক্ষ্য। কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্বাসের কথা বারংবার বলাই যথেষ্ট নয়, আচরণে তাকে প্রয়োগ করাও প্রয়োজন। ঐহিক এবং পারলৌকিক বিষয়গুলির মধ্যে, তুচ্ছ-মহৎ সমস্ত কর্মের মধ্যে অনন্তের স্পর্শ প্রতিফলিত করাই প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা হওয়া উচিত।

মনে রাখা কর্তব্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার মধ্যে রোমান্টিকতার এক ফল্গুধারা প্রবহমান থাকায় ব্রাহ্মধর্ম পরিবেশিত নিরাকার একেশ্বরবাদ (monotheism) তাঁর কাছে বিমূর্ত ও বিশুষ্ক বলে প্রতিভাত হয়েছিল। এ কারণেই তাঁর সিদ্ধান্ত যে উপনিষদের শুষ্ক তত্ত্ব মহাভারত, গীতা ও ভাগবতের অমৃতধারায় সিঞ্চিত করতে হবে। ধর্ম তো শুধু মুষ্টিমেয় জ্ঞানমার্গীর সাধনার ধন নয়, তা বৃহত্তর মানব সমাজের আধ্যাত্মিক উত্তরণেরও সহায়ক। এ কথা ঠিক যে প্রকৃত হিন্দুধর্মে বহু দেবদেবীর স্থান ছিল না; উপাস্যকে বহু দেবদেবী রূপে কল্পনা করা মানব সমাজের সেই আদিম অবস্থারই বৈশিষ্ট্য যখন কুসংস্কার-প্রভাবিত হয়ে প্রাণী বা বস্তুকে দেবসত্তা দান করা হতো। বলা বাহুল্য ধর্মের এই অসংস্কৃত চেহারা ছিল লোকাচার, দেশাচার ইত্যাদি প্রভাবের ফল, প্রকৃতধর্মের অনুশীলন তখনও মানুষের অধিগত হয়নি; অনন্ত, নিরাকার, নির্গুণের উপলব্ধি তখনও ছিল অধিকাংশের অনায়ত্ত। আধ্যাত্মিক মার্গে কিছুটা এগিয়েছেন এমন সাধকও ধ্যানের সহায়ক হবে বলে ঈশ্বরকে সাকারত্ব দিতে চেষ্টা করতেন। ব্রাহ্মরাও যে এ প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি তার প্রমাণ তাঁরাও ঈশ্বরকে পিতা, প্রভু ও সখা রূপে চিন্তা করতেন, তাঁরাও সসীম মানবিক সম্পর্কের সেতু বেয়ে অসীমকে ছুঁতে চেষ্টা করেছেন। সাধারণ মানুষের ধর্মাচরণের পথ থেকে প্রতীক রূপী মূর্তি পূজা অপসারিত করা অনুচিত, কেন না এই পথই একদিন তাকে সাধনার উচ্চতর স্তরে পৌঁছে দেবে।[২৯] ঈশ্বরকে সাকার রূপে আরাধনা করলে সাধকের চিত্তরঞ্জনী বৃত্তিগুলিরও

বিকাশ ঘটে। বৈষ্ণব কাব্য এর অবিস্মরণীয় প্রমাণ।

রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথ অবতারবাদের নিন্দা করলেও বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্বটির সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। ঈশ্বর যে স্বেচ্ছায়, আত্ম-মায়া দ্বারা মাঝে মাঝেই রূপ পরিগ্রহণ করেন সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন। সত্তা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী বলে জীবলোকে আবির্ভূত হয়েও ঈশ্বর নিজেকে মানবিক দুর্বলতা ও অজ্ঞানতার অধীন করেন এবং কঠিন প্রতিকূলতা জয় করে সাধারণ মানুষের সামনে উদ্বর্তনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই বিচারেই অবতার রূপে গৃহীত ও সম্মানিত হয়েছেন খ্রীস্ট এবং বুদ্ধ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবতার শ্রেষ্ঠ।[৩০] তাঁর মধ্যেই ঘটেছে নৈর্ব্যক্তিকতা ও ব্যক্তিগতের, দিব্য ও পার্থিবের, বিশেষ ও নির্বিশেষের পরমাশ্চর্য মিলন। ঈশ্বরের অলৌকিকত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন পায়নি। সম্যক অনুশীলন দ্বারা নিজের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির যথাবিহিত পূর্ণতা ঘটিয়ে, বিশুদ্ধ এবং অখণ্ড ব্যক্তিত্বকে 'সর্বভূতের হিতসাধনে' (উপনিষদের 'লোক সংগ্রহ') নিযুক্ত করে মানুষের দিব্যত্বপ্রাপ্তিই প্রতিফলিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে।[৩১] তিনি কোনও ঊর্ধ্বলোক থেকে মানবজগতে নেমে আসেননি, মানবজগৎ থেকে ঊর্ধ্বে উঠেছেন দেবলোকে। তিনি মানুষের মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতীক, আত্মবিকাশের জন্য মানুষের নিরন্তর সাধনার প্রতিচ্ছবি। তিনিই সেই আধ্যাত্মিক শক্তির অনির্বাণ উৎস যা বিভিন্ন মানুষের সমাজকে অদৃশ্য একটা সূত্রে আবদ্ধ করে বিভিন্ন জাতি, মহাজাতি সৃষ্টি করেছে। তাঁর মধ্যে ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইচ্ছাশক্তি, অভিপ্রায় ও উদ্যম। তাঁব মধ্যেই মানুষ নিজের পূর্ণতা ও মহিমা বিকশিত হতে দেখে 'মাণ্ডুক্য-কারিকা' রচয়িতা তাঁকে "দ্বিপদম্ বরম"—মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বর্ণনা করেছেন।

প্রতক্ষ্যবাদীদের সংশয় ও রক্ষণশীলদের কূপমণ্ডুকতার দোটানার মধ্যে পড়ে বিভ্রান্ত হিন্দুরা এই মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী, আশাব্যঞ্জক বিশ্লেষণে স্বস্তি পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন আত্মবিশ্বাসের এক নতুন উৎস। ঐতিহাসিক চরিত্র খ্রীস্ট খ্রীস্টানমাত্রের কাছেই পরম গৌরবের ধন। এতোদিনে হিন্দুরাও পেল অনুরূপ এক ঐতিহাসিক চরিত্র—শ্রীকৃষ্ণকে। হিন্দুদের প্রাপ্তি আরও বেশি, কেন না শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ বা খ্রীস্টের মতো সন্ন্যাসী নন ; তিনি প্রাণময়তায় উচ্ছ্বসিত ; জীবনমুখী এক গৃহী।[৩২] জাগতিক সংঘাত, অশান্তি ও উত্তেজনার বিলোপ সাধন না করে তিনি সেগুলির রূপান্তর ঘটিয়েছেন। একান্তরূপে মর্তের অঙ্গীভূত হয়ে, এখানকার অনিবারণীয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতগুলির মধ্যে ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে তাকে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে জ্ঞান করেছেন, সকলকে তাতে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেন। নিষ্কাম কর্মের আদর্শ গ্রহণের উপদেশ এসেছে তাঁর কাছ থেকেই। ঈশ্বরবাদীরা (Deistগণ) সাধারণত যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী—সেই অতি দূরে-সরে-থাকা, নির্লিপ্ত ঈশ্বরের মতো নন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কাজে সদা তৎপর। মমতা-মাখানো হাত দুটি দিয়ে তিনি প্রগতির হাল ধরে আছেন। শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁর অতুলনীয় নেতৃ-প্রতিভার উপর, তাঁর সামরিক জ্ঞান ও সাম্রাজ্য-সংগঠনী কুশলতার উপর। শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখেছিলেন এক ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের, আর এই স্বপ্নকে সিদ্ধ করার জন্যই কুরুক্ষেত্রে অগণিত ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাকে বিনাশ করে এক সুবিশাল, সংহত ধর্মরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন।[৩৩]

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধর্মরাজ্য স্থাপনের এই আদর্শের প্রতি চরমপন্থীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তার বাস্তবায়নের পিছনে যে সংগ্রামী মনোভাব কাজ করেছিল তাও তাঁদের মনোমত। ধর্মরাজ্যকে স্বরাজের সঙ্গে অভিন্নজ্ঞান করা, সন্ত্রাসবাদকে ধর্মযুদ্ধের সমগোত্রীয় ভাবা তাঁদের

কাছে অতি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্ম-রাজ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের পররাজ্যলিপ্সু উগ্র জাতীয়তাবাদের কোনও সাদৃশ্য ছিল না। হ্বাগ্‌নার তাঁর বিভিন্ন গীতিনাট্যে জাতীয়তাবাদের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন তারও কোনও সমর্থন ছিল না বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। তিনি যে মানব ধর্মের কথা বলেছিলেন তা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া অনুসরণ কবা দুরূহ হলেও হয়তো অসম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় জগতের এই মুক্তির সাধনাকে তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের থেকে কঠিনতর বলে মনে করতেন।[৩] নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলবিধানের প্রয়াসেই তা অর্জিত হতে পাবে। রুশোর 'এমিল'-এর ছায়া যে উপন্যাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় তার নায়িকা দেবীচৌধুরানীর পাঠ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত নিবাসক্তিব উপদেশ।[৫] এই শিক্ষার নির্যাস ছিল ভক্তি, আর এর পরিণতি মানবপ্রীতি ও মানব সেবা।

শতাব্দীর ক্লান্ত অবসানে বঙ্কিমের দর্শন বুদ্ধিজীবীদের প্রবল আকর্ষণ করে। যুগের প্রয়োজনে তিনি অদ্বৈতবাদের সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্বের একটা সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ঈশ্বরে সাকারত্ব আরোপেব জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি, তবে ঈশ্বরের নিরাকারত্ব উপলব্ধির আগে তাঁর অবয়বী-রূপ-কল্পনা সাধনার পথ সহজতর করে দেয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। আবার, অবতারবাদের মধ্যে ঈশ্বরের নরদেহ ধারণের চেয়ে মানুষের দিব্যত্ব অর্জনের ইঙ্গিতই তিনি দেখেছিলেন। তাই সমগ্র জীবলোকের আদর্শ হিসেবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিত্রিত করেছেন। কৃষ্ণ চরিত্রের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করে তিনি দেখালেন যে শুধু ফরাসী নয়, হিন্দু চিন্তাধারার প্রচ্ছায়ে মানব সমাজের অন্তহীন প্রগতির সম্ভাবনাও রয়েছে। পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বঙ্কিমচন্দ্র আহরিত অস্ত্রগুলি এদেশের ইংরেজ ঘেষা, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞেয়বাদীদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে দিয়েছিল ; আবার হিন্দু ধর্মতত্ত্বের যুক্তিসিদ্ধ, সর্বজনগ্রাহ্য এবং মানবিক-চেতনায়-উদ্বুদ্ধ বিচার নীরব করে দিয়েছিল মৌলবাদীদের। বেন্থাম প্রচারিত 'বহুজন হিতের' আদর্শ থেকে হিন্দু সাধনার লক্ষ্য (পরভূতহিত) যে মহত্তর এবং ব্যাপকতর তা সুনিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হয়েছিল সকলের কাছে তাই বলে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু অতীত-মূল্যবোধে আবিষ্ট হয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি বিরূপ হননি। মুক্তি অর্জনে সহায়ক বলে প্রতিটি ভারতবাসীরই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন, আবার পশ্চিমের বস্তু-সর্বস্বতার সংযত সমালোচনা করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ, দৃঢ় সেতু-মুখের স্থপতি যার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ প্রতীচ্যের প্রবল শক্তির প্রাণ-কেন্দ্র—আমেরিকায় অভিযান চালিয়েছিলেন।[৬] আর এ দেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির সংঘাতে দিশেহারা, বিদেশী শাসনের ভারে নিষ্পিষ্ট, অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভ্রান্ত লক্ষ লক্ষ 'ক্লৈব্যগ্রস্ত অর্জুন' তাঁর বাণীতে উদ্বোধিত হয়েছিল।

নরমপন্থীদের নীতি ও কর্মপন্থার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্রই চরমপন্থীদের অনুসৃতব্য পথ আলোকিত করে দিয়েছিলেন। "একটি ভাষা, একটি সাহিত্য এবং একটি জাতির স্রষ্টা" রূপে বন্দিত এই মানুষটি কোনও অর্থেই উচ্চপদ ও ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতা বা সমাজ সংস্কারক ছিলেন না। তাই স্বাভাবিক কারণে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন উনবিংশ শতকের সেই সব তরুণের অগ্রদূত যাঁরা নরমপন্থীদের সকরুণ আবেদন-নিবেদন-বিবৃতিদানের কর্মসূচীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রস্তাব ও নিষ্ফলা বার্ষিক অধিবেশনগুলি তাঁদের কাছে প্রহসন হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের

কাছেই এই শিক্ষালাভ ঘটে যে জাতির ভবিষ্যৎ কোনও মতেই ঐ "অ-জাতীয় কংগ্রেস" অথবা "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে"র উপর নির্ভরশীল হতে পারে না ।[৩৭] কমলাকান্তের মুখ দিয়ে তিনি অক্ষম উপরোধের হীন-সারমেয়-নীতি ছেড়ে দিয়ে চরমপন্থীদের বৃষ-তুল্য বিক্রমপ্রকাশের উপদেশ দিয়েছিলেন । তিনি তাদের সামনে দেশমাতৃকার যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাতে মায়ের দ্বিসপ্ত কোটি ভুজে ধৃত ছিল—ভিক্ষা-ভাণ্ড নয়, খর করবাল । ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে যে নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটেছিল তার কাছে কংগ্রেসের 'বাবু' সদস্যদের দীর্ঘ-ভাষণ, বাংলার আইন পরিষদে বিতর্ক বা প্রশ্ন উত্থাপন করে সরকারী কাজকর্মে বাধা দানের ছেলেখেলা বা কলকাতা কর্পোরেশনে বিচিত্র কৌতুক সৃষ্টি[৩৮] করে পৌরশাসনের কর্মসূচী পণ্ড করে দেওয়ার প্রতিভা অবজ্ঞার বিষয় হয়ে উঠেছিল । এঁদের হৃদয়ে বঙ্গ-জননীর প্রতি নিখাদ ভালবাসা, তাঁর অসামান্য মহিমার প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তি বঙ্কিমচন্দ্রই সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন, তিনিই তাঁদের দীক্ষিত করেছিলেন "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে ।

অরবিন্দ এবং তাঁর সমসাময়িকদের উপর 'আনন্দমঠে'র প্রভাব ছিল প্রগাঢ়, যদিও তাঁর লেখা 'ভবানী মন্দির'কে আনন্দমঠের অনুকৃতি বলে মনে করা যায় না ।[৩৯] মারাঠা জাতির উদ্বোধনে শিবাজী-আরাধ্যা ভবানী ইতিপূর্বেই একটি মহৎ ভূমিকা নিয়েছিলেন । বালগঙ্গাধর তিলক পরবর্তী কালে শিবাজী-উৎসবে যে নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছিলেন বরোদায় থাকার সময় অরবিন্দ তা উপলব্ধি করেন । মনে হয়, আনন্দমঠের তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে অরবিন্দ-মানসে উদ্ঘাটিত হয়নি । বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ অরবিন্দের পক্ষে তা ক্ষমার্হ, বিশেষ করে যখন আধুনিককালের বহু পণ্ডিতেরই এই গ্রন্থটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই । তিনি এবং অন্যান্য চরমপন্থী নেতারা ধরেই নিয়েছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ একান্তরূপে ধর্ম-নির্ভর, হিন্দু ধ্যান-ধারণা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং তার শিকড় প্রোথিত হয়ে আছে বিশুদ্ধ বাঙালীয়ানায় । 'আনন্দমঠে'র 'মা যাহা হইয়াছেন'—সেই কৃষ্ণবর্ণা, করালবদনা নগ্নিকা কালীমূর্তি অরবিন্দের কাছে বহু শতাব্দীর শোষণ নিপীড়নের প্রতীক বলে প্রতিভাত হয়েছিল । আর সন্তানদের উদ্দেশে সত্যানন্দের উদাত্ত আহ্বানের মধ্যে তিনি আসুরিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের রণোন্মাদনা জাগাবার ডাকই শুনেছিলেন ।[৪১] অসুর বিনাশিনী, যশ, জ্ঞান, শক্তি, সৌভাগ্য ও সাফল্যের প্রতীক দেবী দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠেছিল অরবিন্দের স্বপ্নের দেশ-মাতার মূর্তি । তা কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলিত জাতীয়তাবাদ নয়, তা আইরিশ ও রুশ পপ্যুলিষ্ট আদর্শে গড়া পৌরাণিক হিন্দুর অসহিষ্ণু, একমুখী, চরম জাতি-বৈর-প্রণোদিত দেশপ্রেম । অরবিন্দ তৈরী করতে চেয়েছিলেন মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত নতুন 'সন্তান দল' । দেশপ্রেম তাঁর কাছে ধর্মের বিকল্প হয়ে উঠেছিল ।

কিন্তু আনন্দমঠের প্রস্তাবনা ও উপসংহারের প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ না দেওয়ার ফলে অরবিন্দ এবং তাঁর সহকর্মীরা (এবং তাঁদের সাম্প্রতিক কালের অনুগামীরাও) বিভ্রান্ত হয়েছিলেন । তাঁরা ঐ দুটি অধ্যায়ে লেখকের বক্তব্যকে অনুচিন্তা বা ব্রিটিশ বিদ্বেষ গোপন রাখার কৌশল বলেই ধরে নিয়েছিলেন । কিন্তু এ জাতীয় সিদ্ধান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রতি সুবিচার করে না, অবিচার করে ধর্মসম্পর্কিত তাঁর আজীবন-পোষিত ধ্যান-ধারণার প্রতি । 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সত্যানন্দের গুরু স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বরের বিধানেই ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসেছে এবং তারা এ দেশে কর্তৃত্ব করবে যতদিন না ভারতসন্তানগণ জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি, ধর্মের সঙ্গে কর্মের মিলন ঘটাতে পারবেন । তিনিই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে সর্বপ্রকার উদ্যোগের সঙ্গে বৈরাগীর নিঃস্বার্থ মনোভাব,

হিতসাধনের প্রচেষ্টার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির জন্য আকুলতা মিলিত না হলে মুক্তির শুভদিন আসবে না। আনন্দমঠ উপন্যাসের সন্তানেরা এই মহামূল্যবান সমন্বয় করতে পারেননি। মহেন্দ্রের সামনে যে ভবানন্দ বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন তিনিই আবার মহেন্দ্র-জায়া কল্যাণীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁকে লাভ করার জন্য সন্ন্যাসীর ব্রত ভঙ্গ করতেও পশ্চাৎপদ হননি। শান্তির বিদ্রোহ লক্ষণীয়।

'বিবিধ প্রবন্ধে' সংকলিত দুটি রচনা—'ভারতকলঙ্ক' এবং 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা'—'আনন্দমঠে'র সম্পূরক হিসেবে পাঠ করলে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনিবার্য। এই দুটি রচনার মধ্যেই দেখি একজন সমাজতাত্ত্বিক কিভাবে ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার দুর্গতির মূল কারণগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিধাহীন ভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশের সকল দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী করেছেন—(১) মুক্তির জন্য এ দেশের মানুষের প্রকৃত আকুলতার অভাবকে এবং (২) হিন্দু সমাজের অনৈক্যকে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সামাজিক সংহতির এই শোচনীয় অভাবই জাতীয় চেতনায় উদ্দীপিত হবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে মাত্র দুটি জাতি—মারাঠা ও শিখ ছাড়া অন্যান্যদের জাতীয় সংহতি অর্জনে সফল হতে দেখা যায়নি। আর প্রকৃত জাতীয়তাবাদের স্বরূপ উপলব্ধির ব্যাপারে পরোক্ষ ভাবে ভারতীয়দের সহায়তা করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের প্রতি ন্যায়বোধ উদ্দীপিত করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যদি ইংরেজ সরকারের প্রশংসা করে থাকেন তা তাঁর সত্যনিষ্ঠারই পরিচয় দেয়। এটাও মনে রাখা দরকার যে 'ধর্মতত্ত্বে'র স্রষ্টার কাছে দেশপ্রেম কোনও ক্রমেই ধর্মের বিকল্প হতে পারে না। দেশপ্রেম মহত্তর একটা লক্ষ্য পূরণের জন্য অতি প্রয়োজনীয়, হয়তো-বা অপরিহার্য একটা উপায় হিসেবেই বিবেচিত হবার যোগ্য। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে এই 'লক্ষ্য'টি 'জাগতীকি প্রীতি' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।[৩২] কিন্তু চরমপন্থীদের কাছে দেশপ্রেমই ছিল অনন্য লক্ষ্য।

অধ্যাপক ক্লার্ক বলেছেন যে চরমপন্থীদের কর্ম-পন্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে প্রবণতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তার অন্যতম উৎস বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা।[৩৩] বলা বাহুল্য এ জাতীয় মন্তব্য খণ্ডিত মূল্যায়নের ফল। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী কখনোই সৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেনি। তাঁর রচনায় নিন্দিত হয়েছিলেন কেবলমাত্র অত্যাচারী বা অপদার্থ মুসলমান শাসকবর্গ। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা চলতো যদি তিনি আকবর বা হুসেন শাহর মতো কোনও সুশাসকের কুৎসা করতেন। কিন্তু তাঁর দুটি উপন্যাস আওরঙ্গজেব বা কতলু খাঁর মতো চরিত্রকে কেন্দ্র করেই রচিত। আনন্দমঠের পরিপ্রেক্ষিতে রয়েছে ডায়ার্কি আমলের ক্লৈব্যগ্রস্ত নবাব। আর এ কথাটা ভোলাও অনুচিত যে অক্ষম ও ব্যর্থ হিন্দু শাসকবর্গের প্রতি তিনি নির্মমতর। হিন্দু দেশনায়কদের ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা এবং অসাফল্যের জন্য কতোবার যে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেছে তা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ভোলা সম্ভব ছিল না। পশুপতির আকাশ-ছোঁওয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভবানন্দের ইন্দ্রিয়াসক্তি, গঙ্গারামের নীচতা, সীতারামের যৌনমোহ এবং মুসলমান শাসকের দুরাচার সমভাবেই ধিকৃত হয়েছে তাঁর লেখায়। লক্ষণসেনের আমলে প্রশাসন এবং রাজসভার অধঃপতন তাঁর থেকে ভাল করে কে চিত্রিত করতে পেরেছেন? শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার অপরাধে কেউ কখনো তাঁর দ্বারা আক্রান্ত হননি। চন্দ্রশেখরের উপনায়ক মীরকাশিম রাজসিংহের চেয়ে কম গুরুত্ব পাননি, পাপিষ্ঠা জেবউন্নেসাও তাঁর অসীম করুণার পাত্রী। আয়েষা তাঁর ভাষায় 'রমণীরত্ন', দলনীবেগম শৈবলিনীর চেয়েও সাধ্বী। আজীবন ধর্ম ও নৈতিকতার যে মান তিনি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন তার থেকে যারই অধঃপতন হয়েছে

তিনিই সমালোচিত হয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। অন্যদিকে চরমপন্থী নেতা তিলকের মুসলমান বিরোধিতার মধ্যে নৈর্ব্যক্তিকতার আভাস খুঁজে পাওয়া শক্ত। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ঐতিহ্যই যে তাঁর মধ্যে এই প্রবণতা প্রখরতর করে দিয়েছিল তা একটা ঐতিহাসিক সত্য। লালা লাজপৎ রায়-এর ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উৎস ছিল 'আর্যসমাজে'র আদর্শ এবং কর্মপন্থা। পঞ্জাবী শিখদের মনে মুসলমান শাসনের যে তিক্ত স্মৃতি তখনো রয়ে গিয়েছিল তার উপর ভিত্তি করেই আর্যসমাজ আন্দোলন দানা বেঁধেছিল। চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল স্বয়ং লিখেছিলেন : "এই তথ্যটা কোনও অর্থেই অকিঞ্চিৎকর নয় যে বহু শতাব্দী ধরে হীনমন্যতার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুরা খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং বহিরাগত এই ধর্ম দুটি যে অলৌকিকত্ব প্রচার করে আসছিল, তার বিরুদ্ধে বৈদিক ধর্মের অভ্রান্ততা (যার প্রবক্তা ছিলেন দয়ানন্দ) প্রমাণে সক্ষম হয়েছে।"[৪৪] ওয়াহাবী আন্দোলন-প্রসূত অসহিষ্ণুতা এবং আলিগড় গোষ্ঠীভুক্ত মুসলমানদের স্বাজাত্যভিমানের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসেবেই হিন্দুদের মধ্যে এই উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্ম হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নন, দয়ানন্দই ছিলেন সৈয়দ আহমদের প্রতিদ্বন্দ্বী।

বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ছিল দূর ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত ; তার বিকাশ ও সংহতি-রক্ষা নির্ভর করতো এমন সমাজ-সচেতন মানুষের উপর যাঁরা মানব-হিতের জন্যই প্রকৃতির সম্পদ নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী। অপর পক্ষে, অরবিন্দ তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন প্রধানত অতীতের উপর। তাঁর কল্পনার ধর্মরাজ্যের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের খুব বেশী তফাৎ ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্য-বোধের উপরই তাঁর বিরাগ। জীবনকে যুগোপযোগী করায় তাঁর প্রায় কোনও আগ্রহই ছিল না। স্পেঙ্গলারের মতো তিনিও ছিলেন ইউরোপীয় সভ্যতার অবক্ষয় সম্বন্ধে নিঃসংশয়, আর সনাতন ভারতীয় সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই যে প্রতীচ্যের পরিত্রাণ—সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী। তিনি লিখেছিলেন, "মানব জাতির ভবিষ্যতের জন্য ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদ অপরিহার্য বলে আমাদের শুধু আপন রাজনৈতিক ও আত্মিক মুক্তির জন্য সংগ্রামই যথেষ্ট নয়। নিখিল বিশ্বের মানবাত্মার মুক্তিপ্রয়াসী হওয়া আমাদের কর্তব্য।"[৪৫] তাঁর বিচারে যে প্রাণঘাতী রোগে পশ্চিমী সমাজ আক্রান্ত, ভোগাসক্তিই তার উপসর্গ। আর এই অদম্য বাসনাকে তীব্রতর করে তুলেছে এমন এক ধর্মবিশ্বাস যা কুসংস্কারেরই নামান্তর ; যা মানুষকে কেবলই ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রিয় সুখের জন্য দুর্নিবার এই পিপাসাই পশ্চিমী দেশগুলির অন্তহীন শিল্পায়নের মূল, সেখানকার যন্ত্র-নির্ভরতা সর্ব রকমে খর্ব করে দিচ্ছে অসংখ্য শ্রমজীবীর জীবন। তাছাড়া শিল্পায়নের দোসর হিসেবে দেখা দিয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবনীয় স্ফীতি, সর্বত্র স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে কদর্য ও অপ্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভার। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের হাত ধরেই এসেছে এক অদ্ভুত ধর্ম যার প্রচারকরা ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর না করে গোলাবারুদের ক্ষমতার উপরই বেশী বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। এঁদের পরভূমি গ্রাসের ক্ষুধারও শেষ নেই। আর এই সব হীন, অশুভ প্রবৃত্তি ও লোভ তাঁরা ঢাকতে চেষ্টা করেছেন 'সাম্রাজ্যবাদ' নামে এক ছলনার আবরণে।[৪৬] বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর সৃষ্ট সেই অবিস্মরণীয় চরিত্র—অহিফেন-সেবী কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বস্তুতান্ত্রিকতা সম্পর্কে সাবধান বাণী শুনিয়েছেন। তবে তাতে প্রচারকের উন্মাদনা নেই। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের ধর্ম সম্পর্কিত মতবাদ পশ্চিমী জগতের উপর চাপিয়ে দিতে চাননি।

চরমপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীটা কিন্তু অন্যরকম ছিল। উগ্র স্লাভ আন্দোলন যেমন পশ্চিমী

সভ্যতার সম্প্রসারণ-রোধে সন্তুষ্ট না থেকে তাকে প্রতি-আক্রমণ করতে চেয়েছিল, তেমনি চরমপন্থীদের মধ্যেও একটা রুষ্ট অসহিষ্ণুতা দেখা যায়। নিকোলাই ড্যানিলেভস্কি, নিকোলাই চার্নিসেভস্কি, ডষ্টয়েভস্কি, গোগোল প্রমুখ 'শ্লাভোফিল' চিন্তানায়কদের সঙ্গে অরবিন্দের মিল ছিল এখানেই। রাশিয়া এবং ইউরোপের বাকি অংশের পার্থক্যটাকে একটা ঐতিহাসিক সত্য বলে বিশ্বাস করতেন ড্যানিলেভস্কি। পশ্চিমী সভ্যতার অধঃপতন সম্পর্কেও তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না। রোমান সাম্রাজ্যের আগ্রাসী ও হিংসাশ্রয়ী ঐতিহ্যের ধারক হওয়ায় ইউরোপের দেশগুলি নির্বিচারে খ্রীস্টধর্ম প্রচার, পররাজ্য গ্রাস এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করেছে। এই হীনতা ও সঙ্কীর্ণতার পাশেই সহিষ্ণু, শান্তিকামী শ্লাভসংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ড্যানিলেভস্কি। রুশ সমাজ ও সংস্কৃতির উপর পশ্চিমী সভ্যতার যাতে কোনও প্রভাব এসে না পড়ে সে বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আর, চার্নিসেভস্কি লিখেছিলেন : "আমরা বিশ্বাস করি যে মানব সভ্যতার ইতিহাসে আমরাই একটা নতুন আদর্শ যুক্ত করবো। ইউরোপের জীর্ণ, বাতিল-হয়ে-যাওয়া চিন্তাধারার অনুসরণ নয়, বিশ্ববাসীকে আমরা পরিচিত করাবো আমাদের মৌলিক ভাবধারার সঙ্গে।" ডষ্টয়েভস্কির মুখে শোনা গিয়েছিল এই প্রত্যয়ী ঘোষণা : "রুশ জাতীয়অবাদের প্রবল আকর্ষণ নিহিত আছে তার মানবতা ও বিশ্বপ্রেমের আদর্শের মধ্যে। হতে পারে আমাদের জাতি দরিদ্র কিন্তু খ্রীস্টও কি সার্ফের বেশে দরিদ্রদের মধ্যে বিচরণ করেন নি ? তাঁর সর্বশেষের বাণী মূর্ত করতে আমরাই সক্ষম ; রাশিয়াই বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছে বৃহত্তর ইউরোপ এবং বিশ্বমানবতার আদর্শের বাস্তব রূপায়নের জন্য।" বজ্র নির্ঘোষে ধাবমান ত্রি-অশ্ববাহিত একটি রথের চিত্রকল্পের মধ্যে গোগোল দেখেছিলেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাশিয়ার অগ্রগতির ছবি।[৪৭] পশ্চিমী দেশগুলিতে বিবেকানন্দের অবিস্মরণীয় 'ধর্মবিজয়ের' মধ্যে অরবিন্দ ঐ রকমই একটা দৃশ্য দেখেছিলেন।

(২)

বিবেকানন্দ ও চরমপন্থার আদর্শ

অরবিন্দের ধারণা অনুযায়ী ভারতীয় নবজাগরণের তিনটি পর্যায় ছিল। "পশ্চিমের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে স্বদেশের সনাতন ধ্যানধারণার বহু উপাদানের পুনর্মূল্যায়ন ও বর্জনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এই উদ্যোগ। পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছিল ভারতবর্ষের চিন্ময় লোকের তীব্র প্রতিক্রিয়া। কখনো প্রতীচ্য সংস্কৃতির প্রত্যাখ্যান, কখনো-বা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উপর নতুন ভাবে গুরুত্ব আরোপ ও নবতর ব্যঞ্জনার সংযোজন শুরু হয়েছিল। শুধুমাত্র ভারতীয় বলে পুরোনো সংস্কৃতির সমস্ত কিছু সমর্থন ও জাতীয় জীবনে সেগুলির সাঙ্গীকরণই হয়ে উঠেছিল এই পর্যায়ের চিন্তানায়কদের প্রধান কাজ। এর পরে আরম্ভ হয় আত্মীকরণের এক সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া। সনাতন ধ্যান-ধারণাগুলিকে সমর্থন করতে গিয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রাচীন ও নবীন—ঐতিহ্যবাদী ও তার সমালোচক—উভয়পন্থী মানুষের তুষ্টি বিধানের একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যাবর্তনের পূর্ণতর রূপ একটা সমন্বয়ধর্মী পুনর্ব্যাখ্যার নীতি গ্রহণ করে। তা প্রাচীন সংস্কৃতির বাহ্য আঙ্গিক কোনও কোনও সময় পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেও জীর্ণতাকে বর্জন করেছিল,

নতুন যা কিছু প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে খাপ খায় বা তাকে বৃহত্তর বিবর্তনের দিকে নিয়ে যায় তাকেও গ্রহণ করেছিল। বিগত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন এবং পুনর্বিন্যাসের দ্বারা সংরক্ষণের এই উদ্যোগের প্রাণ-পুরুষ ছিলেন বিবেকানন্দ।"[৩৮] জীবনের প্রথম পর্বে মিল, স্পেন্সার এবং কোঁৎ এর মধ্যে মানব ব্যাধির নির্ণয় ও নিদান, মানব সমাজের সমস্যা ও সমাধান ব্যাকুলভাবে খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন বিবেকানন্দ। কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞানালোক তিনি নির্বিচারে বরণ করতে চান নি ; আবার ভারতের জীর্ণ সংস্কার, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্বতার প্রতি তাঁর বিরাগও গোপন থাকেনি। এই জন্যই তাঁকে দার্শনিক-অনুসৃত মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে দেখা গিয়েছিল।

আধ্যাত্মিক জগতে বিবেকানন্দের ভূমিকা শিল্পের রাজ্যে মিকেলাঞ্জেলোর সঙ্গেই তুলনীয়। বিবেকানন্দকে প্রায়ই বলতে শোনা গেছে যে একসময় নিদ্রাবেশে তাঁর সামনে ভেসে উঠতো দুটি জীবনাদর্শ—একটি প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার, অপরটি সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর। প্রাচীন ভারতবর্ষের পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানপ্রসূত সফল পার্থিব জীবনের আকর্ষণের টানাপোড়েনে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল তরুণ বিবেকানন্দের মনোজগৎ। বহু দিন এমনি করেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়েছিলেন মিকেলাঞ্জেলো। গ্রীক-লাতিন ধ্রুপদী রীতি, নিও প্লেটোনিক আদর্শবাদ এবং রেনেঁসাস পর্বের বাস্তববাদের দ্বন্দ্বে তিনি দোলায়িত হয়ে উঠেছিলেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখেছেন, সর্বশক্তিমান ও পরম কারুণিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিবেকানন্দের মনে যে সংশয় মিল সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে প্রায় প্রত্যয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন হিউম এবং স্পেন্সার। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে নিহিত অশুভ শক্তি রোধে কোঁৎ-প্রচারিত মানবধর্মের ব্যর্থতাই তাঁকে এ সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের তুরীয়বাদ ও স্বজ্ঞানির্ভরতা তাঁর সংশয় দূর করতে পারেনি। তাঁর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়, তাঁর প্রবল ও প্রচণ্ড আবেগ হেগেল-কথিত বিশ্বজনীন হেতুবাদে তৃপ্ত হয়নি। মনের এই দিশাহারা অবস্থাতেই তাঁর জীবনে, মমতাময়ী মাতার মতো, আবির্ভাব ঘটে রামকৃষ্ণের। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যে দাবী কখনো করেননি—ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার সেই অসাধারণ দাবী—অবলীলায় উচ্চারিত হলো রামকৃষ্ণের কণ্ঠে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের থেকেও নিবিড়তর ভাবে ধর্মকে উপলব্ধি করা যে সম্ভব—সে কথা ঘোষণা করলেন তিনি। অবশ্য প্রথম প্রথম প্রখর যুক্তিবাদী বিবেকানন্দের সংশয় লুকোনো থাকেনি। কিন্তু তাঁর শুষ্ক হৃদয় একটি স্নিগ্ধ নির্ঝরের জন্য তৃষিত হয়ে উঠেছিল। রামকৃষ্ণের সরল ঘোষণার মধ্যে সত্যের নির্ভুল ঝঙ্কার তাঁর মর্মমূলে প্রবেশ করেছিল ; আর স্পর্শের আগুনে তাঁর প্রবল অহংবোধ এক সর্বগ্রাহী শূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এ কি মায়া, না পরম উপলব্ধির উন্মীলন ? দক্ষিণেশ্বরে এই অলোকসামান্য সাধকের সান্নিধ্যে থেকেও দীর্ঘ ছ'বছর বিবেকানন্দ তাঁর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অটুট রাখার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু একটু একটু করে ভেঙে গিয়েছিল তাঁর সমস্ত প্রতিরোধ—কখনো কোনও সঙ্গীতের মূর্ছনায়, কখনো-বা ক্ষণিক সোহাগ স্পর্শে, আবার কখনো হয়তো রামকৃষ্ণের সমাধির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভিঘাতে। অবশেষে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের মধ্যেই বিবেকানন্দ লাভ করলেন পরমশান্তি।

নতুন জীবনে প্রবেশ করে বিবেকানন্দের মনে হলো এই সন্ন্যাসীর জীবন ও বাণীর মধ্যে ক্ষীণতম অমিল নেই, তিনি ঈশ্বর প্রাপ্তির বাসনায় অন্য সমস্ত বাসনা কামনা হেলায় ত্যাগ করেছেন। "জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিত চিকীর্ষা, উদারতায় জমজমাট," "আকাশের মতো নিঃসীম, সমুদ্রের মতো অতলান্ত, হীরকখণ্ডের মতো সুকঠিন এবং স্ফটিকের মতো

স্বচ্ছ" রামকৃষ্ণ তাঁর কাছে প্রাচীন ভারতের সমস্ত ধর্মীয় ভাবধারার মূর্ত প্রতীক রূপে প্রতিভাত হলেন। তাই তিনি লিখলেন : "হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলির প্রকৃত বক্তব্য ও নির্যাস, শুধুমাত্র তাঁকে প্রত্যক্ষ করেই আমি অনুধাবন করতে পেরেছি।"[১১] অতুলনীয় এই গুরু অদ্বৈতবাদের তাৎপর্য শিক্ষাদানের সঙ্গে শিষ্যকে 'মায়ের' দিব্য উপস্থিতির বলয়ের মধ্যেও টেনে নিলেন। ইউরোপীয় দর্শন ব্যর্থ হলেও দক্ষিণেশ্বরের অভিজ্ঞতা বিবেকানন্দের এই বোধ স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, বিচিত্র অস্তিত্বের মধ্যে বিরাজ করছে পরম ঐক্য, আর সীমা ও অসীমের লীলা তারই মধ্যে সক্রিয়। রামকৃষ্ণের ভাষায়, "কখনও মনে হয় তিনিই আমি, আমিই তিনি, আবার কখনো মনে হয় আমি তাঁর অংশমাত্র।" অদ্বৈতভূমিতে সমাধি, আর দ্বৈতভূমিতে মা ও সন্তান। চিৎপ্রকর্ষের এই উত্তুঙ্গস্তরে পৌঁছলে জীবনের কোনও অভিব্যক্তি, কোনও চেষ্টাই নিরর্থক বলে মনে হয় না, কেন না মানুষ তখন নিরন্তর এক সত্য থেকে অপর এক সত্যে উত্তরণ করছে। বিশ্বজনীনতা কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িক সত্যও নয়, আবার সব মতের জগাখিচুড়ি কোনও নতুন মতবাদও নয়। বিভিন্ন মতবাদকে বিচিত্র ভূখণ্ডের উপর দিয়ে ধাবমান কিন্তু এক সমুদ্র-লক্ষ্যাভিমুখী নদ-নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। যাত্রা শেষে নদ্-নদী যেমন সাগরে লীন হয়ে যায়, তেমনি সিদ্ধিলাভ করলে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই দক্ষিণেশ্বরেই বিবেকানন্দ দেখা পেয়েছিলেন সেই শুদ্ধশীল সন্তের যিনি পাপের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনিই তো বারবার বলেছেন—"মায়ের কোনও সন্তান কি পাপী হতে পারে ?" সে তো নিত্য বুদ্ধ মুক্ত শুদ্ধ, তার চৈতন্য চিরন্তনের স্পর্শে উদ্ভাসিত। সে কেবল জানে না সে কে। রামকৃষ্ণ বাস করতেন এক জনবহুল, কর্মমুখর নগরীর উপান্তে এবং নিশিদিন ঐশ্বরীয় কথায়, ঈশ্বর সান্নিধ্যে কাটালেও চারপাশের গৃহী নরনারীর দুঃখ বেদনা বিস্মৃত হননি। নিজে মুক্ত হলেও তাঁর সাধনা ছিল সকলের মুক্তি। তবে সে মুক্তির পন্থা "শুকনো সন্ন্যাসীর"নয়, রসে বশে, নাচেগানে চলতো তাঁর অদ্ভুত শিক্ষাদান, যার শেষ—আত্মোপলব্ধি। 'জীব' তখন রূপান্তরিত হয় 'শিবে'।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উপর এক মহৎ ব্রত পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। সে দায়িত্ব—বিচার, বিবেক ও উক্তির সাহায্যে নরের মধ্যে নারায়ণকে জাগ্রত করা। কিন্তু গুরুর তিরোধানের পর পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ কি দেখলেন ? তুষারমৌলি হিমালয় থেকে সমুদ্র-চুম্বিত কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পথের ধুলোর মধ্যে তাঁর অন্বিষ্ট শিব অগণিত নিরন্ন, ক্লিষ্ট জীবের মধ্যে ধুঁকছে। এ সময় একটা প্রশ্ন তাঁকে বিচলিত করেছিল। তিনি কি আত্ম-সমাহিত হয়ে একক সাধনায় মগ্ন থাকবেন, অথবা নরনারায়ণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবেন ? হয়তো এমনি এক সময়েই সেই সাধক শ্রেষ্ঠের নির্দেশ মেঘমন্দ্র স্বরে তাঁর হৃদয়ে ধ্বনিত হয়েছে : "কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস ?" নির্বিকল্প সমাধি লাভের থেকেও বড়ো এক সাধনার জন্য তিনি প্রেরিত—সে সাধনা "পৃথিবীকে মূল পর্য্যন্ত নাড়িয়ে দেবে"।

শিকাগোতে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে বিবেকানন্দ যখন প্রতীচ্যের প্রমিথিউস-সদৃশ প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখনও, মনে হয়, সংশয়ের কিছুটা কুয়াশা তাঁর মনে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু এ দ্বিধা সাময়িক। ঐ মহাসম্মেলনেই তিনি বেদান্তকে নতুন করে উপস্থাপিত করলেন, প্রচার করলেন রামকৃষ্ণ-কথামৃত, শোনালেন, সকলেই অমৃতের অধিকারী, অপরোক্ষ-অনুভূতি হিন্দুধর্মের মূল, ধর্ম অসীম, অনন্ত তার

পথ, বহুত্ববোধে মায়ার জন্ম, তার থেকে আসে দুঃখ, ভয়, মৃত্যু ; আর এক-রমতা বা সমতাই ঈশ্বর, তিনি অন্তরে বাইরে বিরাজমান। তাঁকে বোঝার জন্য তিনি আমেরিকায় যোগ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলেন।[৩০] কিন্তু তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে তিনি কী বাণী প্রচার করবেন ? তারা যে একই সঙ্গে বিদেশীর পদানত ও ষড়রিপুর ক্রীতদাস ! ক্ষিধের জ্বালার সঙ্গে আধ্যাত্মিক অতৃপ্তিতে কাতর ! জাতিভেদের লাঞ্ছনা এবং সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন তাদের শতধা-বিভক্ত করে রেখেছে। ভারতবর্ষের অসীম সৌভাগ্য যে প্রচারকের আত্মতুষ্টি ও একদেশদর্শিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন বিবেকানন্দ। তাই একই সঙ্গে তিনি আক্রমণ করেছিলেন ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক অহঙ্কার, চারিত্রিক অনুদ্যোগ, কৃপা ভিক্ষার প্রবণতা, এবং অন্য দিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় অসামান্য সাফল্য-গর্বী, অপ্রতিরোধ্য সামরিক ক্ষমতাশালী ইউরোপীয়দের আত্মশ্লাঘা ও উচ্চমন্যতা। উভয়কে সমন্বিত করতে হবে, যেমন তাঁর গুরু করেছিলেন ধর্ম-মতের ক্ষেত্রে।

"চার যোগের চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে" (রোলাঁর কথা) বিবেকানন্দ পূর্ণ মানুষ তৈরী করতে চেয়েছিলেন, তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কালজয়ী সম্পদগুলি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বৈরাগ্য সাধনায় বিমুখ এই বীর সন্ন্যাসী পার্থিব জগতের সমস্যাগুলির প্রতি অনীহা দেখাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন কুরুক্ষেত্রের মতো দ্বন্দ্ব-মুখর এই জীবনই তপস্যার যথার্থ পটভূমি। রজঃগুণের আতিশয্য সম্পর্কে প্রতীচ্যকে আগেই তিনি সতর্ক করেছিলেন, এখন প্রাচ্যের মানুষকে তমোগুণের আধিক্যের বিপদ বিষয়ে অবহিত করতে শুরু করলেন। জীবের মধ্যে শিবের প্রকাশ (তত্ত্বমসি) সফল করার জন্য ভারতবর্ষ ও প্রতীচ্য উভয়েই পরস্পর-নির্ভর সে বিষয় তিনি অটল ছিলেন। যে আত্মিক প্রশান্তির মূল্যে পশ্চিম কিনেছে প্রতাপ ও ঐশ্বর্য একমাত্র ভারতই তা ফিরিয়ে দিতে পারে এবং ভারত যদি সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যায়, তবে মানব সভ্যতার সর্বনাশ অনিবার্য। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে উদ্ধত, পরস্বলোভী, বিষয়াসক্ত মানুষের সামনে ভারতীয় সংস্কৃতির অনন্যতা ও উদারতা অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছিলেন বিবেকানন্দ। কিন্তু স্বদেশে ফিরে ভারতবাসীর নিষ্ক্রিয়তা, মানসিক ও দৈহিক জড়তা, নৈতিক সাহসের অভাব ও ভেদাভেদ জ্ঞানের উপর তিনি বারবার তীব্র কশাঘাত করেছেন। 'আমরা অতুলনীয়, আমরাই 'শ্রেষ্ঠ'—অর্থহীন, দাম্ভিক এই চিন্তায় যাঁরা অনুক্ষণ মগ্ন হয়ে আছেন তাঁদের ধিক্কার দিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমরা অপদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়।" মহৎ অতীতকে আমরা কবেই ভুলেছি। বিস্মৃতি ও আত্মতৃপ্তির একটা খোলসের মধ্যে বহুকাল ধরে ঢুকে থাকার ফলে আমরা দিতে ভুলে গেছি, নেওয়ার শিক্ষাটাও লাভ করিনি। জাতির চারিপাশে আমরা গড়ে তুলেছি রীতিনীতির, বিধিনিষেধের এমন এক দুর্ভেদ্য পাঁচিল পরকে ঘৃণাই যার ভিত্তি। প্রাচীনকালে চারিপাশের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জাতিগুলির থেকে হিন্দুদের পৃথক অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যই যে এ ধরনের সামাজিক বিভেদের বেড়াজালের দরকার হয়েছিল—সেটা আমরা মনে রাখিনি। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছি দীর্ঘকাল। তার ফলে আমাদের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে রেনেসাঁস, রেফরমেশন, বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অসংখ্য আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং যুক্তিবাদের প্রবল বন্যা। এসব কিছুর থেকেই আমরা মুখ ফিরিয়ে থেকেছি। কিন্তু কিসের জন্য ? নিশ্চয়ই ধর্মীয় কারণে নয়, কেননা আমরা তো কেউই প্রকৃত বৈদান্তিক, পুরাণ-বিশ্বাসী অথবা তান্ত্রিক নই। আমরা ছুঁৎ-মার্গী, কেবলমাত্র বাছ-বিচারের ধর্ম মানি। আমাদের ধর্ম ঠাঁই পেয়েছে রান্নাঘরে, হাঁড়িকুড়ি আমাদের ঈশ্বর। "হিন্দুর ধর্ম বিচারমার্গে নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়—ছুঁৎ মার্গে," "আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না ; ব্যস। এই বামাচার

ছুঁৎ মার্গে পড়ে প্রাণ খুইয়ো না।" ব্যথিত চিত্তে বিবেকানন্দ দেখেছেন—এ দেশে ভক্তি ভাবালুতায় বিগলিত, গৈরিক সন্ন্যাসীর অক্ষমতা ঢাকার আবরণ, ইন্দ্রজাল স্থান নিয়েছে তপস্যার, ভাষ্যের সরলীকৃত, আরো জোলোভাষ্য কণ্ঠস্থ করার নামই বিদ্যাভ্যাস, আর ইতিহাস শুধুমাত্র পূর্বপুরুষের নির্জলা স্তুতি।

"বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে হবে"—বলেছিলেন বিবেকানন্দ। মানবসেবার প্রতি দৃষ্টি রেখেই বেদান্তের নতুন ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। দীনহীনকে উপেক্ষা করা হবে জাতীয় অপরাধ। অতীত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে এ রূঢ় সত্যটাও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে হিন্দু বা বৌদ্ধ শাসকদের আমলে প্রশাসনের সঙ্গে জনগণকে কখনোই যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়নি, তাদের মতামত কখনোই মূল্য পায়নি। অথচ আবহমান কাল ধরে তারা আমাদের শিক্ষাদীক্ষার অভ্রভেদী দেবালয় গড়ে তোলার ব্যয়ভার বহন করেছে।এ সব কিছুর বিনিময়ে তারা চিরদিন অবহেলিত হয়েই আছে। এ জন্যই তিনি বলতেন যে ভারতবর্ষকে আমরা যদি নতুন করে সৃষ্টি করতে চাই তাহলে এই উপেক্ষিত দীন-দরিদ্র মানুষের উন্নতি বিধান ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। আর, অন্যত্র, অতি বেদনার সঙ্গেই তিনি উল্লেখ করেছেন—"আমাদের সমস্ত দুর্দশার মূলে নিহিত আছে নারী জাতির প্রতি আমাদের অবজ্ঞা, তাঁদের 'নরকের দ্বার' বা 'ঘৃণ্যকীটের' সঙ্গে তুলনা করার হীন মনোবৃত্তি। স্মৃতির মতো শাস্ত্র রচনা করে, বিচারহীন কঠোর বিধিনিষেধের নিগড়ে রুদ্ধ করে মেয়েদের আমরা সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্র মাত্রে পরিণত করেছি।"

তা ছাড়া স্বদেশের মানুষের সামনে এ জিজ্ঞাসাও বিবেকানন্দ তুলে ধরেছিলেন যে প্রাণোচ্ছল ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের কী মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। প্রতীচ্যেব অন্ধ অনুকরণ মানুষকে প্রগতির পথে পৌঁছে দেয় না। আবার গ্রাম্য লোকাচার এবং কুসংস্কারের জঞ্জাল তো বৈদিক কর্মকাণ্ড বলে বিবেচিত হতে পারে না। অতি দুঃখের সঙ্গেই তিনি বলতেন যে ভণ্ডামীর এই পরিবেশে সুস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাটাও আমরা ভুলে বসে আছি। "সুগঠিত পেশীসমৃদ্ধ দেহ গঠন করলে গীতাব মর্মোদ্ধার সহজতর হয়। আমি তাই চাই লৌহকঠিন পেশী, ইস্পাত-দৃঢ় স্নায়ু, বজ্রের শক্তি দিয়ে গড়া মন।" শক্তি, পৌরুষ, ক্ষাত্র-বীর্য ও ব্রহ্মতেজ—এই উপাদানগুলিকেই তিনি অধ্যাত্মসাধনার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। আত্মা অজর, অক্ষয়, মুক্ত এবং চিরশুদ্ধ তা জেনেও আমরা যে আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি, নষ্ট করে ফেলেছি আত্ম-নির্ভরতা, শৃঙ্খলাবোধ, সংগঠনী শক্তি এবং সর্বোপরি ভালবাসার ক্ষমতা—এজন্য প্রায়ই তাঁকে দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যেতো। তিনি লিখেছেন, "যখনই ভারতবাসী 'ম্লেচ্ছ' শব্দ আবিষ্কার করিল এবং অপর জাতির সঙ্গে সংস্রব পরিত্যাগ করিল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্বনাশের সূত্রপাত হইল।" একমাত্র প্রেমই যে মানুষকে সর্বশক্তিমান করে তুলতে পারে—এ সুদৃঢ় বিশ্বাস বারবার ব্যক্ত করেছেন বিবেকানন্দ। "প্রেমই সব রুদ্ধ দুয়ার খুল দেয়। ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত করার জন্য যে বিপুল কর্মশক্তির দরকার একমাত্র ভালবাসাই তার উৎস হতে পারে।" অন্তহীন, সর্বপ্লাবী এই ভালবাসাই সহস্রধারায় রূপান্তরিত হবে সেবায়, বিশ্বাস রূপ নেবে কর্মের এবং এই দুই-এ মিলেই গড়ে তুলবে আগামী দিনের মানুষের চরিত্র।" বেদান্তের বিশুষ্ক অনুশীলন নয়, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা তাকে যুগের উপযোগী করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করবেন—এই ছিল তাঁর নির্দেশ। রামকৃষ্ণের মতো ধর্ম-বিশ্বাসী হয়েও এ দেশের মানুষের বিজ্ঞান সাধনার হিতকর দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। (বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের

সত্যানন্দ-গুরু-চিকিৎসকের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর মতামতের সাদৃশ্য বিস্ময়কর।) তাঁর অনুগামী শিষ্যদের তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে বৈরাগ্য বরণ করেও তাঁরা যেন সমাজসেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তাতে তাঁরাও উপকৃত হবেন। কর্মযোগের সোপান ধরে প্রথমে আত্মশুদ্ধি, ধ্যানভজনের সোপান ধরে পরে আত্মোপলব্ধি। সন্ন্যাসী সংসারকে চতুর্বিধ জ্ঞান দেবেন—অন্ন, শিক্ষা, আরোগ্য, ধর্ম।

১৯০৯ সালের ২৬শে জুন 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখেছিলেন : "পৃথিবীকে নিজের দুটি হাতে ধরে তাকে রূপান্তরিত করার জন্য যাঁর আবির্ভাব সেই পরমপুরুষই বিবেকানন্দের বিজয়ের পথ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, আর তা সমস্ত বিশ্বের কাছে এই সত্যটা পরিস্ফুট করে দেয় যে ভারতবর্ষ পুনর্জাগ্রত হয়েছে। এই নবজাগরণ শুধু টিকে থাকার জন্য নয়, তা বিশ্ববিজয়ের মতো মহৎ একটি কর্ম সম্পাদনের জন্যও।" চরমপন্থীরা প্রেরণা পেয়েছিলেন বিবেকানন্দ উচ্চারিত অতুলনীয় মন্ত্রে—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরাণ্ নিবোধত'। তাঁর 'অভিঃ'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে মৃত ল্যাজারাসের মতো তাঁরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মনে হয়েছিল মিথ্যে মায়ার মতো বিদেশী শাসনের ওই নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলাও সকলের পবিত্র কর্তব্য।[৫২] তাঁর প্রেরণা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে শিখিয়েছিল, কেননা, তাঁর ভাষায় "আমি মৃত্যুঞ্জয়ী, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বহু উর্ধ্বে আমি, আমিই সে।"

অবশ্য চরমপন্থীরা বিবেকানন্দের ধ্যান ধারণা থেকে কিছুটা সরেও গিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার যেসব ত্রুটির কথা বিবেকানন্দ বন্ধুর মতো বলেছিলেন, স্বাজাত্যভিমানে চরমপন্থীরা সেগুলির নিন্দা করেছিলেন কিন্তু নিরাময়ের কথা ভাবেন নি। তাঁদের বোধের পরিধির বাইরে ছিল বলেই পশ্চিমের সমস্ত কিছুই দুঃসহ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। বিবেকানন্দের আত্মসমালোচনার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ধর্ম বলে খ্রীস্ট ধর্মের প্রতি তাঁদের বিরূপতা গোপন থাকেনি। অথচ হিন্দুধর্মের ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হতেও পারেননি। চরমপন্থীদের দেশপ্রেমের গভীরতা ও আন্তরিকতা ছিল প্রশ্নাতীত, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে দৃষ্টির স্বচ্ছতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

যে দেশপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্রে ছিল কবিকল্পনা বিবেকানন্দের রচনায় তা একটি অবয়ব নিল।[৫৩] বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সমাজকে, "আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী" বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর ভাষায় "মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" তাই তাঁর উদাত্ত আহ্বান : "ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত।" 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধের উপসংহারে বিধৃত তাঁর উপলব্ধির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর সন্তান-ব্রতের সাদৃশ্য বিস্ময়কর। চরমপন্থীরা দেশভক্তির এই প্রগাঢ় অনুভূতিতে আপ্লুত হয়েছিলেন, আত্মবিসর্জনের অঙ্গীকারও অনায়াসে নিতে পেরেছিলেন। বিপিনচন্দ্রের কাছে ভারতপ্রেমের সংজ্ঞা হয়ে উঠেছিল—এই উপমহাদেশের ভূপ্রকৃতির প্রতি সীমাহীন অনুরাগ—এর নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, দিগন্ত প্রসারিত শস্যক্ষেত্র ও উষর মরুভূমি এবং, যতই অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন হোক না কেন, এই ভূখণ্ডের অসংখ্য গ্রাম ও নগরগুলির প্রতি স্নিগ্ধ মমতা, ধূলি-ধূসরিত, ঘর্মাক্ত, অনটনক্লিষ্ট, অর্ধনগ্ন মানুষগুলির প্রতি সুনিবিড় ভালবাসা।[৫৪] অরবিন্দের দেশপ্রেমের ব্যঞ্জনাটি ছিল সূক্ষ্মতর। "অন্যের কাছে দেশ বলতে বোঝায় নদী-পর্বত, অরণ্য শস্যক্ষেত্রের সমষ্টি। আমি কিন্তু আমার দেশকে মা বলেই জানি, একমাত্র তাঁকেই আমি ভালবাসি। কেবলমাত্র তাঁর উদ্দেশেই নিবেদিত হয় আমার হৃদয়ের

সমস্ত শ্রদ্ধা।"[৫৫] আর এই প্রগাঢ় দেশভক্তিরই অনুপম কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলির মধ্যে।

চরমপন্থীদের দেশ-সেবার পদ্ধতিটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিবেকানন্দের আদর্শকে অনুসরণ করেনি। বিবেকানন্দ মনে করতেন সর্বধর্মসার অদ্বৈতবাদ ও গীতার প্রতিটি শ্লোকে ঝংকৃত হয়েছে নিঃস্বার্থ সেবা ও চিরন্তন প্রেমের জয়গান। রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারারও একটা ভূমিকা ছিল। তবু তাঁর মধ্যে আধুনিকতার যে প্রখর এবং সজীব একটি অনুভূতি ছিল তাই এ দেশের মানুষের তৈরী দারিদ্র্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। অনন্ত, অসীম আত্মা এবং জাগতিক বিষয়ে মনোনিবেশ (পরমহংসদেব যাকে বলেছেন নিত্য এবং লীলা)—এই দুই-এর টানাপোড়েনে তিনি অহরহ বিচলিত হয়েছিলেন। মোক্ষের চেয়ে জাগতিক হিতসাধনের আহ্বান প্রায়ই প্রবলতর হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। কিন্তু এজন্য ব্রাহ্মধর্মের সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ, অথবা কোঁৎ-এর নিরীশ্বরবাদ ও মানব ধর্মের আদর্শ তাঁর কাছে যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি। ভারতীয় রীতিনীতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে যথাবিহিত সচেতনতা ছাড়া দেশীয় সমাজের নিন্দায় মুখর হয়ে সংস্কারের প্রচেষ্টা করলে ব্যর্থতা অবধারিত। তাই বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "শুধুমাত্র সংস্কারে আমার বিশ্বাস নেই ; আমি বিশ্বাস করি বিকাশে।"[৫৬] এ দেশে প্রবর্তিত বা পরিকল্পিত অধিকাংশ সংস্কারই যে পশ্চিমী দেশগুলির অন্ধ অনুকরণের নামান্তর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই তাঁর ছিল না। একটা বীজ যে চারিপাশের বিচিত্র উপাদানগুলি আত্মস্থ করে নিজপ্রকৃতি অনুযায়ী বৃক্ষের জন্ম দেয়, কিংবা বিবর্তন যে পূর্ববর্তী পর্যায়ের বিভিন্ন অবস্থার সমন্বয়েরই আত্মপ্রকাশ—এ তত্ত্বের প্রতি অধিকাংশ সমাজ সংস্কারকের দৃষ্টি পড়েনি। সব রকমের কুসংস্কার এবং পুরোহিত-তন্ত্রের বিভীষিকার জন্য কেবলমাত্র ধর্মকে দায়ী করতে গিয়ে তাঁরা ভুল করেছেন। বহু-আলোচিত এই সব সংস্কারকদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিশেষ ভাল ছিল না। তিনি লিখেছেন, "বিগত দশ বছর ধরে সারা দেশে পরিভ্রমণ করার সময় আমি অসংখ্য সমাজসেবী সংস্থার পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু এমন একটা প্রতিষ্ঠানেরও আমি দেখা পাইনি যা প্রকৃত অর্থে মানুষের সেবায় নিয়োজিত। এই সব সংগঠনের কর্ণধারগণ এক ধরনের শোষণের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করে চলেছেন।" এই জাতীয় সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় দেখা দিয়েছে শশধর তর্কচূড়ামণিদের পুনরুজ্জীবনবাদ।[৫৭] মানুষের আধ্যাত্মিকতায় যদি কোনও খাদ না থাকে তবে তার স্পর্শে সমাজও সবল ও শুদ্ধ হয়ে উঠবে। এই জন্যই সামাজিক সংস্কার নিয়ে অত্যধিক মাতামাতি না করে আগে আত্মিক শুদ্ধতা অর্জনের কথা তিনি বার বার বলেছেন।

তিমিরাবৃত এ দেশের আকাশে একদিন তিনটি মহাশব্দ বজ্রের অক্ষরে লেখা হয়েছিল—'দত্ত, দম্যত, দয়ধবম্'। এই মহামন্ত্রের প্রভাব অনেক মনীষীর হৃদয়েই পড়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাত্ত্বিক, রামকৃষ্ণ অধ্যাত্ম ও পরলোকচিন্তায় বেশী বিভোর। মানুষের অপরিমেয় দুঃখ দুর্দশায় বিমথিত হৃদয় নিয়ে বিবেকানন্দই প্রথম 'জগদ্ধিতায়' একটা বাস্তব পরিকল্পনা রচনায় সফল হয়েছিলেন। 'দরিদ্র নরায়ণ' সেবার মহৎ আদর্শ ঘিরেই সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ, জাতি এবং শ্রেণীর অনায়াস-মিলন ছিল সম্ভবপর। এই আদর্শকে খ্রীস্ট-ধর্ম প্রচারিত 'চ্যারিটি'র সমার্থক ভাবা ভুল হবে। গীতার সেই শাশ্বত-মন্ত্র—উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানম্—কখনো বিস্মৃত হননি বিবেকানন্দ। তবু পরহিত সাধনই আত্ম-উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করে। ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন, অসুস্থের সেবা এবং অজ্ঞকে (আধ্যাত্মিক অর্থেও) জ্ঞান দানের মধ্য দিয়ে মানুষের সহজাত স্বার্থপরতার অবসান ঘটে।

কর্ম তখন হয়ে ওঠে দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ্য। ডারউইন-কথিত নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নয়, এমন নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষের বিবর্তন হয়। তবে অনাহারক্লিষ্টের জন্য অন্নের সংস্থান কিংবা অসুস্থ ব্যক্তির সেবার চেয়ে শিক্ষাদান যে বড়ো—সে বিষয়ে বিবেকানন্দের সন্দেহ ছিল না।[৮] মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সর্ববিধ শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। শিক্ষাকে তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা বিকাশের সহায়ক হিসেবেই দেখতেন। আর, সব শিক্ষার মূলে আছে ধর্ম। কিন্তু সে কি প্রথাগত হিন্দু ধর্ম? বিবেকানন্দ বলতেন হিন্দুধর্মের মতো অন্য কোনও ধর্ম এমন করে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে পারেনি, আবার দীনহীনের উপর নির্যাতন নিপীড়নের ব্যাপারেও এই ধর্মের জুড়ি মেলে না। এই অবিশ্বাস্য স্ববিরোধিতার একমাত্র কারণ এই ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং অন্যায় প্রয়োগ। হিন্দুদের মধ্যে আচার-সর্বস্ব ভণ্ডরাই অসহায়ের উপর অত্যাচার অবিচারের অসংখ্য সুযোগ উদ্ভাবন করেছে। এ বিষয়ে এঁরা ওল্ড টেস্টামেন্টের ফ্যারিসী ও স্যাডিউসীদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলেই এই কলুষ দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি চাইতেন তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী সন্ন্যাসীরা যেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে দীন ও অধমের কুটিরেও এই ধর্মের বাণী প্রচার করেন, পতিত চণ্ডালের হৃদয়েও এই মহৎ সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন যে ব্রাহ্মণের মতো তাঁদেরও আছে ধর্মানুশীলনের অধিকার, বিচার-বিশ্লেষণ, গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতা, কেন না সকলের মধ্যেই বিরাজ করছেন সেই পরম ব্রহ্ম। এভাবের জাতীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করে পশ্চিমী সভ্যতার সম্মুখীন হতে গেলে বিকৃত ও অন্ধ অনুকরণ অনিবার্য।

ধর্মের এই পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের প্রকৃত মুক্তি আসবে বলে মত প্রকাশ করেছেন বিবেকানন্দ। রাজনৈতিক মুক্তি তো মানব-অস্তিত্বের উপরের স্তরটুকু কেবল স্পর্শ করতে পারে।[৯] পশ্চিমী জগতের দেশগুলিতে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর যে আদর্শ মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে, এ দেশের মানুষের তাকে অনুকরণ করাকে এক ধরনের উন্মত্ততা বলেই তিনি মনে করতেন। কেন না ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পত্তনের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে, ঐ সব দেশে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বহু আগে, এ বিষয়ে সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে বহুকাল ধরে এবং শেষপর্যন্ত তাও অপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। একের পর এক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে সেখানে। ইউরোপ নিজেই আজ দিশেহারা। শিবানন্দকে লেখা বিবেকানন্দের একটি চিঠিতে এই সত্যটিই প্রকাশিত হয়েছে: "তোমাদের পার্লামেন্ট, সিনেট, তোমাদের নির্বাচন, ভোটাধিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠতা—সব কিছুর সঙ্গেই আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, কিন্তু বন্ধু, সর্বত্র এদের ইতিবৃত্ত ও পরিণাম একই। সবদেশে পরাক্রান্ত মানুষই নিজের ইচ্ছানুসারে সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে, বাকি সবাই ভেড়ার পালের মতো নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার।" কোথাও কোথাও অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু মানবসভ্যতার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে যদি না তা ধর্মের উপর, মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর করতে পারে। একমাত্র ধর্মই পারে সমস্ত কিছুর মূলে গিয়ে পৌঁছতে। মানুষ যদি ধর্মে সুস্থিত থাকে তবে অন্য সব কিছুই যথাযথ থাকবে। পার্লামেন্টের কোনও বিধান দিয়ে তো মানুষের এই ধর্মবোধ জাগানো যায় না। এর জন্য রাজনীতির চেয়ে ধর্মোপলব্ধি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[১০] "পার্থিব কোনও সুখ সম্পদই আত্মার শূন্যতা দূর করতে পারে না। আত্মাকে মলিন রেখে সমস্ত পৃথিবী জয় করলেও সে জয় হবে ক্ষীণায়ু।" সে জন্য আধ্যাত্মিকতার বিকাশের প্রতি উদাসীন সভ্যতার ভিত্তি তৈরী হয় চোরাবালির উপর। কিন্তু অদ্বৈতবাদ মানুষেরআত্মশক্তিএকবার উদ্বোধিত

করে দিলে, তার পক্ষে সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন সহজ হয়ে যায়। তখন যে অসীম শক্তির জন্ম হয় তার আঘাতে শ্রেণী বৈষম্য, জাতিভেদ, এমন কি সাম্রাজ্যও চূর্ণ হয়ে যায়। যে আধ্যাত্মিকতা ভারতীয়ত্বের পরম অভিজ্ঞান—তার বিনিময়ে নয়, তাকে কেন্দ্র হিসেবে রেখেই, প্রতীচ্যের ধ্যানধারণা অনুযায়ী মানব-হিতৈষণা পরিচালিত হওয়া কাম্য। রাজনীতি মানুষের মধ্যে প্রকৃত মিলন বা ঐক্য বন্ধন রচনা করতে পারে না ; তা শুধু সাময়িকভাবে কিছু মানুষকে পরস্পরের কাছাকাছি করে দেয়। ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে তা এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী জড়বাদের জন্ম দেবে বলে বিবেকানন্দ সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

এই অধ্যাত্মচেতনা শুধুমাত্র ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ রাখার চিন্তা কখনোই বিবেকানন্দের সমর্থন পায়নি। জাতিধর্ম নির্বিশেষে আধুনিককালের প্রতিটি মানুষের জীবনেই এর প্রয়োজন, কেন না যুক্তিবাদ তার ঈশ্বর-চেতনা নষ্ট করে দিচ্ছে, জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে সে প্রজ্ঞা হারিয়েছে, ক্ষমতা সম্প্রসারিত করার চেষ্টায় সৃষ্টি করছে সংঘর্ষ। মানব-অস্তিত্বে রাজনীতির মতো একটা অংশমাত্রের সক্রিয়তা, অথবা একটি মাত্র দেশের (যেমন ভারতবর্ষ) সমস্যা-সমাধান কি ভাবে নিখিল বিশ্বের অনন্ত অতৃপ্তির অবসান ঘটাবে ? মানুষের শরীরের একটি মাত্র অঙ্গের বিকাশের প্রতি মনোযোগী হলে বাকি অঙ্গগুলি যেমন অপুষ্ট থেকে যায় সেই নিয়মেই উগ্র জাতীয়তাবাদ বা পশ্চিমী ধরনের গণতন্ত্র (যাকে মানুষের মধ্যে শয়তানের লীলা হিসেবে বর্ণনা করেছেন বিবেকানন্দ)[৩১] মানুষের সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়ে উদ্ভট একটা কিছু চাপিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিবেকানন্দও মনুষ্যত্বের সুষম বিকাশের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। পূর্ণবিকশিত মানুষের মধ্যেই দেখা পাওয়া যাবে দার্শনিক, ভাবুক, মরমী, এবং কর্মিষ্ঠকে।[৩২] তাঁর মধ্যেই সম্মিলিত হবে শঙ্করাচার্যের বীক্ষণশীলতা এবং গৌতম বুদ্ধের অপার করুণা। বিবেকানন্দ স্বয়ং কি তাই ছিলেন না ? চতুরাশ্ববাহিত রথের সারথির মতো চতুঃসত্যের (যোগ চতুষ্টয়) বল্গা তিনি ধারণ করেছিলেন অবলীলায়। রামকৃষ্ণের এই সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য খণ্ডিতকে অস্বীকার করেছেন ভূমার জন্য, নির্বিশেষের জন্য পরিত্যাগ করেছেন বিশেষকে। যে সর্বভৌমিক আদর্শ ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছে তার রূপায়ণ তো অন্য কোনও উপায়ে হতে পারে না। নিখিল বিশ্বের প্রতি তার দায়িত্ব-পালনেরও ভিন্নতর কোনও পথ নেই।[৩৩]

রাজনীতির ক্ষেত্রে চরমপন্থীদের ঝোঁকটা কিন্তু পড়েছিল অন্যত্র। বিপিনচন্দ্র পাল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটি আধ্যাত্মিক উদ্যোগ বলেই মনে করতেন। প্রত্যেক মানুষের অন্তঃস্তলে, তার অস্তিত্ব ও বিকাশের প্রতিটি স্তর এবং পর্যায়ে রয়েছে ঈশ্বরের উপস্থিতি। আর ঈশ্বর যে হেতু অনন্তরূপে প্রকাশিত স্বাধীনতা তাঁরই এক প্রকাশ। বেদান্তের বিশেষ বাণীর ব্যাখ্যা এভাবেই করেছিলেন চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র।[৩৪] আর, অরবিন্দের বিচারে স্বরাজের প্রকৃত তাৎপর্য ছিল—আধুনিক পরিবেশে প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জাতীয় গৌরবের সত্যযুগের পুনরুজ্জীবন, বিশ্বমানবের গুরু রূপে তার পূর্ব-ভূমিকা পুনর্গ্রহণ।[৩৫] কিন্তু তার পূর্বসর্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই একটা জাতির নিশ্বাস-বায়ু, তাকে বাদ দিয়ে দেশের সামাজিক বা শিক্ষার সংস্কার, শিল্পায়ন বা দেশবাসীর নৈতিক উন্নতি বিধানের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এঁদের মতে বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার শকটটিকে মুক্তির অশ্বের সামনে বাঁধতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দ তাই বিনা দ্বিধায় লিখেছিলেন : "দেহের চেয়ে আত্মা নিঃসন্দেহে বহুগুণ বেশি মূল্যবান, *কিন্তু তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমনি সুনিবিড় যে একটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ*

করলে অপবটি খর্ব হয়ে যায়। শঙ্করাচার্য-কৃত ব্যাখ্যা অনুযায়ী একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির একক সাধনা ভ্রান্ত বা খণ্ডিত জ্ঞানের সমার্থক"।[৮৩] বিবেকানন্দ-প্রচারিত পরহিত সাধনের পরিকল্পনা এঁদের কাছে এ কারণে গৌণ বলে প্রতিভাত হয়েছিল যে স্বাধীনতা ছাড়া তার সফল বাস্তবায়ন কখনোই সম্ভব হবে না। ইউরোপীয় দেশগুলি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করছে ভারতবর্ষ তা লাভ করলে বেদান্ত-বর্ণিত 'মোক্ষ' লাভ আর কঠিন থাকবে না। স্বাধীনতা কখনোই মোক্ষ-জাত হতে পারে না; সর্বপ্রকার মুক্তির সেটাই অনন্য পথ। দ্বিতীয়ত, হিন্দু-দর্শনে আত্মোপলব্ধিকে সর্ব-ধর্ম-সার বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু তা অলভ্য থেকে যাবে যদি বিদেশীদের হস্তক্ষেপ অহরহ আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধ্যান-ধারণাগুলির বিশ্ব-ব্যাপী বিস্তারেব পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে এই পরাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরেই ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হবে মানব-ত্রাতার ভূমিকা-নেওয়া। অরবিন্দ-প্রদত্ত একটি ভাষণে এই ধরনের চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়: "সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভ অত্যন্ত জরুরী। একটা বিষয়াসক্ত, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু জাতির পার্থিব এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্রীড়নক হিসেবে নয়, বিশ্বের আত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই তার স্বাধীন অস্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। কেবলমাত্র আপন অস্তিত্ব রক্ষা ও গৌরববৃদ্ধির জন্য ভারতবর্ষ কোনও দিনই লালায়িত ছিল না; তার সমস্ত উদ্যোগ, তার সকল সংগ্রামই ছিল 'জগদ্ধিতায়'"।[৮৩] 'ভবানী-মন্দির' শিরোনামের রচনাটিতে অরবিন্দ যে ভবানীর ধ্যান করেছেন তিনি ভক্তবৃন্দকে তাঁর জন্য এমন এক মন্দির নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন যেখান থেকে উৎসারিত হবে একটি মহৎ প্রেরণা। এই প্রেরণাই জন্ম দেবে একটি নবীন জাতির, তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে একটি যুগকে, সমস্ত পৃথিবীকে দীক্ষা দেবে আর্যধর্মের মহামন্ত্রে।

(৩)

চরমপন্থা এবং দয়ানন্দ

রামমোহনের সকল কর্ম-প্রেরণার উৎস ছিল উপনিষদ, যদিও যুক্তিবাদকে তিনি যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেননি; গীতাকে চিন্ময়-জগতের পথপ্রদর্শক বলে মনে করলেও বঙ্কিমচন্দ্র আত্মশুদ্ধির সহায়ক হিসেবে সনাতন ঐতিহ্যকে অবহেলা করতে রাজী ছিলেন না; শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদকে অধ্যাত্ম জীবনের মুখ্য প্রেরণা রূপে গ্রহণ করলেও দ্বৈত ও অদ্বৈতের সমন্বয় সাধন করে রামকৃষ্ণ যে ভাবে ব্রহ্মোপলব্ধির একটা সহজ উপায় নির্ধারণ করেছিলেন তাতে বিবেকানন্দের সায় ছিল; কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষ উল্লেখ্যযোগ্য সংস্কারক দয়ানন্দের কাছে 'ঈশ্বরোক্ত' ও 'নিত্য' বেদই ছিল সকল কর্মের প্রেরণা। অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র এবং বেদোত্তর যুগের বিশিষ্ট ধর্মাত্মাদের উল্লেখ তাঁর রচনা ও চিন্তাধারায় পাওয়া গেলেও একমাত্র অপৌরুষেয় বেদই ছিল তাঁর কাছে প্রকৃত জ্ঞানের, এমন কি বিজ্ঞানের আধার। উপনিষদ এবং বেদান্ত সূত্রকেও তিনি অভ্রান্ত ও সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেননি।[৮৮] দয়ানন্দের জীবন-চরিতকার হরবিলাস শারদা লিখেছেন যে ধর্মালোচনার সময় তিনি বেদ-বহির্ভূত অন্যান্য ধর্ম-শাস্ত্রের (যেমন মনু সংহিতা) উল্লেখ করতেন যদি সেগুলি বৈদিক সত্যানুসারী হতো।[৮৯] বলা বাহুল্য, আর্য-সত্যের অভিমুখে এই দ্বিধাহীন প্রত্যাবর্তন ভারতবর্ষে বেদোত্তর যুগের ধর্মীয় বিকাশ বা

বিবর্তনের প্রতি বিমুখতারই দ্যোতক।[১০]

পূর্ববর্তী ধর্মসংস্কারকদের সঙ্গে আরও একটি বিষয়ে দয়ানন্দের পার্থক্য ছিল অতি স্পষ্ট। বৈদিক ধর্মের এই একনিষ্ঠ পূজারীর উপর ইউরোপীয় দার্শনিক চিন্তাধারা বা সংস্কৃতির ক্ষীণতম প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় না। লক ও বেন্থাম রামমোহনের ভালোভাবে পড়া ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসলোকে ভাস্বর ছিলেন মিল এবং কোঁৎ। আর যুবক বিবেকানন্দের উপর হিউম এবং স্পেন্সারের প্রগাঢ় প্রভাবের কথাও সর্বজনবিদিত। এঁদের কেউই পশ্চিমী সভ্যতার চিন্তাপ্রবাহকে অস্বীকার করেননি ; যা গ্রহণ ও সমন্বয়-সাধনযোগ্য—সকলেই তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিদেশের এই সব অভিনব, উদ্দীপক ও চিত্ত-প্রসারী ভাবাদর্শের সঙ্গে এ দেশের ঐতিহ্যানুসারী ধ্যান-ধাবণার সংঘাতে মানবাত্মার যন্ত্রণা কিন্তু দয়ানন্দের কাছে অপরিচিত থেকে গেছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে তাঁব কোনও পরিচয় ছিল না ; ম্যাক্সমূলার এ বিষয়ে যে বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষা শুরু করেছিলেন—সে সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন না। এমন কি সায়ণ-কৃত বেদ-ভাষ্যও তিনি সর্বত্র গ্রহণ করেননি। "সায়ণ-নির্দেশিত পথে পশ্চিমী-পণ্ডিতেরা যখন বেদকে প্রকৃতির স্তোত্র এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের সংহিতা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন বহু শতাব্দীর বিস্মরণ ও অজ্ঞানতার কুয়াশা ভেদ করে দয়ানন্দের দৃষ্টি তাকে মানুষের মহত্তম উত্তরাধিকার বলে চিহ্নিত করেছে।"[১১]

দয়ানন্দেব বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয যে তিনি বেদবিচারে অযৌক্তিক ও উদ্দাম ভাবপ্রবণতার আশ্রয় নিযেছেন। চবমপন্থী নেতা অরবিন্দ দয়ানন্দকে সমর্থন করেছেন এই যুক্তি দেখিয়ে যে একই ত্রুটির জন্য সায়ণ কখনো সমালোচিত হননি। তাঁর জ্ঞানও অনেক সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এমন কি সাধারণ বুদ্ধির স্পর্শ-রহিত বলে প্রমাণিত। প্রায়ই কৃত্রিম সরলীকরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন সায়ণ, পূর্ব-কল্পিত তত্ত্বের কাঠামোতে তথ্য সন্নিবেশও করেছেন। পশ্চিমী পণ্ডিতেরাও ভুল করেছেন ক্ষীণ কয়েকটি আভাসকে নির্ভুল প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে, অতি সরল সিদ্ধান্তের আকর্ষণে তাঁরাও বহু ক্ষেত্রে যুক্তিকে পরিহার করেছেন। বেদ-চতুষ্টয়ের অন্তর্নিহিত সংখ্যাতীত প্রমাণ থেকে দয়ানন্দের এ বিশ্বাস সমর্থিত হয় যে বৈদিক মন্ত্রগুলি এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উদ্দেশেই নিবেদিত, যদিও সেই এক এবং অদ্বিতীয় প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন নামে আত্ম-প্রকাশ করেছেন। তাঁর অন্তহীন গুণাবলী এবং অনন্তবিভার পরিচয় দানের উদ্দেশেই বিচিত্র অভিধার এই বিস্ময়কর ব্যবহার। ঋক্‌বেদের সময় থেকেই একেশ্বরবাদের জন্ম, উপনিষদ তার উৎস নয়। ঋক্‌বেদের বহু সূক্তে (II,১২; VIII,১০০; X,১২১) বহু দেববাদ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। সৃষ্টি স্তোত্র (X, ১২০) ব্যাখ্যা করেছেন একবর্ণ বহু শক্তি যোগে কি করে অনেক বর্ণ হলেন। বেদের মধ্যে দয়ানন্দ শুধু ঈশ্বর নির্দেশিত মানব জীবনাদর্শই খুঁজে পাননি, তার মধ্যেই তিনি জীবলোক এবং ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কার করেছেন, খুঁজে পেয়েছেন সেইসব সূত্র যার দ্বারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিরন্তর সৃষ্টি ও পালন করে চলেছেন। দয়ানন্দ এ প্রত্যয়ে সুস্থিত ছিলেন যে বেদের মধ্যেই একাধারে আছে ধর্মের মর্ম ও বিজ্ঞানের সত্য।

বেদ সম্পর্কে দয়ানন্দের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দের অবশ্যই মতপার্থক্য ছিল। 'প্রচার' নামক পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র দেবদেবী বিষয়ে বৈদিক যুগের ধ্যান-ধারণার বিশ্লেষণ করে বেদের অপৌরুষেয়তার তত্ত্ব খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন।[১২] নৈসর্গিক শক্তি বা পদার্থে চৈতন্য আরোপ করার রীতি থেকেই ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদের সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এ বিষয়ে দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয় যখন 'দেব' রূপে

অভিহিত এই চৈতন্যময় সত্তাগুলির আচরণ বিধি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। বিধি থেকে আসেন বিধাতা। সূত্রগুলি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানই সর্ব নিয়মের স্রষ্টা ও নিয়ামক ঈশ্বর বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলে। দেবদেবী সংক্রান্ত সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ ধারণার সঙ্গে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতনতার সহাবস্থান চলছিল। যাগ-যজ্ঞের সময় বৈদিক ঋষিগণ ইন্দ্র, সবিতা, বরুণ, অগ্নি, মাতরিশ্বা প্রভৃতি পরিচিত নামে সকল শক্তির উৎস সেই ঈশ্বরকেই পূজা করতেন। আবার ইন্দ্র, বরুণাদিকেও ঈশ্বর বলা হতো (ঋক্ বেদ, I, ১৬৪, ৪৬)। (পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার এই ধরনের ধর্মাচরণের নাম দিয়েছেন henotheism ; রাধাকৃষ্ণন নাম দিয়েছেন 'psychological monotheism.') পরবর্তী পর্যায়ে এক, অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির মধ্যে দেবদেবী বিষয়ক কল্পনার বিলয় ঘটে। ঋক্ বেদের যে সূক্তগুলির মধ্যে এই ধারণা আভাসিত হয়েছে, সেগুলি পরের রচনা। ব্রহ্মবাদের আবির্ভাব যে পরবর্তীকালে তা ত' ইতিহাসসিদ্ধ। একেশ্বরবাদী ও অদ্বৈতবাদীদের পক্ষে বেদের এই সূক্তগুলিকে একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদের পরিচায়ক হিসেবে গ্রহণ করা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু এ বিষয়ে মাত্রা হারালে বৈদিক ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। যে সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন, শুধুমাত্র বিদেশী—এই অপরাধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের নস্যাৎ করে দেননি। প্রয়োজনবোধে ম্যাক্সমূলার ও রথ (Roth)-এর মতামত সমর্থন ও বর্জন—দুই-ই তাঁর রচনায় দেখা যায়। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও পুরাণ এবং নৃ-বিদ্যা বঙ্কিম মনীষার বিকাশে সহায়ক উপাদান হয়ে উঠেছিল এবং এ জন্যই প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি বৈদিক ধর্মকে সামগ্রিকভাবে, মানবসংস্কৃতির, বিশেষ করে আর্য সভ্যতার, বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। নিঃসংশয় ছিল তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে হিন্দু ধর্মের মূল প্রোথিত হয়ে আছে বৈদিক ধর্মে, কিন্তু মূল তো কখনো সমগ্র বৃক্ষ হতে পারে না।[১৫] বিবেকানন্দ বেদকে 'অপরাবিদ্যা' বা মানুষের খণ্ডিত অভিজ্ঞতা রূপে বর্ণনা করেছেন। আচারবাদী ও যজ্ঞবাদীদের মুণ্ডক বলেছিলেন, "অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধা"। একমাত্র বেদান্তই তাঁর বিচারে 'পরাবিদ্যা' বা পরম উপলব্ধির অভিব্যক্তি। তিনি বারবার বলেছেন যে উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্রের দর্শনই ভারতীয় জীবন প্রবাহের বিভিন্ন অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে ; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য দূর করেছে এবং বহু বিচিত্র ভারতীয় ধর্মের মধ্যে সুদুর্লভ ঐক্যের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতৃবর্গের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর দয়ানন্দ ১৮৭৫ সালে 'সত্যার্থ প্রকাশ' প্রকাশ করেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম ধর্মীয় তত্ত্বে যে দ্বৈত চিন্তাধারা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছিল 'সত্যার্থ প্রকাশে' তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। অদ্বৈত এবং নির্গুণ ব্রহ্ম সম্পর্কিত ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করে দয়ানন্দ রামমোহন এবং বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। আবার, 'সাকার' এবং 'অবতারতত্ত্বে'র খণ্ডন প্রয়াসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের বিরোধিতাও প্রকট হয়ে উঠেছে। ব্রহ্ম এবং জীব যে স্বতন্ত্র—তাও বারবার বলেছেন দয়ানন্দ। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া'—মন্ত্রটি দ্বারা ব্রহ্ম এবং জীব স্বতন্ত্র কিন্তু অচ্ছেদ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকৃতির স্বাধীন ও অখণ্ড অস্তিত্বেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের ভূমিকা ছিল 'নিমিত্তকারণের' এবং বস্তুপুঞ্জ ছিল 'উপাদান-কারণ'। জীবলোকে এ কারণেই কিছু কিছু অশুভ থেকে গেছে, সৃষ্টি হয়েছে অমঙ্গলের। দয়ানন্দ আরও বলেছেন যে মানবাত্মা ঈশ্বরের মতোই চিরন্তন, কিন্তু

ঈশ্বরের মতো দ্রষ্টা নয় ; সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের ক্ষমতাও তার নেই ; ঈশ্বরের মতো শাশ্বত মুক্তিও সে অর্জন করতে পারে না। জীব কর্তা নয়, ভোক্তা। পাপ করলেই ঐশ্বরিক বিধান অনুযায়ী তাকে শাস্তি পেতে হবে। দয়ানন্দের ধ্যানের ভগবান এই কারণেই অতিসক্রিয়, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সৃষ্টিশীল, অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির আধার। কিন্তু কুমোর যেমন কাজ করার সময় তার চাকে জড়িয়ে পড়ে না, তেমনি চরাচরব্যাপী পরিব্যাপ্ত থেকেও ঈশ্বর জগতের থেকে নির্লিপ্ত। পুণ্যকর্মে মানুষের অবাধ অধিকার আছে এবং এ জন্য তার উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদও বর্ষিত হয়, কিন্তু পাপে রত হলে তার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ঈশ্বরের কঠিন শাস্তি তার উপর এসে পড়ে।'[৭] 'নিউ টেস্টামেন্টে'র (বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের) প্রেমময় ঈশ্বরের থেকে দয়ানন্দ আরাধিত ঈশ্বরের অনেক বেশি মিল 'ওল্ড টেস্টামেন্টের' কঠিন-হৃদয় বিচারক জেহোভার সঙ্গে। স্বর্গীয় প্রেরণার বশবর্তী হয়ে, ঐশ্বরিক বিধানের নিমিত্ত হয়ে যাঁরা কর্মে আত্মনিয়োগ করেন একমাত্র তাঁরাই পাপপুণ্যের ফলাফল ভোগের দায় থেকে অব্যাহতি পান। এ ধরনের মতবাদকে উগ্রপন্থী দেশপ্রেমিকদের সর্ববিধ আচরণের অগ্রিম সমর্থন হিসেবে ধরা যেতে পারে।

মুক্তির যে পথ-নির্দেশ দয়ানন্দ করতে চেয়েছেন তাতে আধ্যাত্মিকতার থেকে নৈতিকতার উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। পরহিতসাধন, সুবিচার ইত্যাদি সৎকার্য ধর্মানুশীলনের অঙ্গ এবং একই সঙ্গে তা ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রতিষেধক। বিবাহ, খাদ্যাখাদ্য বিচার, পোষক-আসাক সম্পর্কিত রীতি, জাতিভেদ প্রথাকে ঘিরে যে সমস্ত অযৌক্তিক এবং অমানবিক সংস্কার হিন্দুসমাজে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে সে সমস্ত কিছুকে দযানন্দ ঘৃণা করতেন। তবে জাতিভেদ প্রথাকে নিন্দা করলেও তিনি বর্ণ-বিদ্বেষী ছিলেন না ; কেন না এই প্রথাটি বেদ-সমর্থিত, এবং তারই মধ্যে বৈদিক যুগের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা প্রতিফলিত হয়েছিল। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে ঊনবিংশ শতকের সংস্কারকদের সঙ্গে দয়ানন্দের বিশেষ মতপার্থক্য ছিল না। তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রেও তাঁর মতবাদের উপর বেদের প্রভাবই ছিল একক। এজন্য তিনি খ্রীস্টান আচরণ বা যুক্তিবাদের দ্বারস্থ হননি। দেশের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক পবিবেশের কথা চিন্তা করে দয়ানন্দ নিরামিষ আহারেরই পক্ষপাতী ছিলেন ; জ্ঞানার্জন অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে বিদেশে যাওয়া-আসাতেও তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না। তবে জীবনের একটা সময় পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্রহ্মচর্যপালনকে তিনি আবশ্যিক বলে মনে করতেন এবং সমমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তপোবন-সুলভ পরিবেশে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের উপর। পুরোহিত-তন্ত্র, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তাঁর কাছে কখনো স্বীকৃতি পায়নি। বেদে যার সমর্থন নেই এমন আচার অনুষ্ঠানকে আজীবন তিনি নিন্দা করেছেন।'[৫] বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত, আক্রমণোদ্যত আর্যধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসে তাঁকে বিবেকানন্দের অগ্রদূত বিবেচনা করা অযৌক্তিক হবে না। অন্তত অরবিন্দ তাই মনে করতেন।

খ্রীস্টধর্মের ত্রিত্ববাদের প্রতি রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথের বিরাগ প্রকট হলেও প্রথমোক্তজন খ্রীস্টান একেশ্বরবাদ ও ইসলামি মুতাজিলা মত থেকে বহু উপাদান গ্রহণ করেছিলেন, আর দেবেন্দ্রনাথের উপর সূফী ও মিস্টিক দর্শনের প্রভাব কারো অজানা ছিল না। খ্রীস্ট ও তাঁর বাণীর প্রতি কেশবচন্দ্রের টান ছিল প্রবল। রামকৃষ্ণ তো তাঁর সর্বজনীন আবেদনের জন্য সুখ্যাত। সমস্ত ধর্মমতই যে নানা পথ ঘুরে শেষ পর্যন্ত পরম একের পদপ্রান্তে এসে মিলিত হয়—তাঁর এ বিশ্বাস কোনও দিনই শিথিল হয়নি। অদ্বৈতবাদীরা

তাঁকে 'ব্রহ্মণ' বলে ধ্যান করে, দ্বৈতবাদে বিশ্বাসীরা তাঁকে পূজা করে 'কৃষ্ণ' রূপে অথবা 'কালী' রূপে, আবার খ্রীস্টানরা তাঁকেই 'পরম কারুণিক পিতা' বলে ভক্তির অর্ঘ্য দান করে, আর মুসলমানদের হৃদয়ে তিনিই 'আল্লা' রূপে অধিষ্ঠিত। বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে 'জল'-এর নামটা ভিন্ন, বস্তুটা এক এবং অভিন্ন ; তেমনি ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী বা অন্য যে কোনও ভাষাতেই তাঁকে ডাকা যাক না কেন তিনি সাড়া দেন একই ভাবে। দয়ানন্দের ধর্মবিশ্বাস কিন্তু এত উদার নয়। ধর্ম নিয়ে অসংখ্য হানাহানির ইতিহাস কখনো ভোলেননি তিনি।[১৮] সব ধর্মের মধ্যেই কিছু সার আছে, তবুও প্রতিটি ধর্মের অনুরাগীরাই দাবী করে যে একমাত্র তাদের ধর্মই একমাত্র সত্য—রামকৃষ্ণের এই অন্তর্দৃষ্টি দয়ানন্দের ছিল না। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বৈদিক ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন এবং যথাযথ সংরক্ষণই ছিল আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠাতার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

নিজের আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে গিয়ে দয়ানন্দ কিন্তু ক্রমশ বাস্তবতা থেকে দূরে সরে আসছিলেন। তাঁর মানস-লোকে এ চিন্তাটা কখনা ছায়া ফেলেনি যে একটা জাতির জীবনের সমস্ত কিছু তার ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বিধৃত হয়ে থাকতে পারে না। শাস্ত্রীয় আদশের বাস্তবায়ন কতোটা সম্ভব, কতটা নয় সে বিচারে তিনি কখনো প্রবৃত্ত হননি। মানুষের সামাজিক বিবর্তনের একটি পর্বের পরমাশ্চর্য বিকাশকে তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে তুলে এনে, তিন হাজার বছর পরের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপন করা যে অসম্ভব তা তিনি বুঝতে চাননি। উনবিংশ শতকের ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বৈদিক যুগের জীবন-স্পন্দনকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য যে সংহতি অপরিহার্য—তা কোথায় পাওয়া যাবে—এ চিন্তা তিনি করেননি। অসংখ্য জাতি, অসংখ্য সম্প্রদায়, নতুন পদ্ধতি, প্রকরণ, প্রতিষ্ঠান, দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য উপকরণ ও যন্ত্রপাতির হতবুদ্ধিকর বৈচিত্র্য, নব নব চিন্তা ও বিদ্যা, মানুষের নিত্য নতুন স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন—এসব কথা ভাবতে তিনি রাজী ছিলেন না। সৈয়দ আহমদ খাঁর মতো সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষকে বৈদিক ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য দয়ানন্দের অবাস্তব, হাস্যকর চেষ্টা বিষয়বুদ্ধিহীন, অতি-সরল রামকৃষ্ণও কোনও দিন করেননি। ঔপনিষদীয় অদ্বৈতবাদকে বৈদিক আদর্শচ্যুতির একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে ঘোষণা করে এবং একই সঙ্গে, বহুকাল পরে যার জন্ম সেই মনুস্মৃতি থেকে আর্যদের জীবনযাপন পদ্ধতির অনুপুঙ্খ আহরণ করে দয়ানন্দ চরম অনৈতিহাসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বেদান্ত শুধু বৈদিক ঐতিহ্যের সর্বশেষ বিকাশ মাত্র নয়, তা তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিফলন। একমাত্র বেদান্ত দর্শন এবং ভারতীয় সমাজ নিয়ন্ত্রণে তার বাস্তব ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগই হয়তো আধুনিক, প্রগতিকামী, বহু-বিচিত্র ও বহুধর্মী ভারতবর্ষের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে। তা ছাড়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মকে হেয় করে দয়ানন্দ ইহুদী-সুলভ 'ঈশ্বর মনোনীত-জাতিতত্ত্বে'র অহংকারের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। নিজের মনোভাবের দ্বারা তিনি এই ইঙ্গিতই স্পষ্ট করে তুলেছেন যে আর্যধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্য সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষই মিথ্যা দেবতা উপাসনায় রত।[১৯] রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ কিন্তু কখনোই মানুষকে আর্য-অনার্য বা হিন্দু-মুসলমান হিসেবে ভেদ জ্ঞান করেননি ; সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষই যে দিব্য জীবন বিকশিত করার মতো পর্যায়ে পৌঁছতে পারে—তাঁদের এ উদার দৃষ্টিভঙ্গী কখনো আবিল হয়নি। ম্যাক্সমূলার আর্য বলতে একটা ভাষাগোষ্ঠীকে বুঝতেন, কোনও জাতিকে বা মনুষ্য গোষ্ঠীকে নয়। তিনি বরং পরে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন "ভাষাতত্ত্ব ও শারীর তত্ত্বের অপবিত্র মৈত্রী" (unholy alliance

between philology and physiology) থেকে। গোষ্ঠীর সংজ্ঞা-সূচক শব্দ শেষপর্যন্ত তার শ্রেষ্ঠতাসূচক দাবীতে পরিণত হলো দয়ানন্দের প্রচারে।[৭৮]

দয়ানন্দের ধ্যানের ঈশ্বরের সঙ্গে ইহুদী ধর্মে বর্ণিত ঈশ্বরের সাদৃশ্যের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এই ঈশ্বর প্রেম ও অপার করুণার আধার নন, তিনি কঠিন কঠোর বিচারক। শুধুমাত্র বেদের অপৌরুষেয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, নিজস্ব ব্যাখ্যা ছাড়া অন্যান্য ভাষ্য বাতিল করে, পাপ ও শাস্তির তত্ত্বে আচ্ছন্ন থেকে, তিনি এই বিশ্বাস দৃঢ় করে তুলেছিলেন যে অনুতাপ, এমন কি বিশুদ্ধ ধর্মবোধ জাগ্রত করেও ঈশ্বরের নির্মম বিচারের হাত থেকে পাপী মানুষের রেহাই নেই। প্রগতির তত্ত্ব অস্বীকার করে, সত্যানুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক উপায় পরিত্যাগ করে এবং, সর্বোপরি, আর্য-ধর্ম বিশ্বাস ছাড়া অন্য সব ধর্মীয় তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে দয়ানন্দ অসহিষ্ণু ইহুদী-সুলভ মনোভাব দেখিয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের খ্রীস্টান ধর্ম, নিপীড়ক মুসলমানদের ইসলাম, পাশ্চাত্য শিক্ষিতের যুক্তি ও সংস্কারবাদ এবং অদ্বৈতবাদীদের সর্বজনীন ধ্যান-ধারণার ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্যে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও আকুলতা নিয়ে দয়ানন্দ শুধুমাত্র আর্য-ধর্ম বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। ফলে সাম্প্রদায়িকতার উত্তরে সাম্প্রদায়িকতা, অসহিষ্ণুতার উত্তরে অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন তিনি। বিকৃত ইতিহাসের প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন মিথ ও পুরাণকে। বিমানের যাত্রীরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে তিনি নিয়ে গেছেন পাতালে (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে !) এবং পাতাল থেকে হরিবর্ষ (ইউরোপ !) ঘুরিয়ে তাঁদের পৌঁছে দিয়েছেন মিথিলায়।[৭৯] অবিশ্বাস্য তথ্যের সাহায্যে 'গো-রক্ষায়' প্রয়াসী হয়েছেন দয়ানন্দ। আর, তাঁর সংগঠন—"গো-রক্ষিণী সভা"কে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা দানা বেঁধেছে। এক দিকে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদকে বিশুদ্ধ 'বাগ্-বিস্তার' বলে অবজ্ঞা করতেও তাঁর বাধেনি, অপরদিকে মূর্তি পূজাকে বর্ণনা করেছেন, 'জৈনদের অপকীর্তি ও হিন্দুদের প্রতারণা'র দৃষ্টান্ত হিসেবে। নানক এবং কবীর তাঁর বিচারে অনধিকার-চর্চায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণীগুলিকে ঐতিহাসিক তথ্যের মর্যাদা দিতে গিয়ে তিনি শত শত বৎসর ব্যাপী শাসনকারী আর্য-নৃপতির দৃষ্টান্ত দিতেও দ্বিধা করেননি। 'সত্যার্থপ্রকাশ' ইতিহাস অপব্যাখ্যার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দয়ানন্দের আর্য সমাজে পাশ্চাত্য চার্চের প্রার্থনা-প্রথা অনুসৃত হয়েছিল। এ বিষয়ে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ এবং বোম্বাইয়ের প্রার্থনা সমাজের কাছেও তিনি ঋণী।[৮০] ১৮৭৫ সালে রাজকোটে স্থাপিত প্রথম 'সমাজ' ছিল স্বল্পায়ু। পশ্চিম ভারতের অন্যান্য স্থানে আর যে সমস্ত সংগঠন স্থাপিত হয় সেগুলিকেও ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার প্রচণ্ড বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিল। বাংলায় বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের সজীব ঐতিহ্য এবং ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিরোধের ফলে আর্যসমাজ আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এই সংস্থার বিস্তার অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল পঞ্জাবে। ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রায় কখনোই স্থাপিত হয়নি ; জাতিভেদ প্রথাও সুদৃঢ় হবার সুযোগ পায়নি। তা ছাড়া শিখ এবং ইসলামের বহু উপাদানের অনুপ্রবেশের ফলে পঞ্জাবের হিন্দুধর্ম অনমনীয় হয়ে ওঠেনি, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রসারও সেখানে ছিল অনুল্লেখ্য। ফলে ১৮৭৭ থেকে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যে সমস্ত অঞ্চলে দয়ানন্দ উপস্থিত হয়েছেন, সেখানেই আর্যসমাজের শাখা-উপশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য তাঁর ধর্মমতের মধ্যে শিখ এবং জাঠরা বিদেশী প্রভাব-মুক্ত এক দৃপ্ত আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন, যার দ্বারা তাঁদের অতীতের শত্রু ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা যায়,আবার বর্তমানের শত্রু—ইংরেজদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম

সহজ হয়ে ওঠে। মুঘলশক্তির পৌনঃপুনিক আঘাত, আফগানদের নৃশংস লুঠতরাজ, বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক-রঞ্জিত ব্রিটিশ অধিকার তাদের মর্মে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। পঞ্জাবের অপমানিত পৌরুষের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিপূরণ—আর্য-সমাজী আন্দোলন। শিক্ষিত পঞ্জাবীরা হিন্দুধর্মের আওতায় থেকেও বিদ্রোহ করার একটা সুযোগ পেল, উগ্র যারা তারা ধর্মান্তরিত হিন্দুদের শুদ্ধিপ্রথার মাধ্যমে হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলো, সমাজ-সচেতন যারা তারা ব্যক্তিগত মোক্ষের সঙ্গে সমাজ-কল্যাণকেও যুক্ত করতে পারল। ক্ষত্রি, অরোরা, আগরওয়ালের মতো বণিক সম্প্রদায় শ্রেণী-স্বার্থ বিরোধী নানা সরকারী আইনের প্রতিবাদ করতে সক্ষম হলো। প্রধানত তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর ভারতের বারাণসী পর্যন্ত আর্যধর্ম প্রসারিত হয়।[৮১]

দয়ানন্দ কিন্তু সচেতনভাবে রাজনীতিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অন্তর্দ্বন্দ্ব, শিশু-বিবাহ, ইন্দ্রিয়াসক্তি, মিথ্যাচরণ এবং সর্বোপরি বেদকে অবহেলার মতো ঘটনাকেই ভারতীয়দের অধঃপতনের জন্য দায়ী করে তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের মিল ছিল যথেষ্ট। 'ভাই যখন ভাই-এর বুকে অস্ত্র হানে তখনই তো বিদেশীরা প্রভু হবার সুযোগ পেয়ে যায়'—এভাবেই দয়ানন্দ ভারতবর্ষের দুর্দশার হেতু নির্ণয়ে প্রয়াসী হন। তাঁর বিশ্বাস ছিল জাতীয় ত্রুটিগুলির অপনোদন না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজের উপর কোনও আঘাতই সফল হবে না। এ জন্য আর্য-সমাজীদের সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে রাখার চেষ্টায় তাঁর কোনও শৈথিল্য ছিল না।

পরবর্তীকালে আর্য সমাজের মধ্যে আমিষ আহার এবং শিক্ষা সংক্রান্ত আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে যে বিভেদ দেখা দিয়েছিল তাকে দয়ানন্দের প্রগতিপন্থী ও রক্ষণশীল সমর্থকদের বিরোধ বললে অত্যুক্তি হবে না। লাহোরে গৃহীত দশটি মূলসূত্র না দয়ানন্দের ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ—কোনটি অনুসরণ করা হবে তা নিয়ে মতভেদ। লালা লাজপৎ রায়ের লেখায় 'কলেজ পার্টি' এবং 'মহাত্মা পার্টি'র সংঘাতের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৮২] জে· রীড্ গ্রাহাম আর্যসমাজীদের কাজকর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ঊনবিংশ শতক শেষ হবার আগেই আর্য সমাজীদের সমাজ সংস্কারের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে আসে। এর পর তারা হাত মেলায় বিভিন্ন রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে এবং মুসলমান ও অহিন্দুদের বিরোধিতা করতে থাকে।[৮৩] দয়ানন্দের বেশ কিছু সংখ্যক অনুগামী (এঁরা নিজেদের আর্য বলে পরিচয় দিতেন) জাতিভেদ-কণ্টকিত হিন্দু সমাজের থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে 'আর্য ভ্রাতৃসঙ্ঘ' নামে একটা সংস্থা গঠনের চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা অসফল হলেও তা কালক্রমে নীচুজাতের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতা তীক্ষ্ণতর করে দেয়। ফলে রক্ষণশীল এবং প্রগতিপন্থী—উভয় শাখাই নতুন উৎসাহে জাতিভেদ প্রথার সংস্কারে মনোযোগী হয়ে ওঠে। তাঁরা যে 'শুদ্ধি' অনুষ্ঠানের প্রচলন করেন তা শুধু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উচ্চতর বর্ণের মর্যাদা দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ধর্মত্যাগীদের সসম্মানে হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে আনাটাও এর প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। দয়ানন্দের মতে এদেশের মুসলমান ও খ্রীস্টানরা সকলেই ধর্মান্তরিত হিন্দু, তাই শুদ্ধি আন্দোলনের সাহায্যেই এঁদের পিতৃ-পিতামহের ধর্মের আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনা উচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আর্য সমাজের উদ্যোগকে 'প্রতিধর্মযুদ্ধ' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

আর্য সমাজের আন্দোলনের মধ্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল স্বাভাবিক কারণে। ১৮৮০-র দশকে লাহোরে সাংবাদিক রূপে কাজ করার সময় বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন :

"আমার মনে হয়েছিল, অন্তত এই সময়ে (আর্যসমাজ) আন্দোলন যতটা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ছিল তার থেকে বহুগুণ বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল একটা রাজনৈতিক উদ্যোগ রূপে।"[৮৪] স্বয়ং ব্রাহ্ম হওয়ায় বিপিনচন্দ্রের কাছে অন্যান্য একেশ্বরবাদীদের তুলনায় আর্যসমাজীদের অসহিষ্ণু ও উগ্র বলে বোধ হয়েছিল। এখন এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে বৈদিক ধর্ম এবং বৈদিক যুগের জীবন-যাত্রার উপর ভিত্তি করে আর্য সমাজীরা একটা অভিনব জাতীয় চরিত্র গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন বলেই কি বিপিনচন্দ্রের এই ধারণা হয়েছিল ?[৮৫] অথবা, ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত লালা লাজপৎ রায়ের মতো নেতাগণ আর্যসমাজ আন্দোলনেরও পুরোধা ছিলেন এবং শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার ও শুদ্ধি আন্দোলনের প্রচেষ্টাগুলিকে রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন ? একথা ভুললে চলবে না যে পঞ্জাব ল্যাণ্ড অ্যালিয়েনেশন অ্যাকটের মতো কিছু আইন ক্ষত্রী, অরোরা, আগরওয়ালদের স্বার্থে আঘাত করেছিল। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও শিক্ষিত হিন্দু বঞ্চিত হচ্ছিল।[৮৬] ১৯০৭ সালের সন্ত্রাসবাদী কর্ম-তৎপরতার জন্য আর্য সমাজীদের সরাসরি দায়ী করেছিলেন ভ্যালেন্টাইন চিরল।[৮৭] সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক এই সাংবাদিকের পক্ষে এ তথ্যটা খুবই পরিষ্কার ছিল যে কিছু কিছু সামাজিক সংস্কারে সফল হওয়ায় সহজ সরল গ্রামবাসীদের কাছে আর্য সমাজ খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এটাই ছিল ব্রিটিশ রাজের পক্ষে বিপজ্জনক। ভারতবর্ষেব পৌরাণিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই তাঁরা বর্তমানের শাসন ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করার মনোবল পেয়েছিলেন। আর্য সমাজেব রক্ষণশীল গোষ্ঠী অবশ্য ১৯০৭-এর আন্দোলনেব সঙ্গে সমাজীদের জড়িয়ে পড়ার কথা অস্বীকাব করেছেন। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে লাজপৎ রায়, হংসরাজ প্রমুখ নেতাবা কখনোই সন্ত্রাসবাদেব সমর্থন করেননি। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন পরিচালনাতেই তাঁদেব বিশ্বাস অটুট ছিল। পঞ্জাবের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নব স্যর ডেনজিল ইবেটসন কিন্তু এই সমস্ত যুক্তিতে কর্ণপাত করেননি। আর মুসলমানরা যে তাঁর উস্কানিতেই আর্য সমাজের বিরোধিতায় অত্যুৎসাহী হয়ে উঠেছিল—তাতেও সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। রাজনীতি ছাড়াও অন্যান্য বিষযে আর্য সমাজীদের কর্মসূচীর প্রতি মুসলমানরা আগে থেকেই বিদ্বিষ্ট ছিলেন।[৮৮]

দয়ানন্দের ব্যক্তিগত চরিত্র, তাঁর আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির প্রতি অরবিন্দের শ্রদ্ধার অবধি ছিল না। তিনি লিখেছিলেন, "ব্রোঞ্জের উপর খোদাই কাজের মতোই সমকালীন মানুষের মন ও সমাজের উপর তাঁর গভীর প্রভাব অঙ্কিত হয়েছিল। ঈশ্বরের কর্মশালায় নিযুক্ত অক্লান্ত, অমিতশক্তির এই মানুষটির কথা মনে পড়লে আমার চোখের সামনে অজস্র সংগ্রাম, কর্ম, সাফল্য ও শ্রমার্জিত জয়ের ছবি ভেসে আসে।" গ্রীক ধ্রুপদী ভাবধারায় মগ্ন অরবিন্দ ঈশ্বরের রাজ্যের এই সৈনিকের মধ্যেই হোমারের নায়কের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। আর ভাবতীয় জাতীয় চরিত্রের মধ্যে সুপ্রাচীন আর্য সংস্কৃতির বহু মূল্যবান বৈশিষ্ট্য যে তাঁর জন্যই সংযোজিত হয়েছিল—সে কথাও সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন অরবিন্দ। অব্যবস্থিতচিত্ততা ও সুবিধাবাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থেকে দয়ানন্দ কখনো আপোষহীন সংগ্রামের ভান করেননি। ভারতীয় মানসিকতাকে অস্পষ্টতা ও উদ্দেশ্যহীনতার ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে স্থির-প্রতিজ্ঞ ছিলেন দয়ানন্দ। বহু শতাব্দী ধরে বেদ ভারতীয় জীবনের একটা গ্রানিট পাথরে-গড়া-ভিত্তি হয়ে আছে ; আর দয়ানন্দের ব্যক্তিত্ব যেন তারই উপর শিরা। মনে হয় অতীতকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন তার উৎস-মুখের নির্মলতায়, তার বোধনের পুণ্য লগ্নে। তাই দয়ানন্দ যে অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার সাধনা করেছিলেন তা

একই সঙ্গে চিরন্তন এবং রূপান্তর-ক্ষম। বেদের যে মন্ত্রটি তিনি তাঁর কালের মানুষের কাছে মহামূল্যবান একটি উত্তরাধিকার রূপে রেখে গেছেন তাতে ধ্বনিত হয়েছে এই প্রার্থনা—'সত্য পরিব্যাপ্ত হোক সমস্ত আত্মার মধ্যে, দৃষ্টি হোক সত্যের অঞ্জন-লিপ্ত, সত্যই হোক সকল বাসনার উৎস, সত্য বিকীরিত হোক সকল কর্মের মধ্যে।' এ দেশের বহুবিচিত্র সংস্কৃতি, বিভিন্ন আদর্শ এবং বহুবিধ উদ্দেশ্যের সংঘাতের মধ্যেও অরবিন্দের অক্লান্ত, আকুল অন্বেষণ ছিল বিশুদ্ধ শক্তি, স্বচ্ছ দৃষ্টি, অভ্রান্ত কর্মকুশলতা এবং ভয়হীন ঐকান্তিকতার জন্য, আর এ সমস্ত কিছুর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন দয়ানন্দের মধ্যে। দয়ানন্দের ব্যক্তিগত চরিত্রে এই সমস্ত গুণাবলীর মতই কোনও সম্মিলন ঘটেছিল কিনা তা তাঁর কাছে ছিল নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তাঁর কল্পনার দয়ানন্দের মধ্যে চরমপন্থীদের মহত্তম আদর্শ প্রতিফলিত হতে দেখেছিলেন অরবিন্দ, আর এই কারণেই এই ভাবমূর্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসামান্য হয়ে উঠেছে।'[৮৯]

প্রথম অধ্যায়
টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১। বি· টি· ম্যাক্‌কালি, 'ইংলিশ এডুকেশন অ্যাণ্ড দ্য অবিজিন অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম্' (নিউ ইয়র্ক ; ১৯৪০) ; এল আই ব্যানডলফ্ ও এস· এইচ র‍্যানডলফ, 'ব্যরিস্টাবস অ্যাণ্ড ব্রাহ্মনিজম ইন ইণ্ডিয়া : লিগাল কালচারস অ্যাণ্ড সোস্যাল চেঞ্জ', কম্পারেটিভ স্টাডিজ ইন সোসাইটি অ্যাণ্ড হিস্ট্রী, অষ্টম খণ্ড, সংখ্যা ১, অক্টো. ১৯৬৫

২। বিপিনচন্দ্র পাল, 'দ্য সোল অফ ইণ্ডিয়া' (কল, ১৯১১), পৃঃ ২৭৬-৩১৬

৩। এ বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রতিষ্ঠাতা স্যব উইলিয়ম জোন্স যে Orientalism বা প্রাচ্যবিদ্যার প্রবর্তন করেন তার ঢেউ শুধু পাশ্চাত্য মনীষীদের চিত্তজগতে প্রচণ্ড আলোডন তোলেনি, দেশীয় মনীষীদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিল ভারতের বিরাট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি। শিবদাস চৌধুরী (সংগৃহীত ও সম্পাদিত) প্রোসিডিংস অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ম খণ্ড, ১৭৮৪-১৮০০ (কল, ১৯৮০)। বাজেন্দ্রলাল মিত্র, সেন্টেনারি রিভিয়ু অফ দ্য এশিযাটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল (১৭৮৪-১৮৮৩) (কল, ১৮৮৫) , জি· ক্যানন লেটাবস অফ স্যর উইলিযম জোন্স, ২ খণ্ড (অক্সফোর্ড ; ১৯৭০) , এস· এন মুখার্জি, স্যর উইলিযম জোন্স, এ ষ্টাডি অফ এইটিন্থ সেঞ্চুরি অ্যাটিটুড টু ইন্ডিয়া (কেমব্রিজ, ১৯৬৮)।

৪। চার্লস হিমেসাথ, দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম অ্যাণ্ড হিন্দু সোস্যাল বিফর্ম, (অক্সফোর্ড, ১৯৬৪)

৫। "নতুন যে চেতনা ও ভাবধাবা জাতিকে পুনরুজ্জীবন ও স্বাধীনতা অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছে তিনিই তার প্রবলতম, প্রেরণা ও উদ্‌গাতা"—অববিন্দ, 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র', বন্দেমাতরম, ১৬ই এপ্রিল, ১৯০৭।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র, 'হিন্দুধর্ম', প্রচার, ১, পৃঃ ১৫—২৩।

৭। এফ· এম· বারনাবড, হার্ডারস্‌সোস্যাল অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল থট, ফ্রম এনলাইটেনমেন্ট টু ন্যাশানালিজম, (ক্ল্যারেন্ডন, ১৯৬৫) এবং স্যর আইজায়া বারলিন-এর 'হার্ডার' সম্পর্কে প্রবন্ধ, এনকাউন্টাব, অগস্ট/সেপ্টে, ১৯৬৫।

৮। পিয়েতর হাইল, র‍্যাঙ্কে, ডিবেটস উইথ হিস্টরিয়ানস্ (লণ্ডন, ১৯৫৫) ; আর· জি কলিংউড, দ্য আইডিয়া অফ হিস্ট্রী (অক্সফোর্ড, ১৯৪৬)।

৯। বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা', 'বাঙালীর উৎপত্তি', 'বাংলাভাষা' ইত্যাদি 'বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৯২'।

১০। 'বাঙালীর বাহুবল', ঐ, ১ম খণ্ড (১৮৮৭)। বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিশ্বাস ছিল যে বাঙালী (তথা ভারতীয়রা) যদি উদ্যোগী, ঐক্যবন্ধ, নৈতিক সাহসে বলীয়ান এবং অধ্যবসায়ী হয় তাহলে হতাশ হবার কোনও কারণই থাকতে পারে না। 'ভারত কলঙ্ক', ঐ দ্রষ্টব্য।

১১। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমজীবনী (১৩১৮ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৯—১২।

১২। বঙ্কিমচন্দ্র, 'বঙ্গদেশের কৃষক', বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, সাম্য (১৮৭৯)। খুলনায় নীল-চাষীদের সমর্থন বঙ্কিমচন্দ্রের সরকারী চাকরিতে পদোন্নতির বাধা হয়ে ওঠে। 'ইন্দু-প্রকাশে' অরবিন্দ লিখেছিলেন, "খুলনার এই সুভদ্র, চিন্তাশীল বাঙালীটিকে হারকিউলিসের রূপ ধারণ করে নর-দানবদের উৎখাত করতে, সংখ্যাতীত গ্লানি, অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার করতে এবং সমাজকে পাপ-মুক্ত করতে দেখা গিয়েছিল।"

১৩। জন প্লামেনাৎস, দ্য ইংলিশ ইউটিলিটেরিয়ানস, পৃঃ ১০০

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র, 'ধর্মতত্ত্ব', দ্বাবিংশতি অধ্যায়। ধর্মতত্ত্ব-প্রথম পর্ব—'অনুশীলন' নামক প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'নবজীবনে' (সম্পাদক—অক্ষয়চন্দ্র সরকার) ১২৯১—৯২ বঙ্গাব্দে।

১৫। 'যথা মম সুখম্ ইষ্টং তথা সর্বপ্রাণীনাম্ সুখম্ অনুকূলম্' ইত্যাদি, গীতার উপর শঙ্করের ভাষ্য, ৬ষ্ঠ, ৩২, গীতা, ৫ম, ২৬ও দ্রষ্টব্য। ধর্ম-তত্ত্ব, একবিংশতি অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

১৬। বঙ্কিমচন্দ্র, সাম্য। 'সাম্য' বলতে তিনি egalitarïanism বুঝতেন, মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র নয়। এ সব ব্যাপারে তাঁর উপরে মিল ও রুশোর প্রভাব বেশী। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এই মত প্রকাশ করেছেন যে পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যায় এবং সাম্য নিবন্ধটির পুনর্মুদ্রণে তিনি অসম্মত হন। বঙ্কিম প্রসঙ্গে, পৃঃ ১৯৮।

১৭। বঙ্কিমচন্দ্র, 'বঙ্গদেশের কৃষক', বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, সাম্য। এই রচনাগুলির উপর জন স্টুয়ার্ট মিল-এর পলিটিক্যাল ইকনমি'র প্রভাব স্পষ্ট।

১৮। বঙ্কিমচন্দ্র, 'লোক শিক্ষা', বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড।

১৯। হার্বার্ট স্পেন্সার, ড্যাটা অফ এথিকস্, একাদশ অধ্যায়।

২০। টি· এইচ· হাক্সলি ও জে. হাক্সলি, এভল্যুশন অ্যাণ্ড এথিকস্ (১৮৮৯) পৃঃ ১৩।

২১। ডি· জি· রিচি, ডারউইনিজম অ্যাণ্ড পলিটিক্স, (১৮৮৯) পৃঃ ১৩।

২২। বঙ্কিমচন্দ্র, 'ভারত কলঙ্ক', বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড; ধর্মতত্ত্ব, চতুর্বিংশতি অধ্যায়; কমলাকান্তের জবানবন্দী।

২৩। 'ত্রি' দেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১২৮২ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যার বঙ্গ দর্শনে প্রকাশকালে নিবন্ধটির নাম ছিল 'মিল, ডারউইন এবং হিন্দুধর্ম'। 'মিল অন নেচার' বিষয়টির উপরেও বঙ্কিমচন্দ্র আলোকপাত করেছিলেন।

২৪। জন স্টুয়ার্ট মিল, থ্রি এসেজ (১৮৭৪) পৃঃ ২৫৫।

২৫। বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের পত্র, ২৭শে জুলাই, ১৮৯২।

২৬। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধাবণাব মূলে ছিলেন অধ্যাপক সীলে (Seeley), ধর্ম-তত্ত্ব, ক্রোড়পত্র, 'খ'। মিলের সঙ্গে তাঁর চিন্তাব সাযুজ্য পূর্বেই উল্লিখিত হযেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বীকৃতিও প্রকাশিত হয়েছিল বিবিধ প্রবন্ধের (২য় খণ্ড) বিজ্ঞাপনে। জন্ স্টুয়ার্ট মিল-এব আত্মজীবনী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'মনুষ্যত্ব কি' নামক একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'অনুশীলন' সম্পর্কিত ধারণা প্রথম প্রকাশ করেন। পরে ধর্মতত্ত্বে এই ধারণা বিশদতর করা হয়। মনস্তত্ত্ববিদ ইয়ুঙ মানুষের জীবনে যে 'সাফল্য' ও 'সংস্কৃতি-বিকাশ' নামে দুটি অধ্যায়ের কথা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্রেব চিন্তাধারার সঙ্গে তার মিল লক্ষণীয। প্রথমোক্ত অধ্যায়ের সঙ্গে 'অহং' বোধ জড়িয়ে থাকে, দ্বিতীয়টি সুরভিত হয়ে ওঠে হিতসাধনের সংকল্পে।

২৭। আধুনিক অধ্যাত্মবাদী পল টিলিচ বলেছেন : "...We can never reach the innermost centre of another being. We are always alone, each for himself. But we can reach it in a movement that rises first to God and then returns from Him to the other self." The Boundaries of our Being (Fontana, 1973), P. 22.

২৮। বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্মতত্ত্ব, ৪র্থ অধ্যায়; 'হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা', প্রচার, ২, পৃঃ ৭৪—৮০।

২৯। অব্যক্তের আরাধনা কঠিনতর বলেই বর্ণিত হয়েছে গীতায় এবং বুদ্ধ বা শঙ্কর—কেউই দেবদেবীর উপর সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের উপর আঘাত হানতে চাননি। শ্রীকৃষ্ণ দুটি বিশ্বাসই সমর্থন করেছেন (যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে অথবা যো যো যাং যাং তনুং ভক্ত ইত্যাদি), কিন্তু একই সঙ্গে গীতাতে সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণার প্রতি মানুষের মোহ সম্পর্কে সতর্কতাবাণী উচ্চারিত হয়েছে। সাকার আরাধনাতেই তৃপ্ত থেকে অধ্যাত্ম-সাধনার প্রাথমিক স্তরে আবদ্ধ থাকলে অস্থায়ী ফল লাভ হয়। গীতা, সপ্তম অধ্যায়, ২৩-২৫। রামমোহনও সাধনার প্রথম পর্যায়ে প্রতিমা পূজা নিন্দনীয় বলে মনে করতেন না। মূর্তি-পূজা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ ফাদার হেস্টির (Hastie) তর্ক-বিতর্ক প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮২'র নভেম্বরে 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায়।

৩০। বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্মতত্ত্ব, চতুর্থ অধ্যায় ; কৃষ্ণ-চরিত্র, উপক্রমণিকা ও ১ম পর্ব, ত্রয়োদশ অধ্যায়।

৩১। গীতা, ৩য় অধ্যায়, ২২—২৫।

৩২। বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণ-চরিত্র, ৪র্থ পর্ব, পঞ্চম অধ্যায়। একজন মানুষই সমস্ত মানবজাতির আদর্শ পুরুষ হতে পারেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মানবত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ কারণেই বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বুকলি খ্রীস্টের মানবত্ব সম্পর্কে যে মত পোষণ করতেন বঙ্কিম সানন্দে তার উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নরত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে ব্রজলীলার মধ্য দিয়ে, প্রকৃতি এবং জীবলোকের সঙ্গে তাঁর একাত্মতায় দ্রৌপদী এবং অর্জুনের (কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাঁর রথের সারথ্য করতেও তিনি দ্বিধা করেননি) প্রতি তাঁর ভালবাসা ও শুভ কামনায়। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে 'ভারতীয় মাত্রের হৃদয়ে চিরকালের মুরলী'বাদক রূপে বর্ণনা করেছেন, তাঁর মধ্যেই দেখেছেন ধ্রুপদী ও রোমান্টিক ভাবধারার সমন্বয়।

৩৩। সমধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যত্রয়— রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস-এর মধ্যে। বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ প্রকাশিত হবার সময় (১২৮৭—৮৯ বঙ্গাব্দ) এবং কৃষ্ণ চরিত্র-এর প্রকাশকালের (১৮৮৬ খ্রীঃ) মধ্যে বাঙালীর স্বাদেশিকতা বা দেশপ্রেম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে 'জাতীয় সম্মেলন' (ন্যাশানাল কনফারেন্স) প্রথম আহূত হয় ১৮৮৩ খ্রীঃ এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৮৫ সালে। বিপিনচন্দ্র পালও বঙ্কিমের সমর্থন করেন। দ্য সোল অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ উঃ পৃঃ ১২৩—২৪।

৩৪। গীতা, ২য় অধ্যায়, ৪৮—৫১, ৬৪, ৬৭।

৩৫। গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১০—৪৭, এবং পঞ্চম অধ্যায়, ২—১০। জ্ঞান বা যোগের সঙ্গে এই ভক্তির কোনও বিরোধ নেই। একমাত্র যোগীই জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করতে সক্ষম (গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়); আর জ্ঞানীর পক্ষেই ঈশ্বরের কাছে নিঃশেষ আত্মনিবেদন সম্ভব (গীতা, সপ্তম অধ্যায়, ১৮ এবং ১৯)। সমবেতভাবে জ্ঞান ও ভক্তি মানুষের স্বভাবের রূপান্তর ঘটাতে পারে। তবে এই প্রক্রিয়া সময়-সাপেক্ষ ('অনেক জন্ম সমসিদ্ধ': এবং 'বহুনাং জন্মানাম্ অন্তে')। আধ্যাত্মিক বা পার্থিব—কোনও মুক্তির পথই যে মন্ত্রতন্ত্রের মধ্যে নেই—সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন সংশয় ছিল না।

৩৬। এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পালের প্রতিক্রিয়া বিধৃত আছে তাঁর লেখা মেমরিজ অফ মাই লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস্ এ, ২য় খণ্ড (১৯৫১), পৃঃ I—III

৩৭। অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি, সপ্তম এবং শেষ প্রবন্ধ, 'ইন্দুপ্রকাশ', ২৭শে অগস্ট, ১৮৯৪। কমলাকান্তের পত্র, ২য় সংখ্যা—রাজনীতি, কমলাকান্তের দপ্তর দ্রষ্টব্য।

৩৮। তদেব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু', 'ইংরেজ স্তোত্র', 'বাংলা সাহিত্যের আদর', 'লোকরহস্য' দ্রষ্টব্য।

৩৯। তদেব। বন্দেমাতরম, ১৬ই এপ্রিল, ১৯০৭ও দ্রষ্টব্য।

৪০। সিডিশন্ কমিটি রিপোর্ট (১৯১৮, পৃঃ ৬৭) অনুসারে এর প্রকাশকাল ১৯০৫, কিন্তু বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মতানুযায়ী এটি রচিত হয় ১৯০৫-এর শেষের দিকে এবং প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে। সি· ই· ডেনহামের রিপোর্ট (ফাইল নং ৪, ৯৫৯) আই· বি· রেকর্ডস, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ও দ্রষ্টব্য। অরবিন্দ অবশ্য বলেছিলেন যে পরিকল্পনাটা বারীনেরই এবং তার ফলাফল নিয়েও তিনি বেশী মাথা ঘামাতেন না। শ্রীঅরবিন্দ অন হিমসেলফ অ্যাণ্ড অন·দ্য মাদার, পৃঃ ৮৫—৮৬।

৪১। 'আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি এবং পূজা করি।-মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে··· না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?' মৃণালিনী দেবীকে অরবিন্দ, ৩০শে অগস্ট, ১৯০৫। বিপিনচন্দ্রের হৃদয়ে এর প্রতিক্রিয়ার বিবরণ পাওয়া যাবে তাঁর লেখা দ্য স্পিরিট অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায়।

৪২। আত্ম-প্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি এবং জাগতিকীপ্রীতি প্রভৃতি অনুভূতিগুলির ক্রমোচ্চ অবস্থান নির্ধারণে বঙ্কিমচন্দ্র হার্বার্ট স্পেন্সার-এর মতই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের মতে বৃহত্তরের স্বার্থে ক্ষুদ্রতরের বিসর্জ্জন কখনোই সমর্থন-যোগ্য নয়। ধর্মতত্ত্ব দ্বাবিংশতি এবং চতুর্বিংশতি অধ্যায়। স্বদেশ প্রীতি ও জাগতিকীপ্রীতি'র মধ্যে যথাবিহিত সমন্বয় সাধনে ব্যর্থতাই ভারতবর্ষের সকল দুর্দশার মূল বলে বঙ্কিম মনে করতেন। আনন্দমঠে বিধৃত এই ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে গ্রন্থটির (১) প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকায়, (২) 'লিবারেল' পত্রিকায় (৮ই এপ্রিল, ১৮৮২) এক অভিজ্ঞ সমালোচকের ব্যাখ্যায় (যেটি বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং অনুমোদন করেছিলেন এবং যার অংশবিশেষ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত হয়েছিল), (৩) এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য় রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে নিবন্ধটিতে, এবং (৪) নব যুগের বাংলা (পৃঃ ১৭৯)-তে বিপিনচন্দ্রের লেখা বঙ্কিম-সাহিত্যে'র উপর ভাষ্যটিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িকগণ তার মর্মকথা উপলব্ধি করতে পারলেও পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে তাঁর বক্তব্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা হয়েছে। বিমানবিহারী মজুমদারের মিলিটান্ট ন্যাশানালিজম ইন ইণ্ডিয়া (কলকাতা ১৯৬৬) 'পরিশিষ্ট'তে লেখক বঙ্গদর্শনে (এপ্রিল ১৮৮১—মে ১৮৮২) প্রকাশিত মূল রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সরকারী রোষ এবং বেআইনী বলে ঘোষিত হওয়ার শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রথম ও পরবর্তী সংস্করণগুলিতে যে পরিবর্তন করা হয়েছিল সে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। তাঁর যুক্তি আকর্ষণীয় হলেও তর্কাতীত এবং গ্রহণযোগ্য নয়। জীবানন্দের শত্রুরা—ইংরেজ (বঙ্গদর্শন, ১৮৮১, পৃঃ ২৫২—৫৫) অথবা যবন (আনন্দমঠ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৯৩—৯৪) যেই হোক না কেন, তার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনাদর্শের কিছুমাত্র পরিবর্তন সূচিত হয় না। তেমনি লেখক কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের

ঘটনাস্থলেব পবিবর্তন বা সন্তানগণ কর্তৃক নিহত ব্রিটিশ সেনাদেব সংখ্যা কমিয়ে দেওয়াব ফলে বঙ্কিমচন্দ্রেব দেশপ্রেম কিছুমাত্র হ্রাস পায না। ১৭৭২—৭৪-এব প্রথম ভুটান যুদ্ধে সন্ন্যাসীরা ব্রিটিশদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবেছিল। দ্রষ্টব্য কোলব্রুককে হেষ্টিংস, ৩১শে মার্চ, ১৭৭৩, প্রোসিডিংস ইন সিকবেট ডিপার্টমেন্ট, ৩বা মে, ১৭৭৩, হেষ্টিংসকে ক্যাপ্টেন জোনস, ৩০শে জানুয়াবী, ১৭৭৩, জে এম ঘোষাল, সন্ন্যাসীজ অ্যান্ড ফকিব বেইডাবস্ ইন বেঙ্গল (বেঙ্গল সেক্রেটাবিয়েট বুক ডিপো, MCM XXX) দ্রষ্টব্য—চিত্তবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায, আনন্দমঠ বচনাব প্রেবণা ও পবিণাম (১৯৮৩)

৪৩। টি ডবল্যু ক্লার্ক, দ্য বোল অফ বাঙ্কমচন্দ্র ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ন্যাশানালিজম, সি ডবল্যু ফিলিপস (সম্পা) হিস্টোবিযানস্ অফ ইন্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যাণ্ড সিলোন, পৃঃ ৪৩৯—৪০।

৪৪। বিপিনচন্দ্র পাল, মেমবিজ অফ মাই লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস, ২য খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ XXXIX.

৪৫। অরবিন্দ, 'ওয়ান গোব ফব দ্য অলটব', বন্দেমাতবম, ২৫শে জুলাই, ১৯০৭।

৪৬। ঐ 'স্বদেশীজম', বন্দেমাতবম, ১১ই সেপ্টে, ১৯০৭।

৪৭। ড্যানিলেভস্কি বাশিযা অ্যাণ্ড ইউবোপ, ইত্যাদি, (১৮৭১), ফিওডব ডসটযভস্কি, দ্য জার্নাল অফ অ্যান অথব, (১৮৮০), নিকোলাই গোগোল, ডেড সোলস, (১৮৪২)। এ খান-এব দ্য হিস্ট্রী অফ দ্য বেভল্যুশনাবী মুভমেন্টস ইন বাশিযা, পৃঃ ১—৩২ দ্রষ্টব্য।

৪৮। অববিন্দ, দ্য বেনেসাঁস ইন ইণ্ডিযা (১৯১৮-ব অগস্ট-নভেঃ সংখ্যাব 'দ্য আর্য' তে প্রথম প্রকাশিত) পৃঃ ৩৪—৪৫; ভাবতীয বেনেসাঁসেব বিভিন্ন পর্যায সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পালেব দ্য সোল অফ ইন্ডিযা, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭২—৭৮ও দ্রষ্টব্য।

৪৯। বামকৃষ্ণানন্দকে লেখা বিবেকানন্দেব চিঠি, ১৮৯৫, স্বামী বিবেকানন্দেব বাণী ও বচনা (উদ্বোধন), ৭ম খণ্ড পৃঃ ১২২।

৫০। সালেম-এ প্রদত্ত বিবেকানন্দেব ভাষণগুলি থেকে (শিকাগোব বিশ্বধর্ম সম্মেলন আহূত হবাব পূর্বে) এটা স্পষ্ট হযে ওঠে যে তিনি ভাবতবর্ষেব শিল্পাযনে সাহায্য সংগ্রহেব উদ্দেশ্য নিযে যুক্তবাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু মহা সম্মেলনোত্তব বক্তৃতাগুলিতে তাঁব দৃষ্টিভঙ্গীব আমূল পবিবর্তনেব প্রমাণ সংশযাতীত ভাবেই ফুটে উঠেছে। মেবী লুই বার্ক লিখেছেন, "আমেবিকাবাসীদেব ভাবতবর্ষেব প্রযোজন এবং প্রকৃত ক্ষমতা বিষযে জানানোব উদ্দেশ্যেই তিনি মহাদেশে এসেছিলেন, কিন্তু এখানে তিনি প্রকাশিত হলেন দাতাব ভূমিকায, আমেবিকানদেব কাছে খুলে দিলেন নিজেব হৃদযেব দুযাব, কেন না আধ্যাত্মিক বা পার্থিব—কোনও প্রকাব ক্ষুধাব পবিচয পেলে তা না মিটিযে তিনি কিছুতেই শান্তি পেতেন না।" স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ডিসকভাবিজ, (১৯৫৮) পৃঃ ৩৬—৩৭।

৫১। উদ্ধৃতিগুলি সবই দ্য কমপ্লিট ওযার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ (অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত), ৩য, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ খণ্ড থেকে। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য তাঁব 'কলোম্বো' থেকে আলমোড়া' শীর্ষক বক্তৃতা যেটি মাৎসিনী, গ্যাবিবল্ডীব জীবনী ও গীতাব সঙ্গে ঐ সমযকাব বিপ্লবী সমিতিগুলিব আখড়াতে পাওযা যেত। সুভাষচন্দ্র বসু, অ্যান ইণ্ডিযান পিলগ্রিম, পৃঃ ৫১, 'দ্য সিডিশন কমিটি বিপোর্ট', পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৭। এই বক্তাবলীব কিঞ্চিৎ ভিন্ন রূপ পাওয়া যাবে 'উদ্বোধন' প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দেব বাণী ও বচনা গ্রন্থাবলীতে।

৫২। তুলনীয (১) বিপিনচন্দ্র পালেব স্বদেশী অ্যাণ্ড স্ববাজ (পৃঃ ১৪২) গ্রন্থে বিধৃত: "এটা মাযা, নিছক মাযা। আব ভাবতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তিব এই স্বরূপ (মাযা) উপলব্ধি কবাব মধ্যেই বযেছে নব আন্দোলনেব শক্তিব ভিত্তি।' (২) অববিন্দেব বক্তৃতা (বারুইপুবে প্রদত্ত, ১২ই এপ্রিল, ১৯০৮) "ভাবতবর্ষে আমবা সকলে বিদেশীদেব যে মাযাব কবলে পড়েছি তা-ই আমাদেব আত্মাকে সম্পূর্ণ বশীভূত কবেছে। এই মাযাব প্রভাব কেবলমাত্র নির্যাতন ও দুঃখ বরণেব মধ্য দিযেই কাটানো যায, এবং লর্ড কার্জন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদেব যে দুঃসহ শাস্তি আমাদেব উপব চাপিযে দিযেছেন তা বিদূরিত করে দিযেছে সেই মিথ্যে মাযা।' দ্রষ্টব্য, ভগিনী নিবেদিতা, 'বিলিজন অ্যাণ্ড ধর্ম', পৃঃ ১৪৬।

৫৩। ভাবতবর্ষেব প্রতি বিবেকানন্দেব সুনিবিড় ভালবাসাব পবিচয পাওযা যায নিবেদিতাব দ্য মাষ্টার অ্যাজ আই স হিম, পৃঃ ৪৯—৫০ গ্রন্থে।

৫৪। বিপিনচন্দ্র পাল, 'দ্য নিউ পেট্রিয়টিজম', স্বদেশী অ্যাণ্ড স্ববাজ, পৃঃ ১৯—২০।

৫৫। মৃণালিনী দেবীকে অববিন্দ, ৩০শে অগস্ট, ১৯০৫।

৫৬। দ্য কমপ্লিট ওযার্কস (অফ বিবেকানন্দ), পৃঃ উঃ, ৩য খণ্ড, পৃঃ ২১৩—২৭, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪—৮৫।

৫৭। 'ভাববাব কথা', স্বামীজীব বাণী ও বচনা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৫—৪৬।

৫৮। শিক্ষা বিষযে বিবেকানন্দেব চিন্তাধাবাব জন্য দ্রষ্টব্য দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস, পৃঃ উঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০১—০৩, ('ফিউচাব অফ ইন্ডিয়া'), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৪ ('কনভারসেশনস অ্যাণ্ড ডায়ালগস্'), পৃঃ

২৩১ (ইনটারভিউজ)।

৫৯। এর অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রতি বিবেকানন্দের মনে কোনও দুর্বলতা ছিল। এই শাসনব্যবস্থার অমানবিকতা এবং শোষণ সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং এ জন্য অনুক্ষণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন। মিস মেবী হেল (Miss Mary Hale)কে লেখা পত্রটিতে (৩০শে অক্টো, ১৮৯৯) তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫—৭৮। স্বামীজীর এই প্রবল সাম্রাজ্য-বিরোধিতাব জন্য ১৮৯৮ খ্রীঃ নিবেদিতাকেও নির্যাতিত হতে হয়েছিল। এ বিষয়ে 'নোটস অন সাম ওয়াণ্ডারিংস উইথ স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে বহু তথ্য আছে।

৬০। বিবেকানন্দ, দ্য ইষ্ট অ্যাণ্ড দ্য ওয়েষ্ট, (৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৬৩) পৃঃ ২১ ; দ্য কমপ্লিট ওযার্কস, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৮—৯৪, ২২১—২৩, ২৮৭—৮৮, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২, ৬২, ৬৩, ১২২, ১২৮, ১৪০—৪৫। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য 'মাই প্ল্যান অফ ক্যাম্পেন'। বিবেকানন্দেব কনিষ্ঠ সহোদর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতো কেউ কেউ তাঁকে সমাজতন্ত্রবাদ ও শূদ্র আধিপত্য স্থাপনেব প্রবক্তা হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল কিন্তু আলাদা। বিবর্তনের চক্রবৎ আবর্তনের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে পর্যায়ক্রমে চাবটি বর্ণই সমাজে আধিপত্য স্থাপন কববে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে চারটি বর্ণের সমস্ত মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর একটা সমন্বয় সাধনেব চিন্তা তিনি করেছিলেন। 'ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ক্ষত্রিয়ের সংস্কৃতি, বৈশ্যেব বিনয় এবং শূদ্রের গুণগুলি সযত্নে রক্ষা কবা কর্তব্য। এদের দোষ ত্রুটিগুলি সমস্ত পরিত্যাজ্য'। সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ ও নিহিলিজম-এব মধ্যে তিনি ভিন্নতর তাৎপর্য খুঁজে পেযেছিলেন। তিনি চাননি বৈশ্য বা কায়স্থেব সঙ্গে মিশে না গিয়ে শূদ্ররা তাদের সহজাত প্রকৃতি ও রীতিনীতি সংরক্ষণ করে শূদ্র হিসেবেই সমাজে অপ্রতিহত প্রতাপ স্থাপন করবে। এই তত্ত্বেব মধ্যে অধ্যাত্ম বা সংস্কৃতি সাধনাব উচ্চতর স্তরে উত্তরণের কথা নেই, এবং এই কারণে প্রকৃত বিবর্তনের তত্ত্বও এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯—৬৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮২। রবীন্দ্রনাথের রথের রশিও দ্রষ্টব্য।

৬১। বিবেকানন্দ, দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস, পৃঃ উঃ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪৬১—৬২ ; "এইসব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রকাশ্য কাজকর্মের জঘন্য পশ্চাৎপটের দিকে যদি একবার তাকাও, বিশেষ করে ভোটাভুটির সময়ে—এঁদের ঘুষ দেওয়া-নেওযা, দিনের বেলা সর্বসমক্ষে ডাকাতি, রাহাজানি এবং মানুষের মধ্যে শয়তানের উল্লসিত লীলার দিকে যদি একবাব দৃষ্টিপাত করো, তা হলে, বন্ধু, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তুমি হতাশ হয়ে পডবে।"

৬২। তদেব। ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫—৮৬।

৬৩। কলোম্বো-বক্তৃতায় এই weltanschuung-এর উল্লেখ আছে ; দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৩ ও তৎপববর্তী।

৬৪। বিপিনচন্দ্র পাল, 'দ্য নিউ মুভমেন্ট', ১৯০৭ সালে মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা, স্বদেশী অ্যাণ্ড স্বরাজ, পৃঃ ১৪৬।

৬৫। অরবিন্দ, 'বন্দেমাতবম' (সাপ্তাহিক) ৩রা মে, ১৯০৮।

৬৬। তদেব, ২রা অগস্ট, ১৯০৭, ৮ই জুলাই, ১৯০৭। বারুইপুরে প্রদত্ত অরবিন্দের বক্তৃতায় স্ববিরোধিতাটুকু লক্ষ্যণীয় : 'একটি জাতির প্রধান কর্তব্য এই পরম সত্যটা উপলব্ধি করা যে প্রকৃত মুক্তির আবাসস্থল মানুষের চিন্ময় জগতে এবং যখন তুমি হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবে যে তোমার অন্তরের মুক্তিকে বাহ্যিক কোনও শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যাবে না, তখনই তুমি প্রকৃত মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে।" ১২ই এপ্রিল, ১৯০৮।

৬৭। তদেব, ৯ই জুন, ১৯০৭। বারাণসী কংগ্রেসে গৃহীত দ্বাবিংশতি সংখ্যক প্রস্তাবটি সমর্থন করার সময় ভগিনী নিবেদিতাও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। 'রিপোর্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস', (১৯০৫), পৃঃ ৯৫—৯৬।

৬৮। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মতবাদ, (আর্য প্রতিনিধি সভা, ইউ· পি, ১৯১২), পৃঃ ১—৩, কেনেথ জোনস আর্য ধরম, হিন্দু কনসাসনেস ইন নাইনটিস্থ সেঞ্চুরি পাঞ্জাব (ক্যালিফ, ১৯৭৬) ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬৯। এইচ· বি· শারদা, লাইফ অফ দয়ানন্দ সরস্বতী, পৃঃ ৪০৭।

৭০। বেদ (বেদান্তসহ)-এর অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাস ছিল রামমোহনের, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সে তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মীয় ভাবধারার ক্রম-উত্তরণের তত্ত্ব সমর্থন করতেন, আর বিবেকানন্দের প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত ছিল যে বেদান্তের মধ্যেই বিধৃত আছে বৈদিক চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ এবং পরিণততম অংশ। ধর্মীয় বিবর্তন সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থ অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অফ হিন্দুইজম'তে (কলকাতা, ১৯০৮), পৃঃ ৫১—৫২। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মধ্যে তিনি

বেদ ও উপনিষদের চিন্তাধারার পরিশীলিততর রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আর 'ভক্তিবাদ' ছিল তাঁর মতে ধর্মীয় ধ্যানধারণার মহত্তম সর্বজীনন রূপ। ১৮৬৯ সালে ম্যাক্সমূলার ডিউক অফ আরগিলকে লিখেছিলেন, বেদের পুনঃপ্রবর্তন যদিও বড়ো ধরনের সংস্কার হবে, "something would be lost, for some of the later metaphysical speculations on religion, and again the high and pure and almost Christian morality of the Buddha, are things not to be found in the Veda."

৭১। অরবিন্দ, 'দয়ানন্দ অ্যাণ্ড দ্য বেদ', বেদিক ম্যাগাজিন, ১৯১৬

৭২। বঙ্কিমচন্দ্র, 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম', প্রচার, ১ ও ২য়। সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত। 'আমি কোনও ধর্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করি না': প্রচার, ১, পৃঃ ২০০—০৪।

৭৩। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক হওয়ায় তাঁর পক্ষে পূর্ব-পোষিত ধারণা-জাত কোনও সিদ্ধান্ত—তা আত্মশ্লাঘার কারণ হলেও, গ্রহণযোগ্য ছিল না। বৈদিক যুগের ধর্মীয় ভাবধারার বিবর্তন বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পালের মতামতেব পবিচয পাওয়া যাবে তাঁর লেখা অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অফ হিন্দুইজম-এ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪৯—৫০। অরবিন্দ এবং দযানন্দের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য অতি স্পষ্ট।

৭৪। সত্যার্থপ্রকাশ ('বঙ্গ-আসাম আর্য প্রতিনিধি সভা' সংস্করণ, ১৯৪৭)। সপ্তম, অষ্টম, নবম সমুল্লাস, পৃঃ ১৮৬—২৭৭।

৭৫। তদেব। অল্প বয়সীদের শিক্ষা (বিশেষ করে ব্রহ্মচর্য) পদ্ধতির জন্য তৃতীয়, বিবাহ্ সংক্রান্ত নির্দেশের জন্য চতুর্থ, খাদ্যাদি বিষয়ে দশম সমুল্লাস দ্রষ্টব্য।

৭৬। তদেব। একাদশ সমুল্লাস। মাদাম ব্লাভাটস্কিকে দয়ানন্দের পত্র, ২৩শে নভেঃ, ১৮৮০, শারদার পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৫৪৪।

৭৭। তদেব। একাদশ—চতুর্দশ সমুল্লাস।

৭৮। এ বিষয়ে নীরদ সি· চৌধুরী, স্কলার এক্স্ট্রাঅর্ডিনারী দ্য লাইফ অফ প্রফেসর ম্যাক্সমূলার পি· সি (অক্সফোর্ড, ১৯৭৪), পৃঃ ৩১৩ ও পরবর্তী দ্রষ্টব্য।

৭৯। সত্যার্থপ্রকাশ, দশম সমুল্লাস, পৃঃ ২৮৪।

৮০। 'লাহোর সমাজ' প্রতিষ্ঠার সময় (১৮৭৭) যে দশটি নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল সেগুলির বিবরণ শারদার পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে (পৃঃ ১৮০) লভ্য। এ বিষয়ে জে· রীড গ্রাহাম-এর দ্য আর্যসমাজ অ্যাজ এ রিফরমেশন ইন হিন্দুইজম ইত্যাদি, গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। ফারকুহার-এর মডার্ন রিলিজিয়াস মুভমেন্টস্ ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১২৩, এবং প্রকাশ ট্যণ্ডনের পঞ্জাবী সেঞ্চুরি (১৮৫৭—১৯৪৬), পৃঃ ৩৩—৩৪-তে আর্যসমাজের প্রার্থনা ও হোম ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এগুলির সঙ্গে প্রোটেস্টান্টদের উপাসনা পদ্ধতির যথেষ্ট সাদৃশ্য।

৮১। সি· এ· বেইলি, রুলার্স, টাউনসমেন অ্যান্ড বাজাবস, (কেমব্রিজ, ১৯৮৩)।

৮২। ভি· সি· যোশী (সম্পাদিত) লালা লাজপৎ রায়, অটোবায়োগ্রাফিক্যাল রাইটিংস, পৃঃ ৬২—৭২।

৮৩। চার্লস হিমেসাথ এর ইন্ডিয়ান ন্যাশানালিজম অ্যাণ্ড সোস্যাল রিফর্ম, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৯৯।

৮৪। বিপিনচন্দ্র পাল, মেমরিজ অফ মাই লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭১।

৮৫। লাজপৎ রায়, দ্য আর্য সমাজ পৃঃ ২৫৪ ; দ্য মিশন অফ দ্য আর্য সমাজ ; ১৯১২ খ্রীঃ তৃতীয় আর্যকুমার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, 'দ্য ট্রিবিউন', ২৪শে অক্টো, ১৯১২।

৮৬। এন· জি· ব্যারিয়ার, 'পাঞ্জাব পলিটিকস্ অ্যাণ্ড ডিসটারবেন্সেস অফ নাইন্টিন হাড্রেড অ্যান্ড সেভন' (ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ· ডি· থীসিস) ; 'দ্য আর্য সমাজ অ্যান্ড কংগ্রেস পলিটিক্স ইন্ দ্য পাঞ্জাব ; ১৮৯৪—১৯০৮', দ্য জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ, ২৬ খণ্ড, ৩নং, মে, ১৯৬৭, পৃঃ ৩৬৩—৭৯ ; কে ডবল্যু জোন্স, আর্যধরম্।

৮৭। ভ্যালেন্টাইন চিরল, ইন্ডিয়ান আনরেষ্ট, পৃঃ ১১১—১৭। লাজপৎ রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন : "এর প্রভাবে যে সংযমের সৃষ্টি হয়েছিল তা সমাজের পক্ষে হিতকর। যে বিশেষ প্রকৃতির ধর্মীয় শিক্ষাদান এর ব্রত ছিল তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্যের কোনও সমর্থন ছিল না। এই ধর্মমত দেহ ও মনের, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে, ধ্যান ও বিষয়াদির তত্ত্বাবধানের সময়, সংক্ষেপে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বাবস্থায় শৃঙ্খলাবোধের অপরিহার্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই কারণে ভয়ঙ্কর বিক্ষোভ ও বিস্ফোরণের নিবারণেই এই সমাজ ব্যাপৃত থেকেছে," দ্য মিশন অফ দ্য আর্য সমাজ, পৃঃ উঃ।

৮৮। মর্লে পেপারস, মর্লেকে লেখা মিন্টোর চিঠি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩ই জুন, ১৯০৭, এবং ১২ই জুন, ১৯০৭।

৮৯। অরবিন্দ, 'দয়ানন্দ দ্য ম্যান অ্যান্ড হিস ওয়ার্ক'; বেদিক ম্যাগাজিন, ৯১৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চরমপন্থার রাজনৈতিক পটভূমি

আদর্শ ও চিন্তার রাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং দয়ানন্দের কাছে চরমপন্থীদের অল্প-বিস্তর ঋণ থাকলেও তাঁদের আন্দোলনের প্রধান উৎস অন্যত্র নিহিত। মূলত, সমসাময়িক কালের নরমপন্থী মতাদর্শের বিরুদ্ধেই চরমপন্থী আন্দোলনের আবির্ভাব। নরমপন্থীরা ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের যে মূল্যায়ন করেছিলেন তা ছিল নিতান্তই অগভীর। শুধুমাত্র আবেদন, নিবেদন, প্রাণহীন সভাসমিতির সাহায্যেই বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টায় তাঁরা সীমাবদ্ধ ছিলেন। ইংরেজদের সুবিচারে তাঁদের আস্থা ছিল দুর্মর। সেজন্য ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান নয়, তার কিছু পরিমার্জনা করাই ছিল নরমপন্থার লক্ষ্য। ছাত্রাবস্থায় ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ, আর আদালত-কক্ষে ব্রিটিশ আইনের ব্যবহার তাঁদের বিশুদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে নিয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, শ্রেণী হিসেবে ইংরেজ রাজত্বের দ্বারা বহুবিধভাবে উপকৃত হওয়ায় তাঁদের আনুগত্যে কোনও আঁচড় পড়েনি।[১] বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে সরকারের নানান ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি, ইংরেজদের ন্যায়পরায়ণতা, পক্ষপাতহীনতা এবং উদারতা সম্পর্কে তাঁদের নিঃসংশয় করে তুলেছিল। স্বাধিকার অর্জনের দাবীটা অনুক্তই থেকে গিয়েছিল। ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে সংস্কারের পক্ষপাতী নরমপন্থীরা রাজনীতির ক্ষেত্রেও ছিলেন অতি-সতর্ক সংস্কারপন্থী। এঁদের অধিকাংশ প্রস্তাবই যে যুক্তিসঙ্গত এবং পরিমিত তা স্বয়ং ল্যান্সডাউনও অস্বীকার করেননি। (১৮৯১ খ্রীঃ) তিনি বলেছিলেন যে নরমপন্থীদের আবেদন নিবেদনের বিষয়গুলি সরকারও কোনও না কোনও সময়ে বিবেচনাযোগ্য বলে মনে করেছেন।[২] লর্ড এলগিন জানতেন যে ফিরোজ শা মেহতার মতো নেতাদের কাছ থেকে বিপ্লবের ভয় নেই।[৩] অভিজ্ঞ কংগ্রেসীদের আইনপরিষদে নেবার কথাও বলেন তিনি। সন্দিগ্ধমনা লর্ড জর্জ হ্যামিলটনের স্বীকৃতিও স্মরণযোগ্য : "কংগ্রেস-আন্দোলন, ইংরেজ শাসন নয়, ইঙ্গ-ভারতীয় আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশীয় জনমতের একটা ক্রুদ্ধ আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৪]

আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে নরমপন্থীরা তাঁদের পাশে 'মহানুভব ইংরেজ জাতির উপস্থিতি' আশা করেছিলেন। তাঁদের চোখে ইংরেজদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ছিল মানব প্রতিভার মহত্তম অবদান এবং ব্রিটিশ-প্রজা হিসেবে স্বাধীনতার এই উত্তরাধিকারের অংশলাভের আশা যুক্তি-সঙ্গত মনে হয়েছিল। দাদাভাই নৌরজী বারবার ভারতে প্রচারিত ইংলণ্ডের সনদগুলির শরণ নিতেন। ইংরেজদের দায়িত্ব সম্পর্কে বার্ক অথবা ব্রাইট, মেকলে এবং মান্‌রো যে সব উক্তি করেছিলেন—সেগুলোর উপর আস্থা রেখেই নরমপন্থীদের আন্দোলন পরিচালনার উপদেশ দিতেন তিনি। ইংরেজরা যে ভারতবর্ষের হিতসাধনকে পরম কর্তব্যজ্ঞান করেন সে বিষয়ে এই অগ্রগণ্য নরমপন্থী নেতার

কোনও সন্দেহ ছিল না। তাই তিনি বলেছিলেন, "সদা-ব্যস্ত ব্রিটিশ জাতির কাছে আমরা যদি বলিষ্ঠ-কণ্ঠে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারি তবে তা নিশ্চয় বিফলে যবে না।" নীচের তলা থেকে চাপ সৃষ্টি করা অকল্পনীয় ছিল।

জন্মাবার পর প্রথম পনেরো বছর কংগ্রেস যে একেবারেই মূক হয়ে ছিল—এ অভিযোগ করা যায় না। সমালোচকরা বরঞ্চ অতি-কথনের এবং তুচ্ছ বিষয়ে আগ্রহের জন্য কংগ্রেসীদের দোষী করবেন। কংগ্রেস ছিল একদিকে ভারতবর্ষের আমলাশাহীর শিকার, অন্যদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উদারনীতিক গণতন্ত্রের হাতে প্রতারিত। সিভিলিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টার পর নরমপন্থীরা সরাসরি ব্রিটিশ জাতির কাছে আবেদন-নিবেদন আরম্ভ করেন। কিন্তু এতেও বিশেষ লাভ হয়নি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত হিতৈষী এবং র‍্যাডিকাল সদস্যরা ইংরেজ প্রশাসকদের ঔদাসীন্য, কুটিলতা এবং হৃদয়হীনতার সমালোচনা করেছেন, কিন্তু জনমতের উপর তার প্রায় কোনও প্রভাবই পড়েনি। ডব্‌ল্যু এস· কেইন্-র জীবনীকার লিখেছেন যে "সীমান্ত সংঘর্ষ ছাড়া অন্য কোনও ভারতীয় সমস্যা বা প্রশ্ন উঠলেই কমন্স-সভার সদস্যরা সবুজ আসন ছেড়ে চলে যেতেন। সভায় মাত্র চল্লিশ বা পঞ্চাশজন সদস্য উপস্থিত থাকলেই পার্লামেন্টের কৃষক-দরদীদের বুক সাফল্য-গর্বে ভরে ওঠে।"[৫] প্রধানত, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের বিরুদ্ধেই সকলের ক্ষোভটা জমে উঠেছিল। অন্ততপক্ষে তাঁদের নিজের নিজের কর্তব্য-পালন বিষয়ে আন্তরিক করে তোলাটা সংস্কার-পন্থীদের কাছে অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। তবে ভিন্ন ধারণাও অনেকে পোষণ করতেন। কর্মদক্ষতায় এই সিভিলিয়ানরা যে গোটা পৃথিবীতে অতুলনীয় সে বিষয়ে কেইন-এর কোনও সংশয় ছিল না। কার্জনের প্রশাসনিক কুশলতায় বিমোহিত হয়ে স্যামুয়েল স্মিথ লিখেছিলেন, "প্রজারঞ্জক স্বৈরতন্ত্রই এশিয়ার অধিবাসীদের পক্ষে সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা···এখন ভারতবর্ষের বিশেষ প্রয়োজন একজন আধুনিক আকবরের।"[৬] প্রশাসকদের সম্পর্কে অভিমত যা-ই হোক না কেন, উনবিংশ শতকে ব্রিটিশরাজের উদার হস্ত থেকে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কার লাভে ধন্য হওয়াটাই ছিল নরমপন্থীদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। আর সেই অ-দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির জগতে তাঁদের অস্তিত্বটাই হয়ে ওঠে নিরর্থক। ফলে কংগ্রেসীদের দ্বিতীয় প্রজন্ম নরমপন্থী নেতৃত্বে আস্থা হারায় এবং এতাবৎ অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতিগুলিও অকেজো বলে প্রতিপন্ন হয়। গঠনতান্ত্রিক দুর্বলতা, কংগ্রেস প্রতিনিধিদের শ্রেণী-প্রকৃতি ও আচার আচরণ তাঁদের অজানা ছিল না। ১৮৯৯ সালে অনুমোদিত হলেও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র কার্যকর হয়নি। স্থায়ী কমিটিগুলির নির্বাচন স্থগিত ছিল। সভায় উপস্থিতির হার ছিল অল্প। ফিরোজ শা মেহ্‌তার কর্তৃত্ব ছিল অসপত্ন। ওয়াচাকে পাশে ও গোখলেকে পিছনে নিয়ে তিনি কংগ্রেসের সব কাজ কঠিন হাতে নিয়ন্ত্রণ করতেন।[৭] তাঁরই প্রতিবন্ধকতায় মাদ্রাজ কংগ্রেসে (১৯০৩) নতুন গঠনতন্ত্র·গ্রহণের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। তিলক প্রতিবাদ করলে দাদাভাই নৌরজী তাঁকে মৃদুভাবে ভর্ৎসনাও করেন। তুর্গেনিভ-এর 'ফাদার্স অ্যান্ড সন্স্' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে রাশিয়ার তরুণ সম্প্রদায় তাদের পিতা-পিতৃব্যের পুরোনো, জীর্ণ কিন্তু সযত্ন-পোষিত জীবন-দর্শন কীভাবে অবজ্ঞাভরে বাতিল করে দিয়েছিল। বিশ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষেও নবাগতরা তেমনি করে প্রাচীন-প্রবীণদের উপহাস ও কৃপার পাত্র বলে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে বাতিল করতে চেয়েছিলেন।

অর্জিত সাফল্যের মানদণ্ডে নরমপন্থী রাজনীতিকে ব্যর্থ বলেই স্বীকার করতে হয়। তাঁদের সমস্ত আপত্তি ও প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ইন্ডিয়া কাউন্সিল সগৌরবে এবং

দোর্দণ্ডপ্রতাপে তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। লর্ড ক্রশ-এর আইনে (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৯২) ছলনার ভাগই ছিল বেশী। ভারতসরকার স্বয়ং যেটুকু প্রশাসনিক সংস্কার মেনে নিতে রাজী ছিলেন ক্রশ-এর বিধানে তা-ও ছিল না। ১৮৮১ খ্রীঃ লর্ড রিপন অবশ্য এ দেশের শাসন কাঠামোতে কিছুটা নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।[৮] কংগ্রেসীরাও আইন-পরিষদের সম্প্রসারণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, দাবী করেছিলেন ন্যূনতম অর্ধেক সদস্য নির্বাচিত হওয়া উচিত। ১৮৮৮-র নভেম্বরে ডাফরিন নীতিগতভাবে নির্বাচনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ ছাড়াও বেসরকারী সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি, পরিষদ সদস্যদের জবাব দাবী করার এবং আর্থিক বিষয়ে কিছু নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রবর্তনের সুপারিশও করেন।[৯] এ দেশে অনুসৃত পরোক্ষ-নির্বাচন প্রথা যে অবাঞ্ছনীয় সেটা ল্যান্সডাউনও মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর মত ছিল এই যে "নির্বাচন এড়িয়ে শুধুমাত্র মনোনয়নের উপর নির্ভর করে থাকলে অসন্তোষ বাড়বে। লর্ড ডাফরিনের 'মিনিট' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে যাঁরা প্রশাসনের ক্ষেত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা পত্তনের জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন, তাঁদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হতাশ হবেন, তাঁদের আনুগত্যও নষ্ট হবে।"[১০] কিন্তু ভারতসচিব ক্রশ অথবা প্রধানমন্ত্রী সলস্‌বেরি কেউই এ ধরনের ব্যাপক পরিবর্তনের ঝুঁকি নিতে চাননি।[১১] সুতরাং ১৮৯২-এর ২০শে জুনে প্রবর্তিত ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্টে নির্বাচন নয়, কয়েকজন সদস্যের মনোনয়নের কথাই উল্লিখিত হলো; পরে কিম্বারলি ধারা দ্বারা এক ধরনের পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা হলেও বলবৎ রইল বেসরকারী সদস্যদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ। এরই প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গোখলে বলে উঠেছিলেন, "সরকার সংখ্যালঘুদেরই এ দেশের সাধারণ প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করে রেখে দিলেন।" সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়, "বিতর্ক একটা প্রাণহীন প্রথা মাত্র, কেউ কেউ বলেন—প্রহসন। বাজেট তারও বাইরে।"

ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডে যুগপৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের দাবী কংগ্রেস কিছুকাল ধরেই করে আসছিল। তা ছাড়াও ছিল সিভিল সার্ভিসে ঢোকার বয়স বাড়াবার দাবী। ১৮৬০-৬৫-তে ঊর্ধ্বতম বয়ঃসীমা যখন ২২ ছিল তখন ১ জন ভারতীয় পাশ করে। ১৮৬৬ থেকে '৭৮-এ বয়ঃসীমা কমানো হয় ২১ বছরে, তখন পাশ করেছিল ১১ জন। সলস্‌বেরি ১৮৭৮ সালে বয়ঃসীমা আরও কমিয়ে করলেন ১৯। লিটন এর প্রতিবাদ জানান (২রা মে, ১৮৭৮)। রিপনও প্রতিবাদ করে জানিয়েছিলেন, ১৮৭৮—৮৩ সালের মধ্যে মাত্র ১ জন পাশ করতে সমর্থ হয়েছে এবং এমন অন্যায় ব্যবস্থা অবিলম্বে রদ হওয়া উচিত। কিম্বারলি জবাবে তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।[১২] লিটন প্রবর্তিত স্ট্যাটুটরী সিভিল সার্ভিসের অবস্থাও ভারতীয়দের পক্ষে বেশী অনুকূল ছিল না। ১৮৮৬ ও ১৯০৫-এর মধ্যে প্রবেশিকা ও স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের হার অনেক বেড়েছিল, অথচ ৭৫ টাকা ও তদূর্ধ্ব মাস মাইনের সরকারী চাকরীর হার ৬ শতকের বেশি বাড়েনি। গ্ল্যাডস্টোনের সময় (২রা জুন, ১৮৯৩) হাউস অফ কমন্স-এর একটা প্রস্তাবে নীতিগতভাবে যুগপৎ-পরীক্ষা মেনে নেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু কিম্বারলি সেটা বাতিল করে দেন। এ জাতীয় সংস্কারের ফলে ইংরেজদের প্রাধান্য কমে যাবে—এ আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছিল তাঁর মনে।[১৩] 'আই· সি· এস·'-এর জন্য অত্যন্ত বেশী 'কম্পিটিশন-ওয়ালা'র আবির্ভাব কার্জনকেও যৎপরোনাস্তি বিরক্ত করে (যদিও ঐ পরীক্ষায় খুব কম সংখ্যক ভারতীয় পরীক্ষার্থীকে দেখা যেতো)। 'নেটিভ'রা তাদের ক্ষুরধার বুদ্ধির সাহায্যে ঐ 'কভেনান্টেড' পদগুলি ছিনিয়ে নিচ্ছে বলে তাঁর আক্ষেপের অন্ত ছিল না।[১৪] এই অতি-বিতর্কিত

ভাইসরয়কেই পরবর্তীকালে ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের অনুদ্যোগ বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাঁর অভিযোগ—এঁরা অন্যান্য সমস্ত শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোকজনের থেকে নিজেদের আলাদা একটা গোষ্ঠীতে পরিণত করেছেন। আপন জ্ঞান-গরিমা এবং অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে অতি-সচেতন হয়ে এঁরাই অতি জরুরী বিষয় উপেক্ষা করে প্রশাসনকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছেন।

মাঝে মাঝে অল্প কিছু চক্ষু লজ্জায় ভুগলেও ব্রিটিশ কন্জারভেটিভ পার্টি বরাবরই জোর গলায় এই মত জাহির করে এসেছে যে ভারতবর্ষে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে অথবা প্রশাসন বিভাগে ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করলে ব্রিটিশ রাজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে। প্রায় একদশক স্থায়ী নরমপন্থীদের আন্দোলন বিরূপ ইংরেজ শাসকদের কঠিন হৃদয় একটুও নরম করতে পারেনি। হাউস অফ কমন্স-এ আইরিশ হোম রুল-ওয়ালাদের কাণ্ডকারখানায় ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী এতই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে ভারতে নির্বাচনমূলক কোনও ব্যবস্থা পত্তনের কথা তাঁরা কানেই তুলতেন না।[১৫] চল্লিশ বছর আগে স্যার চার্লস উড যে সব বুলি আওড়াতেন, লর্ড জর্জ হ্যামিলটন সেগুলিই আবৃত্তি করে চলেছিলেন।[১৬] ভারতবর্ষ সম্পর্কে যেসব রোমান্টিক স্বপ্ন কিছু কিছু হুইগদের মাঝেমাঝে আবিষ্ট করতো সাম্রাজ্যবাদীরা সেগুলিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ন্যায়পরায়ণ দেওয়ানী আদালত, বিদ্যার প্রসার, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশাসক নিয়োগের ব্যবস্থা প্রভৃতি যে সব প্রশংসাযোগ্য পদ্ধতিগুলি একদা ব্রিটিশ শাসনের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হিসেবে অতি-বিজ্ঞাপিত হতো সেগুলিই এখন তাঁদের চোখে সাম্রাজ্যের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক ঠেকছিল।[১৭] নেটিভদের সম্পর্কে ইংরেজদের যে হীন ধারণা তৈরী হয়েছিল তা জাতি বৈরের রূপ ধারণ করে এবং বড়লাট-স্থানীয় কর্তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতীয় কুলি নিধনে বা নারী ধর্ষণে তার বর্বর প্রকাশ বাড়তে থাকে।[১৮]

ব্রিটেন ও ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে গোখ্‌লে গোল্ডস্মিথের 'ভাইকার অফ ওয়েকফিল্ড'-এ বর্ণিত দৈত্য ও বামনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।[১৯] সামরিক ব্যয়ের কথা ধরা যাক। সলস্‌বেরি একদা ভারতকে "প্রাচ্য সমুদ্রে ইংরেজ সৈন্য ঘাঁটি" আখ্যা দিয়েছিলেন। চীন থেকে মাল্টা—সাম্রাজ্যের যে কোনও প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পাঠানো হতো ভারতের ব্যয়ে। ১৮৮৫, ১৮৯১ খ্রীঃ সামরিক খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে নরমপন্থীদের প্রতিবাদে কিম্বারলি কর্ণপাত করেননি। অথচ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, নিয়োগপ্রাপ্ত ইংরেজ সৈন্যের অর্ধেক নিলেই চলতো।[২০] সীমান্ত প্রদেশে যুদ্ধের ব্যয় কম ছিল না—শুধু চিত্রল অভিযানে ব্যয় হয়েছিল ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। সুয়াকিম-এ মোতায়েন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমস্ত ব্যয়ভার এদেশের রাজস্ব থেকে মেটানোর বিরুদ্ধে বৃথাই আপত্তি জানিয়েছিলেন এল্‌গিন। ওয়েলবি কমিশন যে সামান্য 'ছাড়'-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, তা সবই নিরর্থক করে দেয় পারস্যে কন্‌সুলেট রাখার খরচ, মাসকাটে ভরতুকি দান, বুয়র যুদ্ধে ধৃত বন্দীদের ব্যয়ভার বহন এবং বিনিময়-সমতা রক্ষার খাতে বিলেতে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রেরণ।[২১] ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সালে হোমচার্জের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫·৩ কোটি ও ২৪·৪কোটি টাকা, যা ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ। এর উপর দক্ষিণ আফ্রিকা এবং প্রয়োজন বোধে, অন্যত্র কাজে লাগানোর জন্যে একটা রিজার্ভ সেনাবাহিনী গড়ে তোলা এবং তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভারতবর্ষের উপর চাপিয়ে দেবার প্রস্তাব ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে উঠলে লর্ড কার্জনই তার প্রতিবাদ করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধবিগ্রহের

খরচাদির দায়িত্ব ভারতবর্ষের উপর চাপিয়ে দিলে এ ধরনের ব্যয়ের কিছু অংশ ইংলণ্ডেরও বহন করা উচিত—কংগ্রেসের এ দাবীর যৌক্তিকতা বৃদ্ধি পায়।[২২] "ভারতবর্ষে কর্ম-রত ইংরেজ কর্মচারীদের অপশাসন এবং অবিচারের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মতোই এ জাতীয় স্বেচ্ছাচার এবং অন্যায় পীড়ন ভারতবর্ষে আমাদের শাসনের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল করে দিচ্ছে"—এই খেদোক্তি শোনা গিয়েছিল লর্ড কার্জনের মুখে।[২৩]

১৮৯৪ এবং ১৮৯৬ সালে বাণিজ্য শুল্ক এবং সূতিবস্ত্রের উপর উৎপাদন শুল্ক সংক্রান্ত আইন দুটি নিঃসন্দেহে চরমপন্থীদের হাত শক্ত করে দিয়েছিল। ১৮৯৪ সালে আর্থিক সংকটের অজুহাতে সরকার সুতো এবং সূতীবস্ত্রের উপর ৫% আমদানী শুল্ক প্রবর্তন করে এবং একই সঙ্গে ভারতসচিবের নির্দেশে ভারতীয় মিলগুলিতে তৈরী মোটা কাপড়ের উপর ৫% উৎপাদন শুল্ক চাপিয়ে দেয়।[২৪] বলা বাহুল্য, শেষোক্ত ব্যবস্থাটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত করা, রাজস্ব বৃদ্ধি নয়। হয়তো সে কারণেই ফিনান্স-মেম্বার ওয়েষ্টল্যাণ্ড এই নীতি সমর্থন করেননি। ১৮৯৪-এর ১৪ই জুলাই এক মিনিটে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ব্রিটেন যেখানে ভারতে কাপড় ও সুতো মিলিয়ে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার মতো আমদানী করে, সেখানে অনুরূপ মানের ভারতীয় মিলের উৎপাদন মূল্য ৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার বেশি নয়। তিলক-সম্পাদিত 'মারাঠা', সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সঙ্গে একযোগে এই শুল্কনীতির নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠে।[২৫] ১৮৯৪ সালের কংগ্রেসে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে "ভারতের শিশু বস্ত্রশিল্প এতে পঙ্গু হয়ে পড়বে।" প্রস্তাবক দীনশা ওয়াচা ছিলেন বোম্বাই সূতীকল মালিক সমিতির অন্যতম সোচ্চার সভ্য। কিন্তু নির্বিকার সরকার ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্পপতিদের দাবী মেনে নিয়ে[২৭] ১৮৯৬-এর ফেব্রুয়ারিতে আরও দুটি আইন জারী করলেন যার দ্বারা বিদেশী সূতীবস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক কমিয়ে ৫% থেকে ৩$\frac{১}{২}$% করে দেওয়া হয় কিন্তু একই সঙ্গে ভারতীয় মিলজাত সূতীবস্ত্রের উপর ৩$\frac{১}{২}$% উৎপাদন শুল্ক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[২৮] ক্ষুব্ধ তিলক 'মারাঠা' পত্রিকায় লিখলেন, "সম্রাজ্ঞীর অধীনে এ দেশের শাসনভার ন্যস্ত হবার পর শুধুমাত্র ল্যাঙ্কাশায়ারের মুনাফা বৃদ্ধির কথা ভেবে সূতীবস্ত্রের উপর শুল্ক প্রবর্তনের মতো এমন অবিচার আর ঘটেনি।"[২৯] নরমপন্থীদের মধ্যে অর্থনীতিবিদ হিসেবে সুখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত এই ব্যবস্থাকে "বাণিজ্য ও রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে একটা চরম অন্যায়ের দৃষ্টান্ত" রূপে বর্ণনা করে লিখলেন, "আধুনিককালে এমন ঘটনার তুলনা মেলা ভার।" ১৯০২ এবং ১৯০৪ সালে জাতীয় কংগ্রেসও কঠোর ভাষায় এই শুল্কনীতির নিন্দা করে প্রস্তাব নিয়েছিল।[৩০] গোখলে সেই জানা-কথাটাই আবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে এই শুল্কের ভার বহন করতে হবে এ দেশেরই মানুষকে যাঁদের অধিকাংশই অতি দরিদ্র।[৩১] 'মারাঠা' পত্রিকা শুধু ল্যাঙ্কাশায়ারকেই দোষী সাব্যস্ত করে ক্ষান্ত হয়নি, 'এর মধ্যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অর্থনীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে' বলেও মত প্রকাশ করেছিল। 'ইংরেজ শিল্পপতিরা ভারতবর্ষকে শুধুমাত্র কৃষি-উৎপাদনেই আবদ্ধ রাখত চান ; তাঁদের বাসনা ইংলণ্ডের শিল্প-উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য এ দেশ কেবলমাত্র কাঁচামাল উৎপন্ন করুক'—আর 'কেশরী' পত্রিকায় তিলকের সংযোজন : "ইউরোপীয়দের জন্য ভারতবর্ষ যেন সুবিশাল গোচারণ ক্ষেত্র।"[৩২] অরবিন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছিল যে লোক-ঠকানো আইন পরিষদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে, ভারতসচিবের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে সরকারের উচিত পদত্যাগ করা।

শুল্ক-সম্পর্কিত এই নগ্ন অবিচার থেকে তিলক যে রাজনৈতিক শিক্ষাটা লাভ করেছিলেন

তা বিশেষ অর্থবহ। তিনি লিখেছিলেন, "নবীন ভারতবর্ষের জাত-শত্রু ইংরেজরা (এতদিন) তার স্বরে চিৎকার করে এসেছে যে ভারতীয়রা কোনও দিনই একটা মহাজাতি হিসেবে গড়ে উঠত পারবে না। এই জঘন্য অবিচার যেন আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে দেয়। জাতির স্বার্থে সর্ববিধ বৈষম্য এবং মতপার্থক্য দূর করা আমাদের কর্তব্য, দেশের সমস্ত মানুষ এবং ইঙ্গ-ভারতীয়রা যেন সম্মিলিত ভাবে এই শত্রুর সম্মুখীন হবার ক্ষমতা লাভ করে।"[৩৩] সরকারের এই শুল্কনীতিই বয়কটের পথ প্রস্তুত করে দেয়। দেশের সমস্ত মানুষকে ল্যাঙ্কাশায়ারে তৈরী বিলেতি-কাপড় ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল 'মারাঠা' পত্রিকায়। "ল্যাঙ্কাশায়ারের সীমাহীন লোভই যদি ভারতবর্ষের উপর চেপে বসতে চায় তাহলে ঐ মুনাফা-লোভীদের সর্বনাশ ঘটানোর প্রতিজ্ঞা ভারতবর্ষকে উদ্দীপিত করুক।" বিলেতি-বস্ত্র বয়কটকে কার্যকর করার জন্য বোম্বাই-এর বিভিন্ন জায়গায় বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। একের পর এক জনসভায় স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের শপথ নেন বহু মানুষ। প্রকাশ্য জায়গায় বিলেতি কাপড়ের বহ্নুৎসব শুরু হয়ে যায়।[৩৪] অবশ্যই এই আন্দোলনে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিলক।[৩৫] ১৯০২ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে স্বদেশী প্রচার সমর্থনের জন্য যে প্রস্তাব পেশ করা হয় 'বিষয়-সমিতি' তা প্রত্যাখ্যান করলেও এই অভিনব প্রচেষ্টা জনচিত্ত আলোড়িত করতে শুরু করে। দাদাভাই নৌরজী কিন্তু ১৮৮০-র দশকেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে "যদি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা নিরসনের ব্যাপারে হতাশ হন এবং শিক্ষিত, জাগতিক বিষয়-আশয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তরুণরা তাঁদের পরিচালনার জন্য এগিয়ে আসেন, তা হলে বিলেতি-পণ্যের বিরুদ্ধে এই সর্বজনীন বিদ্বেষকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণায় পরিণত করা খুব কষ্টসাধ্য হবে না।"

কার্জনও স্বীকার করেছেন যে বাণিজ্যিক-সমতা রক্ষার অজুহাতে যে উৎপাদন-শুল্ক ভারতীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার প্রকৃত লক্ষ্য ল্যাঙ্কাশায়ারের 'শিল্পপতি তোষণ।'[৩৬] ১৮৯৯ সালে বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষার দোহাই দিয়ে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার অনুদান-পুষ্ট চিনির আমদানীর উপর শুল্ক প্রবর্তনের প্রশ্নেও তাঁকে রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। ঘটনাটা এরূপ। ১৮৯৮-এর ৫ই মার্চে এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারতসরকার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ইউরোপ থেকে চিনি-আমদানীর ফলে ভারতবর্ষের আখ-চাষীদের কোনও ক্ষতিই হয়নি। বাণিজ্যিক-সমতা বজায় রাখার অজুহাতে সরকার আমদানীকৃত চিনির উপর শুল্ক চাপাতে অরাজী ছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, ভারতীয় বাজার সংরক্ষণের জন্য মরিশাসের চিনি-কল মালিকরা যে সমস্ত আবেদন করেছিলেন সেগুলির সুপারিশ করতে ভারতসচিবের কোনও আপত্তি হয়নি।[৩৭] এতে কার্জনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বিরূপ। ভারতসচিব নীতি ঠিক করে দেবেন, পথ বাৎলে দেবেন, আর সুবোধ বালকের মতো তিনি তা অনুসরণ করবেন—এটা তাঁর মতো আত্ম-সচেতন মানুষের পক্ষে অবমাননাকর। এর কিছু পরেই বাণিজ্যিক-সমতা রক্ষার জন্য তিনিই চিনির উপর আমদানী শুল্ক বসানোর প্রশ্নটি উত্থাপন করেন, পেছনে ছিল উপনিবেশ-দপ্তরের চাপ। সলস্‌বেরী, চেম্বারলেন এবং ব্রডরিকের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু, এবং তার সারমর্ম ভারত সরকারের অর্থদপ্তরে পাঠানো হয়েছিল এবং সেটাই কার্জনকে মত বদলাতে বাধ্য করে।[৩৮] রানাডে এবং আনন্দচারলুর মতো অনেকেই সরল মনে এই সরকারী সিদ্ধান্ত সমর্থনে সোচ্চার হয়েছিলেন। এমন কি তিলককেও তাঁদের মতে সায় দিতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু একজন বাঙালী ভদ্রলোক—পৃথ্বীশচন্দ্র রায়—সরকারী নীতিটির স্বরূপ

উপলব্ধি করে তার তীব্র সমালোচনা করেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণের পিছনে ভারতবর্ষের চিনিশিল্প অথবা ভারতীয় ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষার কোনও উদ্দেশ্য নেই, তা যে মরিশাসের ইংরেজ আবাদ-কারীদের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই গৃহীত হয়েছিল তা এই বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।[৩৯] এ বিষয়ে পার্লামেন্টের 'ব্লু-বুক' প্রকাশিত হলে ভারতসচিবের চিঠিপত্রগুলিই বলে দেয় ঐ ব্যবস্থা গ্রহণের পিছনে সরকারের প্রকৃত অভিসন্ধিটা কি ছিল। সমস্ত ব্যাপারটার আসল চেহারা আর কারো কাছে গোপন থাকে না এবং এরপর ১৯০২ সালে কার্জন বাণিজ্য সমতা রক্ষার জন্য অতিরিক্ত শুল্ক প্রবর্তনের প্রস্তাব করলে কিছু নরমপন্থী ছাড়া কেউ সাড়া দেয়নি। রানাডে অবশ্য তখনও আশা করেছিলেন সরকার এ দেশকে অবাধ বাণিজ্যের স্বর্গে পৌঁছে দেবে। 'মারাঠা' পত্রিকায় কিন্তু দাবী করা হয়েছিল যে ব্রিটিশ উপনিবেশে তৈরী চিনি আমাদানীর ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প-সংরক্ষণনীতি সমভাবে প্রযুক্ত হোক।[৪০] জোসেফ চেম্বারলেনের শুল্কনীতি ভারতকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছিল। কার্জনও মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, "এ ধরনের অবিচার ভারতীয়দের মর্মের গভীরে প্রবেশ করছে এবং আনুগত্যের শিকড় কাটছে।"[৪১]

তবে কার্জনের মনোভাব কখনোই এ দেশের মানুষের কাছে সন্দেহাতীত হয়ে উঠতে পারেনি। ভারতবর্ষের স্বার্থ সম্বন্ধে তিনি যদি আন্তরিকভাবেই উদ্বিগ্ন হতেন তা হলে এ দেশের রাজস্ব থেকে পারস্যকে ঋণদানে তিনি আগ্রহী হতেন না, প্রচণ্ড ব্যয়বহুল (প্রায় ১৮০,০০০ পাউণ্ড) দিল্লী দরবারের আয়োজন করতেন না, লবণ-কর হ্রাস করার জন্য লর্ড হ্যামিলটন যে প্রস্তাব করেছিলেন তা-ও বাতিল করতেন না।[৪২] বিগত পঞ্চাশ বছরের নানান আলোচনা এবং রমেশচন্দ্র দত্তের খোলা চিঠির (সহানুভূতির সঙ্গেই ভারতসচিব যার উল্লেখ করেছিলেন) মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত যে সমস্ত অবিচার ও অন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—সেগুলির সংশোধনে কার্জনের কোনও আগ্রহ দেখা যায়নি। রমেশচন্দ্রের খোলা চিঠির জবাব তিনি দিয়েছিলেন অতি কটু ভাষায়। দাদাভাই নৌরজি 'অ-ব্রিটিশ' শাসনাধীনে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যান স্তূপীকৃত করলেও, এ দেশের মাথা-পিছু গড় আয় যে বৃদ্ধি পেয়েছে (বছরে ত্রিশ টাকা), দেশের সম্পদ-নিষ্কাশনের তত্ত্বটা যে একেবারে ভুল—তা প্রমাণ করায় মহামান্য বড়লাটের উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। ব্যয় সঙ্কোচন ও প্রজাহিতৈষণার যে সমস্ত দাবী তাঁর কণ্ঠে অহরহ শোনা যেতো তা সবই যে মিথ্যে বাগাড়ম্বর তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনায় (যা বঙ্গদেশের প্রশাসন-খাতে ব্যয় দ্বিগুণ করে দিয়েছিল) এবং অহেতুক তিব্বত অভিযানে।

অবশ্য কার্জনের অর্থনীতি নয়, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীই ব্রিটিশ-বিদ্বেষ সর্বজনীন করে দিয়েছিল। 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'র প্রফেট, সপ্তদশ শতকের দৈবসত্বে বিশ্বাসী রাজা, অষ্টাদশ শতকের জ্ঞান-দীপ্ত স্বৈরশাসকের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য যেন তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। গর্বান্ধ এই 'প্রোকন্‌সাল'-যিনি অধঃস্তন কর্মচারীদের 'সার্ফ' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না,[৪৩] 'ইণ্ডিয়া অফিসে'র সঙ্গে সুযোগ পেলেই যিনি দ্বৈরথে নেমেছেন এবং তাঁর নিজের উপর কল্পিত অথবা প্রকৃত অবিচারের বিরুদ্ধে যিনি অবিরত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন[৪৪]—তাঁর কাছে প্রজানুরাগ তো দূরের কথা, প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের সদিচ্ছাটাও আশা করা বৃথা। ভারতবর্ষের অসামাজিক জীবগুলিকে সুশাসনে রাখার যে মহান ব্রত ব্রিটিশরাজ স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, নিজেকে তারই মহান প্রতীক ভেবে কার্জন আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। 'উষর বেলাভূমি এবং অন্তরীপে

(সাম্রাজ্যের) যে আলোকশিখাটিকে নির্বাপিত-প্রায় দেখেছিলেন কিপ্‌লিঙ, তাকেই আবার প্রদীপ্ত করে তোলার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করতেন কার্জন ।’ প্রাচীন নিনেভ বা টায়ারের মতো ‘সাম্রাজ্যে’র গরিমাও যাতে অস্ত না যায় সে জন্য তাঁর উদ্বেগের অন্ত ছিল না । একজন অতুলনীয় সংস্কারক রূপে তাঁর অহঙ্কারের প্রকাশ ছিল অবিশ্বাস্য ।[৪৫] প্রাদেশিক সরকার এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের উপর কিছু মাত্র আস্থা না রেখে তিনি নিজের কাঁধে গুরুভার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন, আর অতিশ্রম-জনিত বদ মেজাজ তারই প্রতিক্রিয়া । আপন অত্যুচ্চপদে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গতায় কাতর:“ইংরেজরা সুহৃদ ও সহকর্মী বলতে যা বোঝেন তেমন একজনও আমার পাশে নেই ।”[৪৬] ঐ অবস্থায় ক্ষীণতম মতপার্থক্যও তাঁর কাছে বৈধ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বলে মনে হতো, মৃদুতম সমালোচনা বিশ্বাসভঙ্গের দৃষ্টান্ত ।[৪৭] অমানুষিক পরিশ্রম ও নাটকীয় আচরণের মধ্য দিয়ে স্বদেশবাসীদের তিনি দেখাতে চাইতেন কেমন করে শাসন করতে হয় । যাঁর বাসনা এমন বালসুলভ তাঁর শাসনাধীন “এই সমস্ত হতভাগ্য নেটিভ, এই অদ্ভুত মানুষগুলো”র[৪৮] সঙ্গে হৃদয়ের সাযুজ্য স্থাপনের চিন্তা কি করে তাঁর মনে উদয় হতে পারে ?

কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহে একজন বড়লাটের মধ্যে যেসব গুণ থাকা অত্যাবশ্যক ছিল—যেমন, দূরদৃষ্টি, ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা, বিচক্ষণতা ও ধৈর্য—কার্জন চরিত্রে তাদের অভাব ছিল মর্মান্তিক । একজন ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের পক্ষে বিশ শতক ছিল নিতান্তই অসময় । কার্জনের নিজের লেখাতেই পাওয়া যায় এই কথাগুলি : “এক কথায়, ভারতবর্ষে আমাদের কাজের মূল্যায়ন করতে হলে আমি ‘দক্ষতা’ শব্দটিই ব্যবহার করবো । দক্ষতাই ছিল আমাদের মূলমন্ত্র ; আমাদের প্রশাসনের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ।” কিন্তু দক্ষতা তো কোনো অবস্থাতেই রাজনৈতিক বিচক্ষণতার বিকল্প হতে পারে না । উপরন্তু মানবতাবর্জিত হলে অতি দক্ষ শাসনও শাসিতের অসন্তোষ প্রশমিত না করে তাকে তীব্রতর করে তোলে । পুরোনো শতাব্দী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে যে একটা নতুন মাত্রা সংযোজিত হচ্ছে সে বিষয়ে সচেতন হলেও[৪৯] তার মোকাবিলা করার উপায়টা কার্জনের জানা ছিল না । এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র, সততা এবং কর্মদক্ষতা বিষয়ে অতি হীন ধারণা নিয়েই কার্জন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন । তাই তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই ভ্রান্ত হয়েছিল । দম্ভ এবং উচ্চমন্যতা-মেশা তাঁর একটা চিঠির এই অংশটুকুতেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ‘নেটিভ’দের সম্পর্কে তিনি কী ধারণা পোষণ করতেন : “প্রায়ই আমার কাছে কোনও সুপরিচিত নেটিভকে সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদের সদস্য করার জন্য অনুরোধ আসে ; আমি কিন্তু এই গোটা মহাদেশে এমন একজন ভারতীয়েরও দেখা পাই নি যিনি ঐ পদ পাবার যোগ্য । সুতরাং আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন দুর্গের চাবিকাঠিটি ওদের হাতে তুলে-না-দিতে-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কোনও শাসকের পক্ষে এ দেশীয়দের সন্তুষ্ট এবং অনুগত রাখা কী কঠিন কাজ ।”[৫০] সন্দেহ নেই তাঁর প্রখর কর্তব্যবোধ এবং যোগ্যতা সম্পর্কে অতি উঁচু ধারণাই এমন লোকজনের নিয়োগে তাঁকে বাধা দিয়েছিল যাদের তিনি নিকৃষ্ট অথবা অপদার্থ বলে মনে করতেন এবং পুরো সৎ বলে কখনোই নয় ।[৫১] ভারতসচিব হ্যামিলটন এক সময়ে কংগ্রেসের তরুণতর, চরমপন্থায় বিশ্বাসীদের দুর্বল করার মানসে প্রবীণ নরমপন্থীদের সঙ্গে ‘ভাব’ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন । কিন্তু কার্জনের কংগ্রেস-বিরোধিতা ছিল আদ্যন্ত অটল । তা ছাড়া গোয়েন্দা-দপ্তরের রিপোর্ট তাঁর কাছে কংগ্রেসের অবধারিত এবং আসন্ন পতনের সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিল । তিনি লিখেছিলেন, “আমার বিশ্বাস কংগ্রেস টলমল করে

পড়ে যাচ্ছে, ভারতবর্ষে থাকাকালীন আমার সবচেয়ে বড়ো স্বপ্ন তার শান্তিপূর্ণ বিলুপ্তির কাজে হাত লাগানো।"[৫২]

কার্জন ছাড়া আর কেউ নরমপন্থীদের এমনভাবে বিপর্যস্ত করতে পারতেন না। ১৮৯৯ সালে আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জির আনা বিল বদলে কলকাতা কর্পোরেশনে 'নেটিভ' প্রতিনিধিদের সংখ্যা কমিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে শুধুমাত্র "আরও কর্মক্ষম ও বাগাড়ম্বর মুক্ত" করতেই চাননি,[৫৩] এই ব্যবস্থা গ্রহণের পিছনে শহরের ইংরেজ বাসিন্দাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর একটা দুরভিসন্ধিও ছিল। 'বাবু'দের সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে সাহেবরা যাতে কোণঠাসা না হয়ে পড়েন সে দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।[৫৪] এর ফলে কর্পোরেশনের নির্বাচিত (২৫টি ওয়ার্ড থেকে ২৫ জন) এবং মনোনীত সদস্যরা (২৫ জন) সমসংখ্যক হয়ে যান এবং চেয়ারম্যান সরকার-নিযুক্ত একজন সাহেব হওয়ায় শেষোক্তরা সব সময়েই নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারতেন। ভোটের অধিকার পেতে গেলে যে সম্পত্তির অধিকারী হতে হতো এবং যে উচ্চ কর দিতে হতো তাতে কুড়িজনের মধ্যে একজনের বেশী ভোট দিতে পারত না। এ ছাড়া ছিল একটা জেনারেল কমিটি, যার ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন মাত্র নির্বাচিত (২৫ জন ওয়ার্ড-সদস্য দ্বারা) হতে পারতেন। স্যর আশুতোষ মুখার্জি একই প্রতিষ্ঠানে কমিশনার, জেনারেল কমিটি ও চেয়ারম্যান—এই তিনটি পৃথক কর্তৃত্বের সহাবস্থানের মৌল নীতিটির সমালোচনা করেছিলেন। সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনার কাজ কমিশনারদের, চেয়ারম্যান বহন করবেন রূপায়নের দায়িত্ব আর এদের মধ্যে খাড়া থাকবে একটা জেনারেল কমিটি—এই ব্যবস্থার অবাস্তবতার প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তা ছাড়া যথেচ্ছ কর বসানোর রীতিটাকে তিনি অর্থনীতি-বিরোধী বলে নিন্দা করেছিলেন। হিন্দুরা দিত মোট পৌর করের ৫৯·৫%, মুসলমানরা ৫·৭% এবং ইউরোপীয়রা ১৮·৩%।

সে সময়ে অনেকেরই এ ধারণা হয়েছিল যে এই সমস্ত কূট কৌশলের দ্বারা কার্জন আসলে রিপন-প্রবর্তিত স্বায়ত্ত শাসনের বিবর্তনকে বিপরীতমুখী করতে চাইছেন।

প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কটূক্তি বর্ষণ করেই কার্জন শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর উগ্র ঘোষণা :"ঐ ব্যবস্থা পরিধিতে সঙ্কীর্ণ, উচ্চশ্রেণীতে সীমাবদ্ধ এবং অনিয়মিত। ধর্ম-নির্ভর এই শিক্ষা ব্যবস্থায় জাগতিক বিষয় সমূহের কোনও চিহ্নই ছিল না, এবং তত্ত্ব-সর্বস্ব হওয়ায় তার মধ্যে উপযোগিতার প্রশ্ন একেবারেই উপেক্ষিত।" অবশ্য এই একটা বিষয়ে অন্তত তাঁর উদ্দেশ্যের সততা ছিল প্রশ্নাতীত। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং রূঢ় অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও বিলেতী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা চলে না। তিনি লিখেছিলেন, "পরীক্ষা-পাশের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ায় ছাত্ররা জ্যামিতি, পদার্থ-বিদ্যা, বীজগণিত এবং লজিকের অর্ধ-উপলব্ধ জ্ঞানে মস্তিষ্ক পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে, মাঝ-পথে রণে ভঙ্গ দেয় শত-সহস্র ছাত্র এবং অবশেষে, বহু অগ্নি-পরীক্ষা-অন্তে ছাত্রদের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ বি· এ· ডিগ্রী লাভের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছয়।" 'শিক্ষার হের-ফের' এবং 'তোতা-কাহিনী'তে রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার মানের অবনমনে কার্জনের আশঙ্কা ছিল আন্তরিক। মাতৃভাষায় শিক্ষা-দানের গুরুত্ব তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন। আর ব্যবহারিক শিক্ষাদানের নামে এ দেশে যা শেখানো হয় তার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশেও তিনি সমর্থনযোগ্য। তাঁর মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাটবাজারে পরিণত, সেখানে যারা চীৎকার করে প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারে তাদের কোনও আগ্রহই নেই। বেসরকারী কলেজগুলোকে তিনি

কিছু লোকের অর্থাগমের উৎস ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেননি। আর, আইন-কলেজগুলি তো অসংখ্য বেকারের (এবং সে কারণে রাজদ্রোহী) লালন-ক্ষেত্র।[৫৫] কার্জনের এ ধরনের কথাবার্তায় নরমপন্থীরা হয়তো এত ক্ষুব্ধ হতেন না যদি সিমলায় আহুত শিক্ষা সম্মেলনে তাঁদের ঠাঁই দেওয়া হতো।[৫৬] সিমলা-সম্মেলনের দরজাটা শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারীদের কাছেই খোলা থাকায় নরমপন্থী নেতারা বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে বড়লাট শিক্ষাকে উন্নততর প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োগ-ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতেই বদ্ধপরিকর। তাঁর কাছে লক্ষ্যের থেকে ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, পরিণতির থেকে মূল্যবান পরিচালন-পদ্ধতি। ভুল বোঝাবুঝির এই আবহে এ দেশের মানুষের অবিশ্বাস আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, এবং কার্জন যখন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, "আমি এমন কিছু করতে চাই না যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারী দপ্তরে পরিণত হবে বা স্কুল-কলেজগুলি আমলাতন্ত্রের বিধানে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়বে"—তখন কেউই প্রায় তাঁর কথা বিশ্বাস করেনি। ইউনিভার্সিটি কমিশনে প্রথম দিকে একজন হিন্দু শিক্ষাব্রতীরও ঠাঁই না হওয়ায় নরমপন্থীদের উষ্মা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।[৫৭] কিন্তু কার্জনের শরীরের মতো তাঁর মনটাও সম্ভবত ইস্পাত-কঠিন একটা আবরণে ঢাকা ছিল, স্থিতিস্থাপকতার লেশমাত্রও সেখানে ছিল না। আত্মম্ভরিতার একটা দুর্গম দুর্গে বাস করার ফলে অন্যের আত্ম-সম্মান ও অনুভূতিতে শিশুর মতো নির্বিকার ভাবে আঘাত দিয়ে চলছিলেন তিনি। তাঁর একবারও মনে হয়নি আহতদের অনেকেই তাঁকে সাহায্য করতে আগ্রহী ছিলেন। এদেশের পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ক্রমাগত উপেক্ষা করে তিনি তাঁদের ক্ষীয়মান আনুগত্যেই আঘাত করছিলেন। তিনি একবারও এ চিন্তা করেননি যে এঁদের আনুগত্যই তখনো পর্যন্ত গোটা দেশটাকে অনেকাংশে ব্রিটিশরাজের প্রতি বিশ্বস্ত করে রেখেছিল।

কার্জন এখানেই থামেননি; হাত বাড়িয়েছিলেন ভারতীয়দের পকেটের দিকেও। র‍্যালে-কমিশন বাংলাদেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলির (এদের উপর ছিল ব্যক্তি-বিশেষের মালিকানা) অবলুপ্তির সুপারিশ করে। বেসরকারী কলেজে আইন-পড়ানোর বিরুদ্ধেও রায় দিয়েছিল এই কমিশন। ফলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতো লোকরাও (যাঁরা এর থেকে প্রচুর উপার্জন করতেন) আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তার উপর কলেজে পড়ার সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারিত করে দেওয়ায় মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের আশঙ্কা বেড়ে যায়। ছাত্র-মাহিনা-নির্ভর কলেজগুলির অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে ওঠে। আরও দুঃখের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটরদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে বেশ কিছু ভারতীয়দের মর্যাদা বৃদ্ধির পথটা রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। স্থির হয় যে এখন থেকে এম· এ· বা তদনুরূপ উচ্চ ডিগ্রীধারী নির্বাচনের অধিকার পাবেন; আজীবন নয়, পাঁচ বছরের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরা নিযুক্ত হবেন এবং অযোগ্যতার অজুহাতে চ্যান্সেলার নির্বাচন বাতিল করতে পারবেন। সেনেটের সম্মতি ছাড়াই শিক্ষা-দপ্তর নতুন বিধি-বিধান প্রবর্তনের অধিকার পায়। নতুন বিধানে সেনেটেও ইউরোপীয় সদস্যদের প্রাধান্য সুনিশ্চিত হয়ে যায়। শিক্ষা-দপ্তরের একটা সার্কিউলারে বলা হয়েছিল, "সন্দেহ নেই সরকারী প্রতিনিধি এবং বিভাগীয় স্বার্থসংরক্ষণের বিষয়টিকে প্রকাশ্যে অতিপ্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। তবু আমাদের নীতির সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াও তো কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে হতে পারে না।" সরকারী নীতির এই পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ জন ফেলোর মধ্যে ৯ জন পদাধিকারবলে অন্তর্ভুক্ত হতেন, ৭১ জন ছিলেন মনোনীত এবং মাত্র ২০ জন নির্বাচিত। আবার এই ৭১ জন মনোনীত সদস্যের মধ্যে ৪১ জন ইউরোপীয় এবং ৩০ জন ভারতীয়ের

মনোনয়নের বিধান প্রবর্তিত হয়। এভাবে ভাইসরয়ের হাতেই ৮০ জন ফেলোর (৭১ + ৯) মনোনয়নের অধিকার ন্যস্ত হয়। তা ছাড়া ৪৬ জন ভারতীয় সদস্যের বিরুদ্ধে ৫৪ জন শ্বেতাঙ্গ ফেলোর (৪১ মনোনীত + ৪ ফ্যাকাল্টি-নির্বাচিত + ৯ সরকারী কর্মচারী) সম্মিলিত শক্তি সক্রিয় রাখার ব্যবস্থাটাও পাকাপোক্ত করে ফেলা হয়েছিল। স্যাড্‌লার কমিশনের এই মন্তব্যটা অযৌক্তিক ছিল না যে, "নতুন বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায়তনে পরিণত হয়েছে।" স্বীকৃতিদান (affiliation) বা তা প্রত্যাহারের যে বিপুল ক্ষমতা সিণ্ডিকেটের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তার দ্বারা সরকার "আমলাদের বিচারে রাজদ্রোহী-হিসেবে চিহ্নিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভাগ্য অনায়াসে এবং এককভাবে নির্ধারণ করার ক্ষমতা পেয়েছে।" মোট কথা শিক্ষাদানের ভার দেওয়া হল ভারতীয়দের আর নিয়ন্ত্রণের ভার ইউরোপীয়দের।

ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কর্পোরেশন এবং বিশ্ববিদ্যালযের উপর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। অধিকাংশ উঁচু এবং দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয় ছাত্রদেব আয়ত্তাতীত তখন আইন ব্যবস্থাকে জীবিকা হিসেবে বেছে নেওয়ার সুযোগ থেকেও কি তারা বঞ্চিত হবে ? কৃষি উৎপাদন থেকে মানুষের আয় যখন ক্রমক্ষীয়মান সে সময় কলেজে পড়ার বেতন বৃদ্ধি করে এ দেশের স্বল্পবিত্ত ঘরের ছেলেদের কেরানিগিরি বা স্কুল মাষ্টারের বৃত্তি গ্রহণের পথটাও বন্ধ করে দেওয়া কীভাবে মেনে নেওয়া যায় ? কমিশনের রিপোর্টে উকিলদের প্রতি বিরাগ গোপন ছিল না, আর কার্জন যে তাঁর আমলাদের মতোই উকিলদের নীচু নজবে দেখতেন তা কারোই অজানা ছিল না। কিন্তু নরমপন্থীদের অনেকেই পেশায় আইনজীবী হওয়ায় তাঁদের বিক্ষোভ প্রায় গিল্ড-সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের চেহারা নিয়েছিল। স্যর গুরুদাস ব্যানার্জির মতো মৃদু-স্বভাবের মানুষও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করার এই সরকারী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেননি। উত্তরে কার্জন মন্তব্য করেছিলেন, "দরিদ্রতর ও অযোগ্যতর বাঙালী ছাত্র, যাদের আমরা রাজনৈতিক দিক থেকে চেপে রাখতে চাই, গুরুদাস কিনা তাদের হয়ে সওয়াল করছেন।"[৫৯] কলকাতার টাউন-হলে সুরেন্দ্রনাথ আহূত এক জনসভায় জোরালো-ভাষায় লেখা এক স্মারক-লিপি গৃহীত হয়। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর (বেসরকারী) কলেজগুলির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তর সদয় হয় এবং সুরেন্দ্রনাথের কলেজে (তখনকার রিপন কলেজ) আইন পড়ানোর সম্মতি মেলে (যদিও অন্যান্য কলেজে তা রহিত করে দেওয়া হয়)। পরিষদে স্যর আশুতোষ এবং গোখ্‌লে বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন। সরকার 'র‍্যলে বিলটি' একটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার উদ্যোগ করলে গোখলে তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, "এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে এই ব্যবস্থা নেওয়ার প্রথম ও অবধারিত ফল হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অতিবৃদ্ধি ও শিক্ষায়তনগুলির পুরোপুরি সরকারী দপ্তরে রূপান্তরণ।" সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে তাঁর প্রতিবাদ তিনি নথিবদ্ধ করে রাখেন এবং র‍্যলে রিপোর্টটি পুনর্বিবেচনার জন্য পেশ করলে তিনি বলেন, "এ কথা ভাবলে আমি গভীর বেদনা অনুভব করি যে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এ দেশে উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পর সরকার (এখন) এমন এক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যত যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় আরো বেশী সংখ্যায় শিক্ষিত ভারতীয়কে সংযুক্ত করার বদলে এতাবৎকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যেটুকু সংযোগ তাঁদের ছিল সেটুকুও লোপ করে দেবেন।"[৬০]

বুদ্ধিজীবীদের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে স্বভাবসুলভ রীতিতেই কার্জন তাঁর মনোভাব

প্রকাশ করেছিলেন : "ঘর্মাক্ত-কলেবর, বাক্যবাগীশ গ্রাজুয়েটদের ভীড়ে উপচে পড়ছে টাউন হল আর সিনেট হল, আর সেখানে তুমুল চীৎকার করে ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষার সর্বনাশের হোতা বলে আমাদের ধিকৃত করা হয়েছে।" দুর্ভাগ্য এটাই যে একটা অভিজাত-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানকে সাধারণ মানুষের আয়ত্তে আনার জন্য এ দেশের প্রগতিশীল ও রাজনৈতিক উচ্চাশা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বাঙালীদের ব্যাকুলতা কার্জন উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁর এই সহানুভূতির অভাব তাঁকে নরমপন্থীদের পথের-কাঁটা করে তুলেছিল। এখন আবার, নতুন করে তিনি তাঁদের জনসমক্ষে হেয় করে তুললেন এবং ব্রিটিশ সুশাসন ও সুবিচারের প্রতি তাঁদের বীতশ্রদ্ধ করে পরোক্ষভাবে চরমপন্থীদের যুদ্ধে নামবার সুযোগ করে দিলেন। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পত্তনের যে পরিকল্পনাটা এতদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অল্প কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছিল সেটাই সর্বজন-প্রিয় হবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল।[১১]

১৮৭৮-এর 'ভার্নাকুলর প্রেস অ্যাক্ট' লীটনকে যতটা নিন্দাভাজন করে দিয়েছিল, ১৯০৪ সালে 'ইন্ডিয়ান অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যামেণ্ডমেন্ট অ্যাক্ট' পাশ করে তার থেকেও বেশী অপযশ কুড়িয়েছিলেন কার্জন। ১৮৮৯ খ্রীঃ ল্যান্সডাউন-প্রবর্তিত সামরিক ও নৌবাহিনী সংক্রান্ত আইনের ধারাগুলি কার্জন বেসামরিক ব্যাপারেও প্রয়োগের ব্যবস্থা করলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং চরমপন্থার সমর্থক হিসেবে পরিচিত মতিলাল ঘোষ লিখেছিলেন যে কার্জনের এই সংশোধনী আইনের ফলে সরকারী কর্মচারীদের ভুলভ্রান্তি ও অন্যায় অবিচারগুলিই শুধুমাত্র জনসাধারণের সমালোচনার বাইরে চলে যাবে না, তা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও হরণ কববে। এই আইনের আওতা থেকে ভারতীয় সাংবাদিকদের রেহাই দেবার আবেদন যথারীতি বিফলে গিয়েছিল। (সাংবাদিকদের এই অধিকার ইংলণ্ডে আইন-অনুমোদিতই ছিল)। আর এরই প্রতিক্রিয়ায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি সরকারী বিধানের বিরোধিতায় মুখর হয়ে উঠল। নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় প্রচারের একটা সোচ্চার মাধ্যম কার্জন চরমপন্থীদের হাতে তুলে দিলেন।

বিশ শতকের শুরুতে মোহভঙ্গের বেদনা যখন নরমপন্থীদের নিরুদ্যম করে তাঁদের সংহতি প্রায় নষ্ট করে দিচ্ছিল, তখনই ১৯০৪-০৫ সালের যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের অবিশ্বাস্য জয় সমস্ত এশিয়া জুড়ে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। দাদাভাই নৌরজীর মতো মানুষের কণ্ঠেও বেশ কিছুটা উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনকে খোলাখুলিভাবে 'অসৎ, প্রতারক এবং সর্বনাশা' আখ্যা দেওয়া হলো। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতির জন্য পর্যায়ক্রমে হ্যামিলটন এবং কার্জনের উপর দোষারোপ এখন আর কোনও বিশেষ মহলে সীমাবদ্ধ রইল না। 'জন্মগত' ও 'প্রতিশ্রুত' ব্রিটিশ নাগরিকত্ব এবং স্বশাসিত হবার অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে ভারতবাসীকে নিয়ত সংগ্রাম করার জন্য এতাবৎকালের অস্ফুট আহ্বান অকস্মাৎ যেন তুমুল কলরোলে পরিণত হলো।[১২] ইউনিভার্সিটি বিল, অফিসিয়াল সিক্রেটস্ বিল. এবং লক্ষ লক্ষ নিরন্ন, অনটন-ক্লিষ্ট মানুষের দেশে দিল্লী-দরবারের মতো 'ব্যয়-বহুল তামাশা'র প্রকাশ্য সমালোচনা শোনা গেল ১৯০৩ সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি লালমোহন ঘোষের কণ্ঠে। বোম্বাই অধিবেশনের সভাপতি স্যর হেনরী কটন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য সম্বলিত একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টির দাবী তুললেন যা অন্যান্য স্বশাসিত উপনিবেশগুলির সঙ্গে একযোগে ব্রিটেনের রক্ষণাবেক্ষণে স্থাপিত হবে। এর উত্তরে ব্যঙ্গ-বিকৃত কণ্ঠে কার্জন বলেছিলেন, "অবাক হবার কিছু নেই যে মোটামুটিভাবে প্রকৃতিস্থ বলে পরিচিত, কটনের মতো একজন

মানুষ তাঁর শ্রোতৃবর্গকে এভাবে ধাপ্পাবাজিতে বিভ্রান্ত করবেন।"[৬৩] কটনের শ্রোতৃবর্গ কিন্তু পুরোপুরি বোকা বনেননি। ইতিমধ্যে তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থীরা মহারাষ্ট্রে ভালভাবেই সংগঠিত হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৯৯ সালেই ওয়াচা তাঁকে 'গোলমেলে' আখ্যা দিয়েছিলেন।[৬৪] তাঁর কথাবার্তার ঝাঁঝটা এত বাড়ে যে দাদাভাই মৃদু ভর্ৎসনা করতে বাধ্য হন। তিলককে তিনি লিখেছিলেন: "আমি শুনলাম তোমার লেখাগুলি কংগ্রেসকে তার গরিমাময় আসন থেকে বিচ্যুৎ করতে উদ্যত। কিন্তু এই সংগঠন যদি একবার ঘা খায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে তা হলে তার নিরাময় সহজে হবে না। আর এই সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অর্থ—সারা দেশের সর্বনাশ এবং ইঙ্গ-ভারতীয়দের জয়।"[৬৫] ফিরোজ শা মেহ্‌তার জীবনীকার এইচ· পি· মোদী তিলকের নেতৃত্বাধীন এক বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন যাঁরা 'সাবজেক্টস্ কমিটিকে' বাধ্য করেছেন কংগ্রেসের জন্য বহু-বিলম্বিত কিন্তু অতিপ্রয়োজনীয় একটি সংবিধান রচনায়। ভারতীয় রাজনীতির আকাশে কংগ্রেসের মধ্যে, ছোট হলেও, এই কালো মেঘটাকে কার্জন উপেক্ষা করেছিলেন। তাই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই সময়েই তিনি মহা-উৎসাহী হয়ে ওঠেন। কার্জনের এই উদ্যোগই চরমপন্থীদের একটা জাতীয় দলে পরিণত হবার সুযোগ এনে দেয়। 'আন্-ব্রিটিশ' শাসন নয়, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেই এঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হলেন: ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন নয়, 'স্বরাজ' হয়ে উঠলো এঁদের অনন্য লক্ষ্য। এই সময়ে বাইরে থেকেও একটা প্রবল প্রেরণা ভারতবর্ষকে স্পর্শ করেছিল। অক্টোবর মাসে বিক্ষোভ-ধর্মঘটে উত্তাল রাশিয়াতে ১৯০৫ সালের বিপ্লব ঘটে যায়। এর আঘাতে জারতন্ত্রের আপাত-দুর্ভেদ্য শক্তির দুর্গটা টলমল করে ওঠে। সন্ত্রস্ত জার ৩০শে অক্টোবর 'ডুমা' গঠন, সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতিদান ও সংবিধান প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষেও সাবালক কংগ্রেসের (ঠিক একুশ বছর বয়সী) মুখে আধোআধো বুলিতে স্বায়ত্ত শাসনের বায়না অথবা নাকি সুরে আবেদন-নিবেদনের পালা নিতান্তই বেমানান হয়ে উঠেছিল। ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষের নবজন্ম হয়েছিল তার মহিমান্বিত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে। এখন তেজোদৃপ্ত তারুণ্যের বলিষ্ঠ কণ্ঠে সে তার জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতার দাবী করল।

(২)

একটি মতবাদের সংহতি-সাধনা

চরমপন্থা জীবনের প্রতি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে বিচার্য বলেই তার জন্ম-লগ্নটাকে সুনিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। সন্দেহ নেই, উনিশ শতকের শেষ দশকের প্রথম দিকে, অস্ফুট হলেও, তার আগমন-ধ্বনি শোনা গিয়েছিল।[৬৬] নারী শিক্ষা (১৮৮৪-৮৯), রখমবাঈ বিবাহ (১৮৮৭), বাইরের কাজ নেবার ব্যাপারে ডেকান এডুকেশন সোসাইটি ত্যাগ (১৮৯০) এবং সহবাসে সম্মতিদানের বয়স নির্ধারণ নিয়ে (১৮৮৭-৯১) তিলকের সঙ্গে সুধারক (সংস্কারক)দের মত-বিরোধ হয়; গণপতি উৎসবের সূচনা ১৮৯৩ খ্রীঃ, এবং ১৮৯৩/৯৪-এর মধ্যেই 'ইন্দুপ্রকাশে' অরবিন্দের রচনা 'New Lamps for Old'

আত্মপ্রকাশ করে। এই সব ঘটনা ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে আসন্ন পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছিল তাই অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৮৯৫ খ্রীঃ 'সোশ্যাল কনফারেন্সে'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মধ্যে।[৬৭] ঐ বছরই নরমপন্থীরা 'পুণা সর্ব-জনিক সভা'র নিয়ন্ত্রণাধিকার হারান। শিবাজী উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠানের তারিখ ১৫ই এপ্রিল, ১৮৯৬। আর ৪ঠা নভেম্বর, ১৮৯৬ সালে 'ডেকান সভা' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্রে নরম ও চরমপন্থীদের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হলো। বিপিনচন্দ্র পাল অবশ্য তখনো নরমপন্থীদের সঙ্গেই ছিলেন। ১৮৯৭-তেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন : "আমি ব্রিটিশরাজের প্রতি অনুগত, কেন না আমার স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আনুগত্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে অভিন্ন ; তাছাড়া, আমি বিশ্বাস করি বিধাতা আমাদের উপর এই সরকার স্থাপন করেছেন আমাদেরই মুক্তির জন্য।"[৬৮] এই ধরনের মত প্রকাশের পাঁচ বছর পরে, ১৯০২ সালেই তিনিই লিখেছিলেন, "এই দেশে ও লণ্ডনে কংগ্রেস ও তার ব্রিটিশ কমিটি—দুই-ই বেহায়া ভিক্ষুকদের প্রতিষ্ঠান।"[৬৯] ১৮৯০ সালে বাংলাদেশের নিরুদ্ধ অনুভূতি কোনও রাজনীতিক নয়, একজন কবির কণ্ঠেই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। 'সাধনা'য় প্রকাশিত (১৮৯৩-৯৪) রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় আমলাতন্ত্রের হৃদয়হীন ঔদাসীন্য এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল। এই লেখাগুলির মধ্যেই শুনি নরমপন্থীদের দীনতার বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মের দৃপ্ত প্রতিবাদ। সন্দেহ নেই, নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের মানসলোক থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তবে তিনি যে ভাবে এটিকে প্রকাশ করেছিলেন তার থেকে সমসাময়িককালের বিক্ষোভ-মথিত অস্থির পরিস্থিতির একটা ছবি পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনাগুলি অহিফেন-সেবী কমলাকান্তের মুখ থেকে নিঃসৃত—যে কমলাকান্ত কখনো পরিহাস-প্রবণ, কখনো-বা স্পষ্টত ঐকান্তিক ; রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধগুলি কিন্তু যথোচিত গম্ভীর এবং অসামান্য অন্তর্দৃষ্টির স্পর্শে উজ্জ্বল। তারা পাঠককে সরাসরি সমস্যাগুলির মূলে পৌঁছে দেয়।[৭০] এ সময়ে কংগ্রেসের কাজকর্মের প্রতি লাজপৎ রায়ের অসন্তোষও গোপন থাকেনি। "১৮৯৩ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে আমি কংগ্রেসের কোনও অধিবেশনে যোগ দিইনি"—তাঁর এই স্বীকৃতির মধ্যে এই অভিযোগও জড়িয়ে আছে যে "কংগ্রেস নেতৃবর্গ দেশের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষায় আত্ম-নিয়োগের বদলে আপন আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোতেই বেশী মনোযোগী।"[৭১] মামুলি বাক্যবিন্যাসে পটু, শূন্যগর্ভ ভাষণদানে দক্ষ সখের দেশপ্রেমিকদের প্রতি এই রাশভারী আর্য-সমাজীর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না।

কেমব্রিজ গোষ্ঠীর মতে চরমপন্থী মতাদর্শ ছিল আঞ্চলিক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিলকের জাতীয়তাবাদ মহারাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে ভারতীয় হয়ে উঠতে পারেনি, অথবা অরবিন্দের দৃষ্টি বাংলার সীমান্তেই আটকে ছিল। প্রকৃত তথ্যটা হচ্ছে এই যে ঐ সময় মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া তিলকের পক্ষে কোনও বিষয় সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব ছিল না। এমন কি আপন প্রদেশের কোনও কুসংস্কারের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েও তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়নি। তিলকের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলায় মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য কী ভূমিকা নিয়েছিল তা তাঁরই রচনায় স্পষ্ট। কিশোর বয়সে তাঁর স্মৃতি-পটে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের (১৮৪৬-৮৩) কথা, যিনি এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ; তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করতো পুণা সর্বজনিক সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গণেশবাসুদেব যোশীর (১৮২৮-৮০) কাহিনী যাঁর কাছে স্বদেশীই ছিল জীবনের অদ্বিতীয় আদর্শ। তিনি কখনো ভুলতে পারেননি বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলোঙ্করের নিবন্ধগুলি যার মধ্যে ফুটে উঠেছিল বিদেশী

শাসনের বিরুদ্ধে নৈতিক ক্রোধ। অনুরূপ কারণে অরবিন্দও বারবার স্মরণ করতেন বঙ্কিমচন্দ্রকে, এবং কিছু পরে, বিবেকানন্দকে। প্রাদেশিক রাজনীতিতে তিলক, স্বাভাবিক কারণে, রানাডে এবং আগারকর, ফিরোজ শা মেহ্‌তা এবং গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেজন্য রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে তাঁকে মহারাষ্ট্রের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে আত্মনিয়োগ করতে দেখা গিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে সে ঐতিহ্য মহারাষ্ট্রের মানুষের কাছে বোধগম্য করে তুলতে হবে তাদেরই বোধগম্য ভাষায়।[১২] অনুরূপভাবে বাংলায় 'বোনার্জি, ব্যানার্জি এবং লালমোহন ঘোষ'দের প্রতিপক্ষ হিসেবেই অরবিন্দকে রাজনীতির আসরে প্রবেশ করতে হয়েছিল। বাঙালীর হৃদয়ানুভূতি, তার প্রবণতার সঙ্গে সুর মিলিয়েই তিনি নিজের আদর্শ প্রচার করেছিলেন।[১৩]

এ দেশের দুর্ভাগ্য যে সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় সমাজকে যে সমস্ত কারণ অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দিয়েছিল সেগুলি যথাযথভাবে অনুধাবন করেননি চরমপন্থীরা। হয়তো তাঁদের অবকাশ বা ধৈর্যের অভাবই এ জন্য দায়ী। তাঁদের বিচারে শুধুমাত্র বিদেশী শাসনই ছিল স্বদেশের যাবতীয় আর্থিক সামাজিক দুর্দশার হেতু, কার্জনের পরিকল্পনাগুলোকেই তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনচিত্ত বিদ্বিষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করেছিলেন, আর, কংগ্রেস-অবলম্বিত মেরুদণ্ডহীন নীতিগুলিই নরমপন্থী জাতীয়তাবাদের চরম ব্যর্থতা প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত বলে ভেবেছিলেন।

চরমপন্থীদের এ জাতীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে অতিসরলীকরণের অভিযোগ আনা চলে। তাঁদের এই সীমাবদ্ধতা ও আত্মশ্লাঘার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সতর্কতাবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় সমস্ত দেশ জুড়ে সংগঠন গড়তে চরমপন্থার মূল আদর্শগুলি সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য এবং গ্রাহ্য করে তোলাটা ছিল জরুরী। পশ্চিমী সভ্যতার অঙ্কে যে জাতীয়তাবাদ লালিত হয়েছিল, তাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত করতে হিন্দু ধর্মের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই বলে তাঁদের মনে হয়েছিল। এদেশের মানুষ চিরকাল একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে তাদের সাধারণ ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন থেকেছে। এই সচেতনতাকে সক্রিয়তার স্তরে উত্তীর্ণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল হিন্দু ধ্যান-ধারণাগুলির পুনরুজ্জীবন। এই হিন্দুত্ববোধকে সমস্ত রকমের প্রচেষ্টার ভিত্তি করতে পারলে জনসাধারণের জাতীয় চেতনাও জাগ্রত হবে ; তাঁরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্বুদ্ধ হবেন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের আদর্শে। তিলক লিখেছিলেন : "হিন্দুত্বই ভারতীয় সমাজের সামান্য ধর্ম। আমরা অহরহ বলে থাকি—পঞ্জাব, বাংলা, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা এবং দ্রাবিড়ের হিন্দুরা অভিন্ন এবং এই ঐক্য বন্ধনের একমাত্র মূল সূত্র হিন্দুধর্ম।"[১৪] তিলকের এই অভিমতকে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি বলে মনে করা যেতে পারে। বিবেকানন্দও একদা লিখেছিলেন : "আমরা সকলে যে ঐক্য বন্ধনে বিধৃত তা রচনা করেছে আমাদের পূত ঐতিহ্য—আমাদের ধর্ম। এইটেই আমাদের একমাত্র বনিয়াদ এবং আমরা যা কিছু সৃষ্টি করবো তা এরই উপরে। ইউরোপে জাতীয় ঐক্য রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন, কিন্তু এশিয়ার দেশগুলিতে ধর্মীয় চেতনাই জাতীয় সংহতির রূপ নেয়।"[১৫] ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বিপিনচন্দ্রের পক্ষে অবশ্য হিন্দু জাতীয়তাবাদের এই ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না, সেই জন্য তিনি নতুন একটা শব্দ—'সমন্বয়ী দেশপ্রেম' ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। বহু সম্প্রদায়, বিচিত্র সংস্কৃতি এবং অসংখ্য ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে গড়ে ওঠা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা এই শব্দটিতেই প্রকাশ পাবে বলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল। অবশ্য

বিপিনচন্দ্রকেও স্বীকার করতে হয়েছিল, যে হিন্দুত্বই এই জাতীয়তাবাদের আদি এবং প্রধান উপাদান।[৭৬] কলেজে ছাত্রাবস্থায় লাজপৎ রায় যে দুজন আর্য সমাজীর প্রভাবাধীনে এসেছিলেন তাঁরা হলেন—গুরু দত্ত এবং হংসরাজ। তিনি স্বয়ং লিখেছেন, "এরই ফলে আমার দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশ জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উঠতে থাকে। শৈশবে ইসলামী ভাবধারায় এবং কৈশোরে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে উদ্বেলিত আমার চিত্ত (এর পর থেকে) প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। আশীর দশকের শেষের দিকে হিন্দী এবং উর্দু ভাষাকে কেন্দ্র করে যে বাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া আমার হিন্দু জাতীয়তাবাদের দীক্ষা নেওয়াকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে, আমার চিন্তাধারা দিক পাল্টায় এবং তদবধি তা অপরিবর্তিত হয়েই আছে।" ১৮৮২ সালে লাজপৎ আর্য-সমাজভুক্ত হন, হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর অচ্ছেদ্য বন্ধন। তিনি লিখেছেন, "ঐ দুই বছরে (১৮৮০-৮২) আমি প্রাচীন আর্য সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পূজারীতে পরিণত হই, এবং তাই হয়ে উঠেছে আমার জীবনের ধ্রুবতারা।"[৭৭] ইতিমধ্যে আর্য সমাজ পুরোপুরি ভাবে রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের আওতায় এসে মুসলমান ও অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর অ-হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটা ধর্মীয়-রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধন সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। শুদ্ধি আন্দোলনের পুরোধা রূপে লাজপতের ভূমিকাও এ সময়ে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। অনাথ হিন্দু শিশুরা যাতে খ্রীস্টান মিশনারীদের হাতে না পড়ে সে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। মুন্‌সীরাম কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আর্য সমাজের আদর্শগুলি বিকৃত করার অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁর বক্তব্য : "বেদে বিধৃত সত্য সমস্ত বিশ্বের জন্য, লাজপৎ এবং অন্যান্য ডি· এ· ভি· নেতারা এই সর্বজনীন আন্দোলনকে আঞ্চলিকতা ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের মধ্যে আবদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন।"[৭৮]

ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বিবেকানন্দের নব্যহিন্দুধর্মকে একদা 'নারকীয় ভ্রান্তি' বলে বর্ণনা করেছিলেন,[৭৯] এবং পোপ ত্রয়োদশ লিওকে বন্দনা করেছিলেন তাঁর কালের 'শ্রেষ্ঠ মানব' রূপে।[৮০] কিন্তু বেদান্তের অমোঘ প্রভাবে[৮১] একজন উৎসাহী হিন্দুধর্ম প্রচারকে রূপান্তরিত হতে তাঁরও বেশী দেরী হয়নি।[৮২] ব্রহ্মবান্ধবের রাজনৈতিক জীবনের দিক্-পরিবর্তন ছিল আরও বিস্ময়কর। ১৯০০ খ্রীঃ তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের বুদ্ধি এবং বিশ্বাস ইংরেজ রাজত্বকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মহান ইচ্ছার অভিব্যক্তি রূপে বিচার করতে বাধ্য করে। কিন্তু হিন্দু ধ্যান-ধারণার উপর পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব বিস্তারের যে অপপ্রয়াস তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আমরা সমর্থক।"[৮৩] ১৯০১ সালের শেষেও ইংরেজ শাসনকে তিনি নিপীড়িত মানুষের জীবনে পরম করুণাময়ের আশীর্বাদ হিসেবেই গণ্য করেছেন।[৮৪] কিন্তু ইউরোপীয় জীবনাদর্শের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে তিনি ফিরিঙ্গীদের রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী-তে একটি অতিসরল, রাজভক্ত হৃদয়ের স্বাক্ষর যিনি রেখেছিলেন 'সন্ধ্যা'য় (১৯০৪ সালের ডিসেম্বরে প্রথম প্রকাশিত) তাঁরই লেখনী ইংরেজ রাজত্বের উপর অনল বর্ষণ করতে থাকে। মাঝের ক'টা বছর তাঁকে কার্জন-রাজত্বের দুঃসহ-দহন পার হয়ে আসতে হয়েছিল।[৮৫]

ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিয়েই স্বদেশে ফেরেন অরবিন্দ। ঐ মহাদেশের বিশেষ বিশেষ দেশের প্রতি তাঁর অনুরক্তি কয়েকটি লেখাতেও ফুটে উঠেছে। "ইউরোপের কোনও দেশকে যদি দ্বিতীয় স্বদেশ জ্ঞানে ভালবাসতে হয়, না দেখে, সেখানে বসবাস না করেও, আত্মিক এবং ভাবানুভূতির প্রেরণায় তার প্রতি আকৃষ্ট হতে হয়, তবে সে

দেশ ইংলণ্ড নয়, ফ্রান্স।”[৮৬] নানা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিবৃত্ত—যেমন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মধ্যযুগীয় ফ্রান্সের সংগ্রাম, আমেরিকা ও ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধ, আয়ারল্যাণ্ডের হোমরুল আন্দোলন তিনি গভীর আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন। এদের নেতৃবর্গের, বিশেষ করে জোন দ্যার্ক, ম্যাৎসিনী ও পারনেলের জীবনেতিহাস তাঁর কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল।[৮৭] 'ইন্দু-প্রকাশে'র জন্য রচিত 'নিউ ল্যাম্পস্ ফর ওল্ড' (১৮৯৩-৯৪)-এর ছত্রে ছত্রে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব বিকীরিত হয়েছে। স্বদেশে নরমপন্থীদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক মহৎ দৃষ্টান্তগুলিকেও তিনি উপেক্ষা করেন। দাঁত এবং রোবসপীয়েরের তুলনায় সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের নায়ক পিম্ অথবা হ্যাম্প্ডেন তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর লেখায় উচ্ছ্বসিত উল্লেখ আছে ফ্রান্সের অগণিত, নির্যাতিত সর্বহারার যাঁরা রক্তস্নাত ও অগ্নিশুদ্ধ হয়ে “ভয়ঙ্কর পাঁচটি বছরের মধ্যে তেরশ বছরের পুঞ্জীভূত নিপীড়ন ও অবিচার নিঃশেষে মুছে দিতে পেরেছিলেন।” রোমান্টিক ভাবধারায় সুরভিত তাঁর রচনা মাঝে মাঝেই ফরাসী জাতীয়তাবাদী মিশলের লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য ওঁদের মধ্যে পার্থক্যও ছিল। মিশলে ব্যবহার করেছেন 'জনগণ' শব্দটি, আর অরবিন্দের পক্ষপাত ছিল সদ্য-জনপ্রিয়-হয়ে-ওঠা 'সর্বহারা' শব্দটির প্রতি। 'ঘটনা-প্রবাহের ভাগ্য নির্ধারক' এই সর্বহারাদের অবহেলা করে আইন পরিষদে অধিকসংখ্যায় নির্বাচন এবং যুগপৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা (যেটি তিনি উপেক্ষা করেছিলেন শুধুমাত্র অশ্বারোহণে আপত্তি জানিয়ে) ইত্যাদি ক্ষণস্থায়ী, অসার বস্তুর জন্য লালায়িত হওয়ায় তিনি মেহতা ও অন্যান্য নরমপন্থীদের নিন্দা করেছিলেন। নিজের দূরদৃষ্টির সাহায্যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আদিগন্ত প্রসারিত জলরাশির গভীরে মহা আলোড়ন শুরু হয়েছে, যে কোনও মুহূর্তে সর্বপ্লাবী বন্যার আবির্ভাব ঘটতে পারে। উদ্বেল এই জন-সমুদ্রকে পরিচালিত করার জন্য এবং পরিশেষে ভবিষ্যতের কাণ্ডারী হয়ে ওঠার জন্য এ দেশেও কি নেপোলিয়নের মতো কোনও এক ত্রাতা গণআন্দোলনের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-শিখরে আবির্ভূত হবেন?[৮৮]

চোদ্দ বছর বয়স (১৮৮৬) থেকে অরবিন্দ যে স্বাধীনতার জন্য আকণ্ঠ তৃষ্ণা অনুভব করতে থাকেন, আঠারোয় পৌঁছনোর (১৮৯০) মধ্যেই তা তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে অধিকার করে।[৮৯] ঐ সময়েই তাঁর এ প্রত্যয় দৃঢ় হয়ে ওঠে যে বিপ্লবের মধ্য দিয়েই মুক্তি অর্জন করতে হবে। “আমাদের ভীরুতা, দুর্বলতা, স্বার্থমগ্নতা, কপটতা এবং অন্ধ ভাবপ্রবণতা” যা মূর্ত হয়ে উঠেছে 'বোনার্জি এবং ব্যানার্জি'র বিজাতীয় ('আন্-ন্যাশানাল') কংগ্রেসের মধ্যে, যাকে প্রকট হতে দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ডের দাসানুদাসে পরিণত একটা প্রজন্মের মধ্যে—তার দ্বারা যে প্রার্থিত স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ইংলণ্ডে থাকার সময় তিনি 'Lotus and Dagger' নামক গুপ্ত সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যখন তিনি বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ রূপে ভারতে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন, তখন জনৈক ঠাকুর সাহেবের (উদয়পুরের এক অভিজাত পুরুষ) উপর সারা পশ্চিম ভারতে বৈপ্লবিক সংগঠন ও কার্য-কলাপের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ঠাকুর সাহেব সেনাবাহিনীকেই তাঁর কর্ম-ক্ষেত্র নির্বাচিত করেছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় অরবিন্দ প্রথমে যোগ দেন বোম্বাইয়ের এক বিপ্লবী সংগঠনে। অনতিকাল পরে মধ্যভারতে উপস্থিত হয়ে সে অঞ্চলে মোতায়েন সামরিক বাহিনীর এক রেজিমেন্টের সাধারণ সেনা ও অধঃস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। ১৯০২ সালে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে বাংলায় সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচারে ব্রতী হতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে।[৯০]

এই সময়েই 'অনুশীলন সমিতি'র কর্ণধার পি· মিত্রের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন অরবিন্দের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে'র কিছু ছাত্র এই বিপ্লবী সংস্থাটির সদস্য ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডির জীবনীকার যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণের চিন্তাধারায় এঁদের অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির নামের মধ্যেই বিধৃত ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের প্রভাব। বাংলা এবং বরোদার মেল-বন্ধন এ ভাবেই রচিত হয় ; এবং ১৯০২ সালে বাংলায় উপস্থিত হয়ে অরবিন্দ হেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন বসু এবং মেদিনীপুরের আরও কয়েকজন তরুণকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। বোম্বাইতে ১৯শে জানুয়ারী ১৯০৮ সালে প্রদত্ত অরবিন্দের একটি বক্তৃতায় ('দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন') এই গোপন তৎপরতার উল্লেখ ছিল। ১৯০৩-এ সারা বছর ধরে সখারাম গণেশ দেউস্কর, পি· মিত্র এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নানা তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সদস্যদের শিক্ষাদান-পর্ব চলে।[১১] বলা বাহুল্য ফরাসী বিপ্লব এবং ইতালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেই এঁরা আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ সময়ে 'অনুশীলন সমিতি'তে অরবিন্দের অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের যোগদানের ফলে দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৯০৪ সালে অরবিন্দ আবার বাংলায় আসেন এবং নেতৃত্বের ব্যাপারে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বারীন্দ্রকে সমর্থন করেন।[১২] অরবিন্দ অবশ্য স্বাভাবিক কারণে এ সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। তাঁর লেখা চিঠি থেকে এই তথ্যটুকুই জানা যায় যে তিনি এ সময়ে 'সদ্যোসৃষ্ট কিছু বিপ্লবী সংগঠনে'র খোঁজ পেয়েছিলেন যেগুলি সবই ছিল বিচ্ছিন্ন। বঙ্গদেশ সামগ্রিকভাবে এ-জাতীয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে নির্লিপ্ত ছিল, আর সেটা অনুভব করেই হয়তো অরবিন্দ দৃষ্টির অন্তরালে থেকেই সক্রিয় হতে চেয়েছিলেন। তাঁর এ উপলব্ধিও হয়েছিল যে "সন্ত্রাসই যথেষ্ট নয় যদি না তার পিছনে ব্যাপক জন-জাগরণ থাকে। সাধারণ মানুষের এই জাগরণই তো দেশপ্রেমকে সর্বপ্লাবী করে তুলবে।" কার্জন-পরিকল্পিত বঙ্গ-ভঙ্গই সেই প্রার্থিত গণআন্দোলনের সূচনা করে দিয়েছিল। ১৯০৬ সালে তিনি পাকাপাকিভাবে বাংলায় আসেন। বারুইপুরে একটা বক্তৃতায় অরবিন্দ বলেছিলেন, "নির্যাতন এবং দুঃখ-বরণের মধ্য দিয়েই মায়ার অপসারণ হয়। কার্জন প্রবর্তিত বঙ্গ-বিচ্ছেদ জন-মানসে যে বেদনার সৃষ্টি করেছে তা-ই সেই মায়ার বিলুপ্তি ঘটাবে।" উত্তরপাড়ায় তিনি বলেছিলেন, "স্বদেশীর বহু প্রত্যাশিত আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য রাজনীতিতে আমার অংশগ্রহণ অনিবার্য হয়ে উঠেছে।"

এতদিন অরবিন্দের সাধনা ছিল হিন্দুধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব-রহিত। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত রোবসপীয়ের, ম্যাৎসিনী এবং পারনেলই তাঁর মানসলোকে দীপ্যপান ছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে ধীর, সুনিশ্চিতভাবে তাঁর মনোজগতে সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য তার ছায়া ফেলতে শুরু করে দিয়েছিল। 'ইন্দুপ্রকাশে'র জন্য লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রবন্ধাবলীতে দেখি বঙ্কিমের ভাবনা অরবিন্দ-চিত্তের মর্মমূলে কিভাবে আলোড়ন তুলেছিল। নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তিনি বঙ্কিম-প্রচারিত জাতীয়তাবাদের মধ্যেই নরমপন্থার উপযুক্ত বিকল্প খুঁজে পেয়েছিলেন। চিন্তায়, বচনে, বেশভূষায় বঙ্কিমচন্দ্রের মতো একজন খাঁটি বাঙালী হয়ে উঠতেও দেরী হয়নি তাঁর। বাংলাই হয়ে ওঠে তাঁর স্বপ্নের ফ্রান্স, ভারতবর্ষের অ্যাথেন্স। প্রাচীনকালের গ্রীকরা যে অসামান্য সিদ্ধিলাভ করেছিল তা বাঙালীর জীবনে কেন অনায়ত্ত থেকে যাবে ? 'আনন্দমঠে' বর্ণিত দেশমাতার মূর্তি—যাঁর দ্বিসপ্ত কোটি ভুজে—ভিক্ষাপাত্র নয়, খর করবাল—তাঁকেও আকর্ষণ করছিল। হিন্দুত্ববোধ ক্রমশ প্রবলতর হয়ে ম্লান করে

দিয়েছিল, হয়তো-বা মুছেও দিয়েছিল তাঁর সযত্ন-আহরিত ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণার স্মৃতি। এর পর তাঁকে ভগিনী নিবেদিতা রচিত 'কালী দ্য মাদার' গভীরভাবে আকৃষ্ট করল। তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন শক্তির প্রতীক বগলা দেবীর আরাধানায়—শত্রু নিধনের জন্য যাঁর আশীর্বাদ অত্যাবশ্যক। ১৯০৫-এ অরবিন্দ লেখেন : 'ভবানীমন্দির'। রচনাটিতে বারীন্দ্রকুমারের যথেষ্ট অবদান থাকলেও, তার প্রেরণার উৎস ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', নিবেদিতার 'কালী দ্য মাদার', তিলকের 'শিবাজী উৎসব'। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানে ভবানী-বন্দনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে বাজী প্রভুর উদ্দেশে বিরচিত যে গাথাটিতে অরবিন্দ ভবানীর বোধন করেছিলেন তা প্রকাশিত হয়েছিল 'কর্মযোগীন্'-এ (ফেব্রুয়ারী—মার্চ, ১৯১০) :

We but employ
Bhavani's strength, who in an arm of flesh
Is mighty as in the thunder and the storm.
Chosen of Shivaji, Bhavani's swords
For you the gods prepare.

[আমরা যে শক্তি প্রয়োগ করি তা মাতা ভবানীর/ যিনি রক্ত মাংসের বাহুতেও ধরেন বজ্র এবং ঝঞ্ঝার অমিত বিক্রম/ শিবাজীর আরাধ্যা তিনি,/ দেবকুল নির্মিত তাঁর কৃপাণ তোমাদেরই জন্য।] জগন্মাতা ভবানী ও দেশমাতার সমীকরণ সহজ ছিল। সর্বত্র তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠার ভার তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত ধর্ম তাঁর জীবনে প্রধানতম প্রেরণা হয়ে ওঠেনি, তাকে অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়ক হিসেবেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য চরমপন্থীদের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে ধর্মের মধ্যে শক্তির এক অন্তহীন উৎস আছে। একবার জাগ্রত হলে তা ম্লেচ্ছদের (এবং তার সঙ্গে নরমপন্থীদেরও) সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দেবে। এই সময় থেকেই তিনি যোগাভ্যাস আরম্ভ করেন। পরবর্তী কালে নিজের সম্বন্ধেই তিনি লিখেছিলেন, "আমার ধ্যান-ধারণাগুলিকে পরিস্ফুটতর করার উদ্দেশ্যেই আমি যোগাভ্যাসের শরণ নিই নি, তার মধ্যে আমি আত্মিক শক্তির সন্ধান করেছি যা আমায় ক্লান্তিহীন রাখবে, পথ-সন্ধানে আমার সহায়তা করবে।" তখনও সে পথ ভারতের রাজনৈতিক মুক্তিসাধনার পথ।

ধর্মের মধ্যে বিপ্লববাদের প্রেরণা ও সমর্থনের জন্য অরবিন্দ যখন সন্ধান করছিলেন,[১৪] মহারাষ্ট্রে, তার আগেই, তিলক সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে মহারাষ্ট্র বরাবরই ছিল রক্ষণশীলতার দুর্গ। বাংলা দেশের ব্রাহ্ম সমাজের মতো প্রগতিশীলতার দাবী করলেও রানাঁড়ের প্রার্থনা সমাজকে রক্ষণশীল গোষ্ঠী অতি লঘু প্রতিপক্ষ জ্ঞান করত। তবে 'এজ অফ্ কন্‌সেন্ট' বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও গোঁড়ামির অপবাদ তখনও তিলককে স্পর্শ করেনি। ১৮৯০ সালে তিনি বিবাহের সর্বনিম্ন বয়সকে বাড়ানোর জন্য একটা স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরও করেছিলেন। বঙ্কিমের মতোই তিনি বিশ্বাস করতেন সামাজিক প্রথাগুলির স্বাভাবিক বিকাশ শ্রেয়। বিবেকানন্দের মতো তিনি কৃত্রিম সমাজ সংস্কারের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষে সমস্যাটা আদৌ সামাজিক নয়, তার যাবতীয় দুর্দশার মূল পরাধীনতা। এই জন্য জাতিভেদের কুফল বা সহবাসের সর্বনিম্ন বয়স ইত্যাদি প্রশ্ন গৌণ। আর বিদেশী শাসকেরা যেসব সামাজিক সংস্কার দেশবাসীর উপরে চাপিয়ে দিয়েছে সেগুলিকে জাতির অবমাননা ছাড়া আর কিছু তিনি ভাবতে পারেননি। তাঁর এই বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে উঠছিল যে সরকারী নীতিগুলির পিছনে প্রভাবশালী কিছু বুদ্ধিজীবীর সমর্থন পরাধীনতার শিকলটাকে আরও

শক্ত করে তুলছে। তিলকের এবম্বিধ মতের বিরুদ্ধে রানাডের বক্তব্যটাও প্রণিধানযোগ্য। রানাডের বিশ্বাস ছিল, সমাজ-সংস্কারের এই আন্দোলন সর্বাংশে হিন্দু ঐতিহ্যানুসারী, আর এই ঐতিহ্যের প্রবক্তা মহারাষ্ট্রের ভক্ত সন্তগণ, বাংলার রাজা রামমোহন রায়। দ্বিতীয়ত, সামাজিক সংস্কারের প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণ নেই, তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের স্বর্ণযুগের বিশুদ্ধতা ও উদারতার পুনরুজ্জীবন। এ বিষয়ে আইনের সাহায্য গ্রহণকে হিন্দুসমাজের উপর সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপ ভাবা নিতান্ত অনুচিত। কেন না এই কর্মসূচী সফল হলে বিদেশীদের রূঢ় হস্তাবলেপে লুপ্তপ্রায় বহু মূল্যবান ও কল্যাণকর সামাজিক বিধিবিধানের পুনঃপ্রবর্তন সম্ভব হবে।[৩৩] এই বিষয়ে কোনও তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার কোনও ইচ্ছা অবশ্য তিলকের ছিল না। তাঁর প্রভাব ও জনপ্রিয়তার উৎস যে কোথায় তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। মহারাষ্ট্রের রাজনীতি থেকে সুধারকদের বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত করার জন্য মানুষের দুর্বলতা বা কুসংস্কারগুলিকে কাজে লাগাতেও তাঁর কোনও কুণ্ঠা ছিল না।

'এজ অফ কন্‌সেন্ট' বিলকে কেন্দ্র করে যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ এই সময় সৃষ্টি হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্কে পর্যবসিত হয়।[৩৬] পশ্চিমী সংস্কৃতি এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের গুণাগুণ বিচারও এই বিতর্কে যুক্ত হয়ে পড়ে। বিলটির প্রতি হিউমের সমর্থন ছিল আন্তরিক, কিন্তু কংগ্রেসীদের একটা বড়ো অংশ স্পষ্টতই ছিলেন এর বিরোধী। অবশ্য এঁরা খোলাখুলি ভাবে এমন কিছু করতে চাননি যা ইংরেজ মিত্রদের চোখে তাঁদের হেয় করে তুলবে। শেষ পর্যন্ত কূটকৌশলই সরকারের জয় এনে দেয়। অতি-প্রগতির ছাপমারা মালাবারি পরিকল্পিত বিল গ্রহণে অনিচ্ছুক সরকার হিন্দুধর্মাশ্রিত কোনও সংস্কারে সহজে আঘাত করতে চান নি।[৩৭] কিন্তু ফুলমণির জীবনের শোচনীয় পরিণতিই এই বিতর্কিত এবং স্পর্শাতুর বিষয়টি মীমাংসার একটা উপযুক্ত সুযোগ সরকারের সামনে এনে দিয়েছিল। ফুলমণির স্বামীর নৃশংসতা এতই প্রকট ছিল যে স্যর অ্যানড্রু স্কোবল (যিনি এই বিলটি পাশ করানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন)—পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির এবং তিলকের মত মেনে নেওয়া থেকে অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের সঙ্গে মতৈক্য স্থাপন করাটাকেই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন।[৩৮] বড়লাট স্বীকার করেছিলেন সংস্কারটি ছিল অতি সামান্য। তাঁর কথা সত্য। সহবাস-সম্মতির নিম্নতম বয়স স্থির হয়েছিল মাত্র বারো বছর।

জাতীয় সামাজিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে তিলকের মতবাদের যৌক্তিকতা অবশ্য কিছু পরিমাণে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। সামাজিক সংস্কারের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে নানা দল এবং উপদলের, এবং পরিতাপের কথা, পিছিয়ে যাচ্ছে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভের পুণ্যলগ্ন—এই ছিল তিলকের বক্তব্য। তাছাড়া সমাজ সংস্কারের ব্যাপারটা রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলাটা অসময়োচিত বলে তিনি মনে করতেন—কেন না, এর ফলে উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রানাডে এর উত্তরে বলতে চেয়েছিলেন যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার প্রচেষ্টাগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, তারা পরস্পর নির্ভর এবং একযোগে তাদের সমাধান-প্রচেষ্টাই হবে বিজ্ঞজনোচিত। দীর্ঘ অবহেলিত নিচু জাতের মানুষ এবং মহিলাদের প্রতি সুবিচার না করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আশা করা যায় না। তিলক কিন্তু এ বিষয়ে দৃক্‌পাত না করে সম্মেলন বিরোধী তৎপরতায় মেতে উঠেছিলেন। প্রতিবাদ-সভা, এমন কি সংস্কার-পন্থীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ভয় দেখানোও বাদ যায়নি (যদিও তিলক

স্বয়ং এই প্ররোচনার উৎস ছিলেন না)।[৯৯] কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য রক্ষার খাতিরে শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিলেন রানাডে। পুণায় কংগ্রেস অধিবেশনের পর (১৮৯৫) সামাজিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হলো।[১০০] এই ব্যাপারে তিলকের পিছনে ছিলেন বণিক, মহাজন গোষ্ঠী, যাঁদের রক্ষণশীলতা ছিল নিশ্ছিদ্র, আর ছিলেন কিছু তপ্ত-মস্তিষ্ক তরুণ—তিলক ভক্ত।[১০১] সুধারক ও জটিরাম ফুলের শূদ্র অনুচরদেব মধ্যে পিষ্ট পুণার ব্রাহ্মণগণ অবশ্যই তিলককে সমর্থন করবেন।

তবে ধর্মকে একটা রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার আগে হিন্দুদের দলবদ্ধ করাটা যে অত্যন্ত জরুরী তা তিলক বুঝেছিলেন। হিন্দুরা ব্যক্তিগত ধর্মাচরণে বরাবরই অভ্যস্ত। ব্রাহ্মরা অবশ্য সমবেত হয়েই ধর্মানুশীলন করতেন। কিন্তু তাঁরা তো ধর্মত্যাগী। তা ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাকার ঈশ্বব উপাসনা কোন আবেগ সঞ্চার করতে পারবে না এটা তিনি জানতেন। ব্রাহ্মদের অনুপ্রাণিত করেছিল বেদান্ত, বঙ্কিমচন্দ্রকে গীতা। কিন্তু চরমপন্থীরা পুরাণ এবং তন্ত্রের মধ্যেই কর্ম-প্রেরণার সন্ধান করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন যে পুরাণোক্ত দেবদেবীদের আবির্ভাব ঘটে হিন্দুধর্মের বিবর্তনের শেষের দিকে যখন মানুষের আধ্যাত্মিক বিবর্তন কল্পনার স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ জন্য দেবদেবীগণকে শুধুমাত্র প্রতিমা জ্ঞান করা অনুচিত। তাঁরা একই সঙ্গে প্রতীকও ছিলেন ; তাঁদের স্থূল মূর্তির মধ্যেই ধৃত ছিল অধ্যাত্ম চেতনার অতি সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। আর পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্যে অরবিন্দ দেখেছিলেন অন্নময় জীবনশৈলীর মধ্যে আত্মিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে দেবার একটা উপায়। ধর্মের প্রধান কাজই হলো মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস এবং শক্তির উজ্জীবন। তাই মানুষকে অস্থায়ী, আধুনিক চিন্তাধারার বশীভূত না করে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়। এই চিন্তার সূত্র ধরেই তিনি বলেছিলেন যে গণপতির আরাধানায় মারাঠীদের হৃদয় যদি উদ্বেল হয়ে ওঠে, বাংলার মানুষ যদি শক্তিরূপিণী কালীর আরাধনায় উদ্দীপিত হয়—তাহলে আধ্যাত্মিকতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে সংস্কারপন্থীদের আক্ষেপ করা অনুচিত। মায়ের মধ্যে এবং মায়ের মাধ্যমেই কি রামকৃষ্ণের ব্রহ্ম দর্শন হয়নি ? তিনিও কি সাকার এবং নিরাকারকে একাসনে বসান নি ? অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দও শেষ পর্যন্ত মায়ের ভক্ত পূজারী হয়ে উঠে দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন মায়ের স্নেহালিঙ্গন জ্ঞানে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য

Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in destruction's dance,
To him the Mother comes.[১০২]

[সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুকে যে বাঁধে বাহুপাশে / কালনৃত্য করে উপভোগ/ মাতৃ-রূপা তারই কাছে আসে। অনুঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

নিবেদিতার প্রাসঙ্গিক উক্তিটিও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে : "ভীরুর ক্লান্ত হতাশার দীর্ঘশ্বাস নয়, আত্মরক্ষার জন্য দয়া ভিক্ষাও নয়, ভাগ্যের পায়ে নিরুপায়ে আত্মসমর্পন কখনোই নয়। আনত হয়ে শোনো—বহুশতাব্দীর দুঃখ-বেদনা পার-হয়ে-আসা ভারতভূমি বিশ্বমাতার চিরন্তনী মাতার কাছে বলছেন—তুমি যদি বিনাশ করো আমায় তবু তোমাতেই রাখবো আমার অটল বিশ্বাস।"[১০৩] ভারত জানে মা পারেন দর্পিত ইংরেজকে টেনে নামাতে, দরিদ্র ও অত্যাচারিতকে তার স্থানে তুলতে।

প্রাচীনকালে গ্রীকরা জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করার জন্য নানা উৎসবের আয়োজন

করত। সেই মতো চরমপন্থীরা, জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির জন্য, তাঁদের স্বাধীনতা স্পৃহা তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে, আঞ্চলিক পূজা-পার্বণ আয়োজনের কথা ভেবেছিলেন। গজাসুর-হন্তা গণেশ ম্লেচ্ছ শাসকদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন মহারাষ্ট্রে। 'দেশমাতা জগদীশ্বরীর থেকে ভিন্ন নন, আর জন্মভূমি তো দেবী দুর্গারই প্রতীক'—অরবিন্দের এই উপলব্ধি চরমপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্র দুর্গার মধ্যে 'বাঙালীর শাশ্বত আধ্যাত্মিকতাকে মূর্ত' হতে দেখেছিলেন। চরমপন্থীরা শক্তিকে দৈব-অভিলাষেরই দ্যোতনা বলে মনে করতেন। ইতিহাস-প্রবাহের চালিকা এই 'শক্তি'ই রূপান্তরিত হয় জাতীয়তাবাদে। পাল বলতেন, "এই অর্থে আমাদের ইতিহাস মায়ের পূত জীবনী ছাড়া অন্য কিছু নয়।"[১০৪]

বলা বাহুল্য, গণপতি উৎসব এবং দুর্গা আরাধনা বা কালীপূজা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে অসামান্য উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। এমন কি মুসলমানরাও প্রথম প্রথম এ ধরনের উৎসব থেকে দূরে সরে থাকে নি। এই উৎসবের অঙ্গ ছিল মেলা। একদল তখন নানা সাজে নাচত, শারীর কৌশল ও তরবারি-চালনা দেখাতো, কখনও-বা তারা রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে গান বাঁধত বা কবিতা আবৃত্তি করত। 'কীচক-বধ' নামে যে পালা দেখান হয় তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না কার্জনই কীচক।[১০৫] তিলক এই মেলাগুলিকে বাইরে গণ-সংযোগের মাধ্যমে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।[১০৬] আবার এই সমারোহের অন্তরালে চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিষ্ঠিত 'সোসাইটি ফর দ্য রিমুভ্যাল অফ অবসট্যাক্‌লস্‌ টু হিন্দু রিলিজিয়ন' তরুণদের অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া শুরু করেছিল। অধ্যাপক ওল্‌পার্ট লিখেছেন, "এ ভাবেই প্রথম দেখা দেয় সংগ্রামী হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুচর বাহিনী।" বাংলায় ইতিপূর্বেই সরলাদেবীর নেতৃত্বে 'বীরাষ্টমীব্রত' পালনের প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিল। গুপ্ত সমিতিগুলির পক্ষে এই সব অনুষ্ঠানের আড়ালে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের কোনও অসুবিধা হয়নি।

তবে হিন্দুদের মধ্যে পুনরুজ্জীবনের অভিঘাতে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এবং তার ফলে হিন্দু-সমাজে ধর্মীয় ভাবোন্মাদনা তীব্রতর হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, হিন্দুরা তাঁদের হিন্দুত্ব বোধকে অত্যন্ত উগ্রভাবে প্রকাশ করতে থাকায় (যেমন ধর্মীয় কারণে অথবা খাদ্যের প্রয়োজনে মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক গোহত্যার নিবারণ প্রচেষ্টা বা সমারোহ ও বাদ্যভাণ্ড সহকারে বিভিন্ন পূজানুষ্ঠান) প্রতিবাদ হিসেবে মুসলমানরাও আরো বেশী করে এবং নির্বিচারে গোহত্যা শুরু করে দেয়, মসজিদের কাছে গীতবাদ্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। এই ধরনের ঘাতপ্রতিঘাত সে সময়ে প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল।[১০৭] ১৮৯১ সালে কলকাতায়, ১৮৯৩-তে বোম্বাইতে, ১৮৯৪ সালে পুণা ও বোম্বাইতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে ও পরের বছর তার পুনরাবৃত্তি গণেশ পূজার মিছিল কেন্দ্র করে ধূলিয়ার দাঙ্গা তীব্রাকার ধারণ করে। বোম্বাই-এর লাট হ্যারিস এর জন্য ব্রাহ্মণদের এবং দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত গো-রক্ষা সমিতিগুলিকে দায়ী করেন। পরে দেখি সেই সরকার ভারতসচিবকে গোপনীয় চিঠিতে মুসলমানদের দোষ দিয়েছেন।[১০৮] উত্তর প্রদেশে হিন্দুদের বিক্ষোভ এমনই সাংঘাতিক হয়ে ওঠে যে সেখানে স্থানে-স্থানে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হয়। ল্যান্সডাউন অবশ্য 'গো-রক্ষা সমিতিগুলির' বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দাবী কানে তোলেননি। প্রাদেশিক সরকারগুলিও নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয়বিধান ছাড়া অন্য সময় যথেচ্ছ গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার আদেশও দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে প্রাদেশিক সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মুসলমান ঘেঁষা এবং এর বিপদ সম্পর্কে মাত্র একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী—ম্যাকডোনেল—অবহিত ছিলেন।[১০৯] বড়লাট ল্যান্সডাউন

এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভগুলিকে ইংরেজবিরোধী, এমন কি কংগ্রেসী আন্দোলন বলেই মনে করতেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল : "কংগ্রেসের অতি উৎসাহী সদস্যরা (যাঁরা স্পষ্টতই আমাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট) এই সাম্প্রদায়িক গণবিক্ষোভের মধ্যেই কংগ্রেস ও হিন্দুদের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের সুযোগ খুঁজে পেয়েছেন।...আমার বিশ্বাস, এই ভাবেই নখদন্তহীন একটা বিতর্ক সভা থেকে কংগ্রেস রূপান্তরিত হয়েছে একটা প্রকৃত রাজনৈতিক শক্তিতে, আর তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছে সমাজের সবচেয়ে বিপজ্জনক জন-গোষ্ঠী।"[১১০] যদিও বোম্বাই সরকার জানিয়েছিলেন, "আমরা নিঃসংশয় নই যে গো-রক্ষা আন্দোলনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মূল কারণ"—তবু ল্যান্সডাউন তাঁর ধারণা পাল্টাননি। এদিকে 'কেশরী'র মাধ্যমে তিলক সরকারের উপর দোষারোপ করতে থাকেন। উভয়পক্ষের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ না থাকায় ভুল বোঝাবুঝিও বাড়তে থাকে।

এই সময় প্লেগ মহামারী প্রতিরোধ করার জন্য বোম্বাই সরকার যে সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সেগুলিও ধর্মীয় উন্মাদনা বৃদ্ধির কারণ হয়ে ওঠে। এই মহামারীর কবলে যাঁরা পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক অবস্থা হয়েছিল বোম্বাই-এর দক্ষিণাঞ্চলের কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর লোকদের। এঁরা ১৮৭০-এর দশক থেকেই জমিদার ও সাউকর (তেজারতী-কারবারী)দের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছিল। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে এই ভয়ঙ্কর মহামারী দেখা দিয়েছিল ১৮৯৬-এর সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের পরেই। হোলডারনেসের মতে দুর্ভিক্ষ ভারতের ৬ কোটি ২০ লক্ষ লোককে কবলিত করেছিল। তা সত্ত্বেও শস্য রপ্তানী অব্যাহত থাকে এবং খাদ্যমূল্য বাড়তে থাকে। খাজনা না কমিয়ে সরকার পুণা সার্বজনিক সভাকে শিক্ষা দিতে চান যে আন্দোলনে ফল হয় না। তিলক বজ্রনির্ঘোষে তার উত্তর দেন ; "চাষীরা খাজনা দেবে না, অন্তত এ বছর নয়।"[১১১]

দুর্ভিক্ষেব সঙ্গে মহামারীর যোগ সুবিদিত। ভারত সচিব বোম্বাই বন্দরের কাজকর্ম অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে যে কোনও উপায়ে এই মহামারীর মোকাবিলা করার জন্য ভারত সরকারকে আদেশ দেন। তদনুসারে ভারত সরকারও বোম্বাই-এর প্রশাসকদের ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছিলেন যাতে তাঁরা এই মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ রোধ করতে পারেন। কিন্তু বস্তির নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞাতপ্রসূত কুসংস্কারের ফলে এই মহামারী অতি দ্রুত প্রলয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আর দুর্ভাগ্য এটাই যে ব্যাধির মূলোৎপাটন না করেই বোম্বাই সরকার রোগাক্রান্তদের আলাদা করতেই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সরকারী ব্যবস্থা প্রায়ই অতি নির্মম, ক্ষেত্র বিশেষে, অমানুষিক হয়ে ওঠে। ওয়াল্টার র‍্যাণ্ড (তিলক এঁকে হৃদয়হীন, বদমেজাজী এবং সন্দিগ্ধমনা বলে জানতেন) নিযুক্ত হন প্লেগ নিবারণ কমিটির মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক। মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণের আশায় অসংখ্য অসহায় মানুষ নানাবিধ কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের স্বাভাবিক দুর্বলতা সহৃদয়তার সঙ্গে বিচার না করে র‍্যাণ্ড প্রবল উৎসাহে প্লেগ নিয়ন্ত্রণ শুরু করে দেন। ১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারী এবং এপ্রিলে রোগাক্রান্তদের পৃথকীকরণ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের নিয়মিত বস্তি পরিদর্শনের প্রস্তাব করেছিলেন তিলক। হাসপাতাল ঘিরে যে সমস্ত মিথ্যে গুজব রটেছিল সেগুলোরও তিনি বিরোধিতা করেন। হিন্দুদের জন্য একটা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতার কথাও সুবিদিত। তবে সরকারী ব্যবস্থা যাতে অমানুষিক না হয়ে ওঠে সেজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান এবং মহামারী নিয়ন্ত্রণের কাজে সেনা নিয়োগের বিরোধিতা করেন। আর্ত ত্রাণের জন্য এদেশীয়দের নিয়ে একটা কমিটি গঠনের প্রস্তাবটা তাঁর কাছ থেকেই এসেছিল। কিন্তু ৪ঠা মের পর থেকে

তাঁকে সুর পাল্টাতে দেখা গেল। অকারণ অত্যাচার, অনাবশ্যক নির্মমতা, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি গর্জন করে উঠলেন। 'কেশরী'র প্রতি পৃষ্ঠায় র‍্যাণ্ডের উপর নিন্দা বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। অপর পক্ষে, কুসংস্কার আঁকড়ে থাকার জন্য ডাঃ লসন পুণার হিন্দুদের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে একই কারণে প্লেগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ম্যাকডোনেল এলগিনকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, লক্ষ্ণৌর মুসলমানরাও হাঙ্গামা শুরু করতে পারে যদি প্লেগ রোগাক্রান্ত সন্দেহে কাউকে স্থানান্তরিত করার সময় স্বাস্থ্য বিভাগের পরিদর্শক ওদের পর্দা-প্রথার অবমাননা করেন। পুণা ও লক্ষ্ণৌর পরিস্থিতির তুলনামূলক পর্যালোচনা করে ভাইসরয় বলেন যে, "ভারতবর্ষে অতিসাবধানতা বলে কিছু নেই।"[১১২] এর পরেই ঘটে বহু আলোচিত সেই হত্যাকাণ্ড। মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক-জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিয়ে ফেরার পথে র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্টকে হত্যা করেন চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় (২৭শে জুন, ১৮৯৭)। উচ্চকিত, ত্রস্ত বোম্বাই সরকারের আমলারা তিলকের মৃত্যুদণ্ডের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য তিলক ইতিপূর্বেই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারপর, ১৩ই জুন শিবাজী উৎসবে তিনি যে ভাষণ দেন (১৫ই জুন, 'কেশরী'র পৃষ্ঠায় তা বেরোয়) তা-ই র‍্যাণ্ড হত্যাকাণ্ডের প্রধান প্ররোচনা বলে ইংরেজ কর্মচারীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[১১৩] এলগিন অবশ্য উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে ক্রোধান্ধ হননি। তাঁর প্রাসঙ্গিক বক্তব্যটাও প্রণিধানযোগ্য : "এই দুষ্কার্যের বিভীষিকা যেন আমাদের এই সত্যটা স্বীকারের অন্তরায় না হয়ে ওঠে যে সম্প্রতি গৃহীত প্লেগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে এ জাতীয় হত্যাকাণ্ডে ইন্ধন জোগাবার মতো কিছু উপাদান ছিল।"[১১৪] বিনা জুরীতে তিলকের বিচারে তাঁব মত ছিল না, আর ঐ মারাঠী নেতার বিচার ও দণ্ডদানের দায়িত্ব যে একান্তরূপে বোম্বাই সরকারের—তাও তিনি জানিয়ে দেন। ভারতসচিব কিন্তু এই সমস্ত ঘটনায় সন্ত্রস্ত হয়ে অবিলম্বে রাজদ্রোহ সংক্রান্ত আইন জারী করার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁকেও নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন এলগিন। এদেশে বিদ্রোহের কোনও সম্ভাবনাই যে তখন ছিল না, দোষীর শাস্তিবিধানের জন্য ঐ জাতীয় আইনের কোনও প্রয়োজন নেই এবং লীটন-অবলম্বিত অতি কঠোর বিধানগুলিও অনাবশ্যক—এটাই তিনি ভারতসচিবের কাছে জানিয়েছিলেন।[১১৫] 'নেটিভ'দের সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, কিন্তু তা-ই বলে কংগ্রেসকে অবৈধ প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করায় তাঁর আপত্তি ছিল। গোটা দেশে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে মাত্র ১২টি ছিল স্পষ্টত সরকার-বিরোধী, সুতরাং নতুন কোনও সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইনও প্রবর্তিত হয়নি।

ঐ সময়কার ভারতীয় রাজনীতির যথাযথ মূল্যায়নের কৃতিত্ব অবশ্যই এলগিনের প্রাপ্য। অতি-উত্তেজিত বোম্বাই সরকারের হঠকারিতা তিলককে 'শহীদে' পরিণত করে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিলকের দৃপ্ত জবানবন্দীকে (১৯০৬ সালের ট্রটস্কির ভাষণের সঙ্গে তুলনীয়) যদি চরমপন্থার প্রথম বিঘোষণার মর্যাদা দেওয়া যায় তবে তাঁর স্বল্প-মেয়াদী কারাদণ্ডও নিঃসন্দেহে হিন্দু উগ্রপন্থীদের রাজদ্রোহের পথ নেওয়ার প্রধান প্ররোচনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এলগিনের আপত্তি সত্ত্বেও ভাইসরয়-এর আইন পরিষদ দেশীয় সদস্যদের উপর চাপ সৃষ্টি করে 'ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডে'র ১০৯ নং ধারা এবং ভারতীয় পেনাল কোডের ৫০৫ নং ধারার সংশোধন করে।[১১৬] অতি-বশংবদ নরমপন্থীদের

আবেদন-নিবেদনেব নীতিব অসাবতা প্রমাণ কবে দিযে সবকাবেব এই দমননীতিই পবোক্ষে চবমপন্থীদেব বক্তব্যেব যাথার্থ্য প্রমাণ কবে দিযেছিল। চবমপন্থীদেব জনপ্রিযতা ক্রমেই বাডতে থাকে।

সনাতন হিন্দুধর্মেব প্রতি শ্রদ্ধা-গাঢ দৃষ্টিতে ফিবে তাকানো ছাডাও চবমপন্থী নেতাবা ভাবতবর্ষেব ইতিহাসকে অভীষ্ট-সিদ্ধিব জন্যে নানাভাবে ব্যবহাব কবেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হ্যানস কোন-এব বক্তব্য স্মবণ কবা যেতে পাবে "প্রতিটি সদ্যোজাত জাতীযতাবাদেব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ জাতীযতাবাদী শক্তিব সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগ থেকে প্রাথমিক প্রেবণা পাওযাব পব তা আপন অতীতেব ভাব-সম্পদেব প্রতি আকৃষ্ট হযেছে, এবং প্রতীচ্যেব যুক্তিবাদী ও সর্বজনীন মানদণ্ডেব সঙ্গে তুলনা কবে স্বদেশেব পুবোনো ঐতিহ্যেব গভীবতা ও বৈচিত্র্যেব গুণ-কীর্তনেও মত্ত হযে উঠেছে।" "ধূসব অতীতেব ছাযাচ্ছন্ন ইতিবৃত্তেব স্মৃতি এবং অনাগত ভবিষ্যেব কল্পলোক থেকে স্বপ্নেব যে পিতৃভূমি বচনা কবেছেন জাতীযতাবাদীবা তাব সঙ্গে বর্তমানেব কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।"[১১৭] বাশিযাব শ্লাভোফিলবা পিটাব দ্য গ্রেটেব পূর্বেকাব বাশিযা থেকে অনুপ্রেবণা পেযেছিল। জাতি-কেন্দ্রিকতাব এই বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে স্বকপোলকল্পনাব বা বিমূর্ত ভাবনাব ফল, কিন্তু বিপিনচন্দ্রেব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ছিল—নবমপন্থীদেব দেশপ্রেমেব সঙ্গে বর্তমানেব প্রত্যক্ষ যোগ ছিল কি? তিনি লিখেছিলেন, "এ সমযে নব্য ভাবতেব আদর্শ পুরুষ হযে উঠেছিলেন পিম, হ্যাম্পডেন, ম্যাৎসিনী, গ্যাবিবল্ডী, কসুথ এবং ওযাশিংটন। ইংলণ্ডেব বিপ্লব, আমেবিকাব স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফবাসী বিপ্লবেব ইতিবৃত্ত থেকে আমবা আহবণ কবে চলেছি বাষ্ট্রীয স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধাবণা।"[১১৮] নবমপন্থীবা হ্যালাম, বার্ক এবং মেকলেব বচনায ইংলণ্ডেব যে ছবি চিত্রিত হযেছে তাবই আদর্শে ভাবতবর্ষকে নির্মাণ কবতে চেযেছিলেন। এই অ্যাংলো স্যাক্সন আদর্শেব প্রতি অববিন্দেব কোনও মোহ ছিল না। তাঁব দৃষ্টি আর্য সভ্যতাব স্বর্ণাভ দিনগুলিতে ফিবে গিযেছিল, আবণ্যক, বর্বব টিউটন-সভ্যতাব চেযে যা বহুগুণ বেশী উন্নত ও ঐশ্বর্যশালী ছিল। "তাব প্রথা-প্রতিষ্ঠানেব মধ্যে মানবিক অনুভূতি, সহৃদযতা ও হৃদযেব উত্তাপেব লেশমাত্র ছিল না, তা ছিল যন্ত্রেব মতোই অনমনীয, বস্তুসর্বস্বতায আকণ্ঠ নিমজ্জিত, পার্থিব স্থূল প্রযোজন-সিদ্ধিব চেযে মহত্তব কোনও লক্ষ্য যাকে আদৌ উদ্দীপিত কবতে পাবেনি।" ধ্রুপদীপর্বেব ইউবোপেব প্রতি শ্রদ্ধা নিযে অববিন্দ স্মবণ কবতে চেযেছিলেন প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাব কথা, যেখানে চিৎপ্রকর্ষেব অসামান্য উন্নতি সাধনেব সঙ্গে সুমিত রূপসাধনাব এক বিবল সার্থকতা অর্জিত হযেছিল। তিনি ভুলতে পাবেননি প্রাচীন বোমক সভ্যতাব ইতিহাস যাব শ্রেষ্ঠত্বেব ভিত্তি বচনা কবে দিযেছিল বোমানদেব স্বদেশপ্রেম, শৌর্য, শক্তি এবং শৃঙ্খলাবোধ। আব আধুনিক কালেব ইউবোপেব বিবাটত্বেব বনিযাদ তৈবী কবে দিযেছে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান, কর্ম-দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক সাফল্যেব পার্থিব উপাদানগুলি। "অপব দিকে ভাবতবর্ষেব আধ্যাত্মিক মানস মানুষেব অন্যান্য শক্তিব ওপব কাজ কবছিল এবং তাদেব অতিক্রম কবে বিকশিত কবেছিল স্বজ্ঞালোকিত বুদ্ধি, আধ্যাত্মিক চেতনায উদ্বুদ্ধ ধর্মেব দার্শনিক সঙ্গতি এবং অসীম ও অনন্তেব ভাবনা।"[১১৯] সাযণ এবং ম্যাকসমূলাব যা-ই লিখে থাকুন না কেন, বেদ তো কখনোই নৈসর্গিক শক্তি বা তাদেব প্রতীক বিভিন্ন দেবদেবীব বন্দনা-গীতি বা যজ্ঞানুষ্ঠানেব কর্মবিধিব তালিকামাত্র ছিল না, বৈদিক শাস্ত্রেব মধ্যেই নিহিত আছে অনন্তেব উপলব্ধি, মানুষেব সামনে স্বর্গীয সত্যেব উদ্‌ঘাটন। বেদই ধাবণ কবে আছে ঐশী নির্দেশ, সৃষ্টি ও ব্রহ্মাণ্ডেব অপবিবর্তনীয় নিয়মাবলী, ধর্মেব সাবাৎসার, বিজ্ঞানের নির্যাস। আধ্যাত্মিকতাব

মহত্তর প্রকাশ এই বৈদিক শাস্ত্রেই, তার মধ্যেই আছে এই উপলব্ধি যে পরম ব্রহ্মের মহাচৈতন্য থেকেই উৎসারিত ব্যক্তিসত্তা এবং সমগ্র সৃষ্টি। আর এই বোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বিচিত্র দ্যুতিময় ভারতীয় সভ্যতা। এই সভ্যতার অঙ্কে কর্ম ও অর্থকেন্দ্রিক যে জীবন পূর্ণবিকশিত হয়েছিল তার পরিধি ধর্মকে কখনোই অতিক্রম করেনি, কদাচ বিস্মৃত হয়নি মোক্ষের কথা। ভারতীয় সমাজ যখন পুরাণ ও তন্ত্রের প্রচ্ছায়ে, তখনো জ্ঞান, উদ্যম ও প্রেমের সহায়তায় গণ-মানসের অধ্যাত্ম-চেতনার উন্নয়ন ও গভীরতাদানের চেষ্টা থেমে থাকেনি। বৈদিক শাস্ত্রের এই দীপ্তি তিলককেও গভীরভাবে অভিভূত করেছিল। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন যে আর্যরা সুমেরু প্রদেশাগত এবং বেদের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ বছরেরও আগে।[১২০] চরমপন্থায় বিশ্বাসী প্রায় সকলেই বিশ্বাস করতেন যে গীতার মধ্যেই বৈদিক সংস্কৃতির সার নিহিত। অরবিন্দের অনুপ্রাণিত লেখনী থেকে তাই উৎসারিত হয়েছিল গীতার অনবদ্য ভূমিকা, তিলক সাগ্রহে রচনা করেছিলেন 'গীতা-রহস্য' (গীতার একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য), লাজপৎ রায়ও উর্দুভাষায়শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কথা লিখেছিলেন। বাংলায় ব্রহ্মবান্ধবের 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ'এরও মূল প্রেরণা ছিল গীতা। বলা বাহুল্য এই সমস্ত, রচনার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ছিল অতি স্পষ্ট, আর এই রচনাগুলির মধ্যে, চরমপন্থীদের দ্বারা বৈদিক সংস্কৃতির একটা ইতিহাসসিদ্ধ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। কেল্টিক বা শ্লাভ মিথ-এর সমগোত্রীয় আর্য ইতিবৃত্তের মাধ্যমে 'টিউটনিক মিথে'র সম্মোহ ছিন্ন করার একটা উপায় তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন। প্লুটার্কের জীবনী পড়ে ফরাসী বিপ্লবের বীররা যেমন লিওনিডাস, সিনসিনেটাসের মধ্যে আদর্শ খুঁজতেন, চরমপন্থীরাও তেমনি ভীষ্ম ও অর্জুনের মধ্যে।

একটা জাতি, সমাজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যে শ্রীকৃষ্ণের মতো কোনও এক অলৌকিক বীরের বন্দনাকে ঘিরেও গড়ে উঠতে পারে—সে বিষয়েও সম্যক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন চরমপন্থীরা। তবে তাঁরা এটাও জানতেন যে বিস্মৃত-প্রায়, দূর-অতীতের কোনও অলোকসামান্য পুরুষের স্মৃতি-চারণার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য যথাযথ ভাবে পূর্ণ হতে পারে না। তাই বাস্তববোধই তিলককে পরিচালিত করেছিল এমন এক মহাবীরকে বরণ করতে যিনি প্রায় আধুনিক দেশ ও কালের প্রতিনিধি। মারাঠা-নায়ক শিবাজীর শৌর্য-দীপ্ত কাহিনী তখনো জনমানসে অম্লান ছিল। উপরন্তু, রানাডে এবং রমেশচন্দ্র দত্তের রচনায় সেই স্মৃতি নতুন করে সর্বশ্রেণীর হিন্দুর মনে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং মদনমোহন মালব্যের মতো নরমপন্থীরা অবশ্য ছত্রপতির জীবন-আলেখ্যের মধ্যে সন্ধান করেছিলেন দেশপ্রেমের এক অনির্বাণ উৎস, তিলক কিন্তু প্রধানত শিবাজী-গাথাকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন হিন্দু পুনরুজ্জীবনের উপাদান রূপে।[১২১]

দুর্ধর্ষ মারাঠা গেরিলা বাহিনীর যে প্রচণ্ড আঘাত বিপুল মুঘল বাহিনীকে বারবার বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, যে দুঃসাহসী নৈশ-অভিযানগুলি অশনিপাতের আকস্মিকতায় বিজাপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলির পতন ঘটিয়েছিল, বিদ্যুৎ-চমক সদৃশ যে তীক্ষ্ণ ও পলক-স্থায়ী আক্রমণে বেপরোয়া অতিকৌশলী শত্রুও বিহ্বল হয়ে পড়তো, যে সর্বপ্লাবী ধর্মীয় উন্মাদনা প্রতিনিয়ত মারাঠাদের অনুপ্রাণিত করত, অকাতরে আত্ম-বিসর্জনের জন্য—তা সবই যাঁকে কেন্দ্র করে এবং যাঁর ইঙ্গিতে ঘটেছিল—সেই শিবাজীর নিজের জীবনও ছিল অবিশ্বাস্যভাবে নাটকীয়। এ দেশের মধ্যবিত্তদের নিরাবেগ ও বদ্ধ জীবনে তীব্র কশাঘাতের মতোই লেগেছিল মারাঠা বীরের প্রায় অলৌকিক কাহিনীগুলি। মারাঠাদের জীবনের সকল শূন্যতা ও নির্জীবতার অবসান ঘটিয়ে তাদের রূঢ়ভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে একদিন তারাই

দিল্লীশ্বরকে আটক করে আদায় করেছিল মুক্তিপণ, তাদেরই সর্বত্র সঞ্চরণশীল যুদ্ধাশ্ব একদিন ভারতবর্ষের দূরদূরান্তের নদ-নদীগুলির সলিলে ক্লান্তি ও তৃষ্ণা মোচন করত। আর, একদা যাঁরা মহারাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতার অধীশ্বর ছিলেন এবং অধুনা, ক্ষমতালিপ্সা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন—সেই চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের কাছে এই গরিমাময় স্মৃতির মূল্য স্বভাবতই অনেক বেশী ছিল। শিবাজীর বংশধর হিসেবেই মারাঠারা হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার ঐতিহ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন।[১২২] মাঝের সময়টুকুর মধ্যে পাল্টে গিয়েছিল শুধু আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। মুঘল নয়, ইংরেজ। আর শিবাজীর কাছে যেমন, চরমপন্থীদের বিচারেও তেমনি, অভীষ্টপূরণের জন্য কোনও পথই বিপথ বলে বিবেচিত হতো না।

চরমপন্থীরা এটাও মনে রাখার চেষ্টা করেছিলেন যে ছত্রপতি শিবাজী শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রাম বা স্বাধীনতা সমরেরই প্রতীক ছিলেন না। বিপিনচন্দ্র পালের কাছে শিবাজী ছিলেন একটা মহৎ আদর্শের প্রতীক, মানব-হৃদয়ের গভীর একটি অনুভূতির উজ্জ্বল প্রকাশ, অনন্যসাধারণ একটি আন্দোলনেব প্রাণ-পুরুষ। তাঁর সমস্ত কর্ম, প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম একটি অখণ্ড হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। সমকালের হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি জাতীয় ঐতিহ্য এবং ধর্মশাস্ত্রগুলির প্রভাবে পরস্পরের কাছাকাছি আসতে শুরু করেছিল। শিবাজী তাদেরই এক রাজ্য-পাশে ঐক্যবদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হন। চরমপন্থীদের চোখে শিবাজী-সৃষ্ট রাষ্ট্রের মহত্ত্ব কার্জনের (যাঁকে তাঁরা আওরঙ্গজেবের সমগোত্রীয় ভাবতেন) সাম্রাজ্যবাদের পাশে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শিবাজীর অধীনে মারাঠাদের রাষ্ট্রীক আধিপত্য কখনো ব্যক্তিগত ক্ষমতালিপ্সার প্রতীক হয়ে ওঠেনি, নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য পালনের উপর ভিত্তি করেই তা রচিত হয়েছিল। আর, আত্ম প্রতিষ্ঠা নয়, অহংবোধ অবলোপ, বিদ্বেষ নয়, ভালবাসার অনুপম আদর্শে রঞ্জিত ছিল শিবাজীর সাম্রাজ্যিক শক্তি।[১২৩] সেজন্য তাঁব মধ্যেই ভারতবর্ষ খুঁজে পেয়েছিল অনন্যসাধারণ এক লোকনায়কের সন্ধান, যিনি ছিলেন একটা জাতির স্রষ্টা, এক সাম্রাজ্যের দক্ষ স্থপতি। চরমপন্থীরা কখনোই এই তথ্যটি ভুলতে চাননি যে শিবাজীর রাজ্য প্রকৃত অর্থেই ছিল এক ধর্মরাজ্য। গুরু রামদাসের পরম অনুগত সেবক রূপেই দেশ শাসনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ছত্রপতি। এই সচেতনতাই রবীন্দ্রনাথের মন থেকে বর্গীর দুঃস্বপ্ন দূর করে দিয়েছিল। ১৯০৪ সালে শিবাজী উৎসব' রচনা করে তিনি এই মারাঠা বীরের স্মৃতি-তর্পণ করেছিলেন।[১২৪] এ সময় জাতীয় নায়ক বন্দনার একটা প্রবল ভাবাবেগ সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্জাবীরা নতুন করে আলোড়িত হয়েছিলেন পঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিং-এর স্মৃতি-চারণায়, বাংলায় প্রতাপাদিত্য এবং সীতারামের সংগ্রামের কাহিনী অনেকের কাছে প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। এমন কি এই আবহাওয়ায় শুধুমাত্র একজন নাট্যকারের (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) কল্পনায় নয়, বিদগ্ধ একজন ঐতিহাসিকের (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের) লেখনীতে সিরাজুদ্দৌলার ভাবমূর্তিও আমূল পাল্টে গিয়েছিল।

অ্যাংলো-স্যাকসনদের পাশে আর্যদের, ধর্ম-বিবর্জিত, বিষয়াসক্ত স্বৈরাচারী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির পাশে হিন্দুরাজ্যগুলিকে এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলির জনকদের অমৃতলোকের (ভাল হাল্লার) পাশে দেশীয় বীরবৃন্দের অমরলোক সংস্থাপন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছিলেন চরমপন্থীরা। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে এই শ্রেষ্ঠত্ব দাবীর বিঘোষণাই তাঁদের কাছে যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি। হিন্দুরাজনৈতিক প্রতিভার প্রতিটি অনুপুঙ্খ তুলে ধরে তাঁরা এ দেশের সুপ্রাচীন গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন,

বারবার উল্লেখ করেছেন এ দেশে প্রবর্তিত অসংখ্য ধর্মানুশাসনের কথা যেগুলি স্বৈরাচার নিষিদ্ধ করে সমাজ জীবনের কল্যাণের জন্য বিধিবিধান প্রণয়ন করেছিল। চরমপন্থীদের বিচারে শ্লাভদের 'মীর'গুলির মতো হিন্দুদের গ্রাম ছিল রাষ্ট্রের প্রাণ-কেন্দ্র। ইংরেজরা এ দেশে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে গ্রামগুলির স্বায়ত্তশাসন ও স্বনির্ভর অর্থনীতির সর্বনাশ ঘটাবার আগে পর্যন্ত তারা সমস্ত রকম দুর্বিপাক এবং বৈদেশিক আক্রমণের আঘাত তুচ্ছ করে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছিল। এদের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, প্রশাসকের সঙ্গে প্রজার সংযোগ একেবারেই ছিঁড়ে যায়।[১২৫] ভারতবর্ষে গ্রামীণ জীবনের বাইরেও নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বহু নিদর্শন তিলক দেখেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই আবিষ্কৃত হয় কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র পাণ্ডুলিপি এবং ১৯০৫ সালে শ্যাম শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এই গ্রন্থ সমস্ত জগতের সামনে রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানে হিন্দু প্রতিভার অসামান্য সফলতার প্রমাণ তুলে ধরে। অর্থশাস্ত্র বাস্তব প্রয়োগ বর্জিত শুধুমাত্র একটা তত্ত্ব কি না এ প্রশ্ন কেউ তোলে নি। বরং এই দাবী অনেকের কণ্ঠেই শোনা গিয়েছিল যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাল থেকে সর্বশেষ পেশোয়ার আমল পর্যন্ত 'অর্থশাস্ত্র'ই ছিল 'হিন্দুরাজাদের দর্পণ' স্বরূপ। ভাবাবেগে উদ্দীপিত হয়ে বিপিনচন্দ্র লিখলেন, "অতীতে সুবৃহৎ আর্য পরিবারের অন্যান্য শাখাগুলির মতো আমরাও উল্লেখযোগ্য নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পত্তন করেছিলাম। হিন্দুরাষ্ট্রগুলিতে বিধিবিধান প্রণয়নের জন্য ব্রাহ্মণ-পরিচালনাধীন যে পরিষদ ছিল তা ছাড়াও ছিল গণপ্রতিনিধিদের 'সভা'—প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যার উল্লেখের অভাব নেই। মধ্যযুগে এ দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন নিতান্ত নিরুদ্যম হয়ে পড়ে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা একটা সামন্ততান্ত্রিক আদর্শ এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় কিছু প্রথা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলিই সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরহিত ব্রতের আদর্শ সঞ্চারিত করে দিয়েছিল।"[১২৬] যৌধেয় এবং লিচ্ছবিদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এমন বহু প্রতিষ্ঠানের সন্ধান অরবিন্দ পেয়েছিলেন যেগুলির সঙ্গে আধুনিককালের নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য ছিল। সাধারণতন্ত্রী রোমক সাম্রাজ্যের চেয়েও অনেক বেশীকাল এরা নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল তবু রোমকদের মতো পররাজ্য লিপ্সার কলুষ এদের কখনো স্পর্শ করেনি।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বহিরঙ্গের থেকে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি যে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল—একথা চরমপন্থীদের মুখে প্রায়ই শোনা যেতো। এ দেশে প্রজাপুঞ্জের আনুগত্য নিবেদিত হতো ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য সপরিষদ-রাজা যে সব অনুশাসন প্রবর্তন করতেন তার প্রতি। রাজা ছিলেন প্রজাদের প্রধান সেবকমাত্র। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার কাঠামোর মধ্যে সক্রিয় ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর স্বনির্ধারিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, এবং তারই মধ্যে সম্পন্ন হতো মানুষের আত্মিক উন্নতিসাধন, নিছক জৈব অস্তিত্ব থেকে আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নয়ন। আদি যুগে সমাজের এই ভেদ ছিল নিতান্তই কর্মভিত্তিক এবং এই পৃথকীকরণের বিধান নির্ভর করতো মানুষের ধর্ম-চেতনার উপর। মানুষের স্বভাব, সহজাত-প্রবৃত্তি এবং প্রবণতা —সমস্ত কিছুই নির্ণয় করে দিতো তার ধর্মবোধ। ইউরোপের শ্রেণী-পার্থক্যের প্রথার গায়ে স্থূল জাগতিক বিষয়ের অসংখ্য ছাপ থাকলেও ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা সব সময়েই একটা নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।[১২৭] তুলনামূলক এই আলোচনার সূত্র ধরে বিপিনচন্দ্র লিখছিলেন যে পরবর্তীকালে, বংশ কৌলীন্যের দাবী জাতিভেদ প্রথার অনিবার্য পরিণাম

হিসেবে দেখা দিলেও তা অনেকটা মার্জিত ও সহনীয় হয়ে যায় আশ্রম ধর্মের প্রভাবে। আশ্রম-প্রথা মানুষের অহংবোধ নাশ করে একধরনের নির্লিপ্তির সঞ্চার করে দিয়েছিল। এই সমস্ত বিধান প্রবর্তন করেই আর্যরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতিগুলিকে একটা সংহতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন।[১২৮] এই প্রসঙ্গে অরবিন্দও লিখেছিলেন : "এ দেশে ধরা-বাঁধা অভ্যাস ও প্রথা-বদ্ধ জীবন-যাপন পদ্ধতির দ্বারা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কখনো অচলায়তনে পরিণত হয়নি। অপরিবর্তনীয় জাতিভেদ প্রথাকে আপন সমাজ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে মেনে নিলেও ভারতবর্ষ কখনোই এ তথ্য বিস্মৃত হয় নি যে মানবাত্মা এবং মনুষ্য চেতনাকে কোনও নিগড়ে বদ্ধ রাখা যায় না। যদিও জাত্যভিমান এই সত্য উপলব্ধির অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল, দীন-হীন মানুষের মধ্যেই ভারতবর্ষ সাক্ষাৎ নারায়ণের সন্ধান পেয়েছে।" জাতি বৈষম্যকে মেনে নিলেও ভারতীয় সমাজচেতনা তাকেই বারবার আক্রমণ করেছে, অস্বীকার করতে চেয়েছে মানুষে মানুষে সর্বপ্রকার ভেদাভেদ।

সমাজে ব্রাহ্মণের ভূমিকার সমর্থনে তৎপর হতে দেখা গিয়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। ভারতীয় সংস্কৃতির যে অভিনব বাণী—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অবস্থিতি—তা ব্রাহ্মণই সযত্নে রক্ষা করেছেন। সমস্ত পার্থিব সম্পদ হেলায় তুচ্ছ করার মানসিকতা তাঁর মধ্যেই ফুটে উঠেছে অতুলনীয় ভাবে। তিনিই সর্ব রকমের স্বার্থের সংঘাত থেকে অবিচলিত নির্লিপ্ততায় নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন, মানব-কল্যাণের জন্য মঙ্গলাচরণের দায়িত্ব বহন করেছেন, প্রবল পরিবর্তনের মধ্যেও মুক্তির দীপশিখাটিকে অনির্বাণ রেখেছেন।[১২৯] চিৎপাবন ব্রাহ্মণ কুলে জন্মলাভের সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত তিলক সেই মহৎ ঐতিহ্য বহন করতে চেয়েছিলেন।[১৩০] বেনিয়া ইংরেজ রাজত্বেব শত্রু অরবিন্দ প্রার্থনা করেছিলেন ব্রাহ্মণত্বের উজ্জীবন। স্ত্রীকে লেখা একটা চিঠিতে তিনি এই মনোবাসনা প্রকাশ করেছেন, "তরবারি বা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আমি সমরাঙ্গণে প্রবেশ করতে আগ্রহী নই। ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের চেয়ে ব্রাহ্মণের অনুপ্রেরণার শক্তি সম্পর্কে আমি বেশী সচেতন। প্রজ্ঞাই এই ব্রাহ্মণত্ব-বোধের ভিত্তি।"[১৩১] আবার, সামাজিক মর্যাদার ক্রম-বিন্যাসকে তিনি নিতান্তই আপতিক, শুধুই ব্যবহারিক বলে মনে করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল এক এবং অদ্বিতীয় পরমপুরুষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পুণ্যচেতা ব্রাহ্মণ এবং পবিত্র-হৃদয় শূদ্রের মধ্যে কোনও তফাৎ থাকতে পারে না।[১৩২] তিনি এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন যে লাতিন খ্রীষ্ট ধর্মের দ্বৈতবাদী পরিবেশের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদ মাথা তুলতে চেয়েছে তার পক্ষে ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত ব্যক্তি-নির্ভর প্রেরণার উর্ধ্বে ওঠা সম্ভবপর হয়নি, আর ব্যক্তির পক্ষেও সামাজিক দায়-দায়িত্বের বন্ধন ছিন্ন করে স্বমহিমায় পূর্ণ বিকশিত হওয়া অসম্ভব থেকে গেছে। কিন্তু হিন্দুরাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল এমন রাষ্ট্র যা সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে মহত্তর এক সত্তা অর্জন করেছে। তারই উদার দাক্ষিণ্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব অবিরত মহত্তর সামাজিক কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধিত হয়েছে, সক্ষম হয়েছে বিশ্বগত ভাবনায় ভাবিত হতে। খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের মতো হিন্দুধর্ম কখনোই একটা বিশেষ মতবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি, প্রথমাবধি তা বহুবিচিত্র ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও সংস্কৃতির এক সুষম সমন্বয় হয়েই আছে। আর এমন এক ধর্মের প্রচ্ছায়ে স্থিত বলে হিন্দু সমাজও বিশেষ একটা মানব-গোষ্ঠীর আধার-মাত্র হয়ে থাকেনি, তাকেই আশ্রয় করে উন্মীলিত হয়েছে সংখ্যাতীত বিচিত্র-ধর্মী মানুষ।

কাশীপ্রসাদ জয়শওয়াল, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো পণ্ডিতবর্গ প্রায় এক প্রজন্ম ধরে গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার

মধ্যে আরও বহু শ্লাঘনীয় গুণাবলী আবিষ্কার করেছেন, পশ্চিমের সমধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখাতে চেয়েছেন। এঁদের অনুসন্ধান-লব্ধ তথ্য প্রাচীন ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করারও চেষ্টা করেছে। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিকতা মাঝে মাঝেই স্বদেশীমন্ত্রের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, বৈজ্ঞানিকের স্বচ্ছ-দৃষ্টিও কখনো কখনো মলিন হয়ে গেছে জাতীয় অভিমানের স্পর্শে। তবে এর জন্য দায়ী ভারতীয়দের আত্ম-শাসনের যোগ্যতা সম্পর্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায় সংশয় প্রকাশ। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নিউটনের 'থার্ড ল অফ মোশন'-এর মতো কাজ করেছে ভারতীয় আত্মাভিমান ও অতিশোয়োক্তি। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষের বিস্মৃত-প্রায় গরিমা-উন্মোচনের ইতিবৃত্ত যদি শুধুই অতিরঞ্জন-ভরা বলে মনে করা হয় তবে জার্মান 'মার্ক' সম্পর্কে ফ্রীম্যানের তত্ত্ব বা 'উইটেনাগেমট' থেকে পার্লামেন্টের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ বিষয়ে বিশপ স্টাব্স-এর মতও একই দোষে দোষী বলে বিবেচিত হবে। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় একটা কালোপযোগী কিন্তু কিছুটা কল্পনাশ্রয়ী ঐতিহাসিক তত্ত্বের দ্বারা পর্যালোচিত হয়ে থাকে, আর ভারতবর্ষে তারই স্বাভাবিক প্রভাবে চরমপন্থীরা শুধু ম্যানচেষ্টারে তৈরী বস্ত্রবর্জনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হননি, ওয়েষ্টমিন্স্টারকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের আদর্শকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১। ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত যে সব কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছিল তার মোট প্রতিনিধি ১৩,৮৩৯-এর মধ্যে শতকরা চল্লিশভাগ ছিলেন আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত, নয় ভাগ সাংবাদিক, চিকিৎসক ও শিক্ষক। প্রায় চল্লিশভাগ ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং সাত ভাগেরও কম মুসলমান—পি· সি· ঘোষ, দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস, ১৮৯২-১৯০৯, (কলকাতা, ১৯৬০), পৃঃ ২৩-২৫; জন ম্যাকলেন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম অ্যাণ্ড দ্য আরলি কংগ্রেস (প্রিন্সটন, ১৯৭৭), পৃঃ ৫৪ ও পরবর্তী।

২। ক্রশকে ল্যান্সডাউন, ২৮শে জানুয়ারী, ১৮৯১; ল্যান্সডাউন পেপারস, Eur. Mss. D 558/IX/III no.5

৩। হ্যামিলটনকে এলগিন, ২৫শে অগষ্ট, ১৮৯৬, এলগিন পেপারস, Eur. Mss. F 84/14 নং ৩৪। কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করার পরামর্শ তিনি অগ্রাহ্য করেন। ঐ, ২৭শে জুলাই, ১৮৯৭।

৪। কার্জনকে হ্যামিলটন, ২০শে অক্টো, ১৮৯৯, হ্যামিলটন পেপারস, Eur. Mss. C 126/1, পৃঃ ৩৩১-৬২। হ্যামিলটনের মতে এঁরা কেউই অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ প্রশাসক ছিলেন না, ছিলেন আরাম-কেদারার আলস্যে অভ্যস্ত আমলা মাত্র। ঐ, ১ মে, ১৯০২, তদেব, C 126/4, পৃঃ ১৮৯

৫। জে নিউটন, ডবল্যু· এস· কেইন, এম· পি· পৃঃ ২৪৩-৪৪

৬। স্যামুয়েল স্মিথ, মাই লাইফ ওয়ার্ক, পৃঃ ৪৪২-৪৩

৭। বি· আর· নন্দ, গোখ্‌লে, দ্য ইন্ডিয়ান মডারেটস অ্যাণ্ড দ্য ব্রিটিশরাজ (দিল্লী, ১৯৭৯), পৃঃ ১৭৩

৮। হার্টিংটনকে রিপন, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৮১, রিপন পেপারস, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, I. S. 290/5, নং ৭০

৯। ভারতসরকারের ডেসপ্যাচ, ৬ই নভেম্বর, ১৮৮৮, হোম পাবলিক, নং ৬৭, ১৮৮৮

১০। প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-সংস্কারের প্রস্তাবের উপর ল্যান্সডাউনের নোট, ৪ঠা মে, ১৮৮৯; ক্রশকে ল্যান্সডাউন, ৬ই মে, ১৮৮৯, ক্রশ পেপারস, Eur. Mss. E 243/26, পৃঃ ১৭২

১১। ডাফরিনকে ক্রশ, ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৮৮, তদেব, খণ্ড ১৮, পৃঃ ২২৪-২২৭

১২। রিপনের মিনিট, ১০ সেপ্টে· ১৮৮৪, রিপনকে কিম্বারলে, ৪ এপ্রিল, ১৮৮৪, Add. Mss. 43, 525, ff 33-34. ঐ, ২২শে মে, ১৮৮৪, তদেব, ff 75-79.

১৩। ল্যান্সডাউনকে কিম্বারলে, ৯ই জুন, ১৮৯৩, ল্যান্সডাউন পেপারস, Eur. Mss. D. 558/IX/V, পৃঃ৪৪

১৪। হ্যামিলটনকে কার্জন, ২৩শে এপ্রিল, ১৯০০ Eur. Mss. D 510/5, পৃঃ ৭, হ্যামিলটনও সমভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কার্জনকে হ্যামিলটনের চিঠি, ১৭ই মে, ১৯০০, Eur. Mss. C 126/2, পৃঃ ১৬৯

১৫। ল্যান্সডাউনকে ক্রশ, ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৯০, Eur. Mss. E/243/19, পৃঃ ২৩৬, ৭ই মার্চ, ১৮৯০, তদেব, পৃঃ ২৬০-৬১। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছিল, 'রাজনীতির দ্বিধা' (১৮৯৩), রাজা-প্রজা।

১৬। কার্জনকে হ্যামিলটন, ১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৯, Eur. Mss. C 126/1, পৃঃ ৯২

১৭। ঐ, ৯ই জানুয়ারী, ১৯০১, তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯

১৮। ধর্ষিতা স্ত্রীলোকটির ব্যাপারে এবং ৯ নং 'ল্যান্সার' সংক্রান্ত ঘটনায় (দুজন সেনা কর্তৃক একজন পাচককে নৃশংসভাবে হত্যা) কার্জন যে সমস্ত কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা 'ফুলার'-এর ব্যাপারে লিটনের প্রতিক্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। 'বেইন'-এর ঘটনায় (যাতে আসামের চা বাগিচার ম্যানেজার ও একজন কুলি জড়িত ছিল) কার্জনের সহানুভূতি পেয়েছিল হতভাগ্য কুলিটি। দ্রষ্টব্য: হ্যামিলটনকে লেখা কার্জনের চিঠি, ৯ই সেপ্টে: ১৯০৩, Eur. Mss. D 510/14, পৃঃ ৩১২-১৩। অভিযুক্তদের সকলেই ছিলেন সেনাবিভাগ বা প্ল্যান্টার শ্রেণীভুক্ত। এই সব অন্যায়-অবিচারে ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'রাজা-প্রজা'র অন্তর্গত

'অপমানের প্রতিকার' শীর্ষক নিবন্ধটিতে। কুলি নিয়োগের 'ঠিকা' বা চুক্তিপত্রগুলির প্রকট অসাধুতা, আসামের চা-বাগিচাগুলিতে কুলি-নির্যাতন এবং এই অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য প্রবর্তিত ১৮৮২ খ্রীঃ ১ নং আইনের অকার্যকারিতা সম্পর্কে বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : ডবল্যু· আর· এল, 'দ্য কনডিশনস অফ লেবারারস ইন দ্য প্লান্টেশনস অফ আসাম', ২০শে অগষ্ট, ১৮৮৮; ক্রশকে লেখা ডাফরিনের চিঠিতে অন্তর্ভুক্ত, ২৪শে অগষ্ট, ১৮৮৮, Eur. Mss. E 243, Vol XXV

১৯। রিপোর্ট অফ দ্য নাইন্‌থ ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস (লাহোর, ১৮৯৩), পৃঃ ১৪১-৪২।

২০। ল্যান্সডাউনকে কিম্বারলে, ১২ অক্টো, ১৮৯৩, কিম্বারলে পেপারস, PC/E/18a

২১। হ্যামিলটনকে কার্জন, ২৩শে এপ্রিল, ১৯০২, Eur. Mss. D 510/10, পৃঃ ৪৫২ ; ক্রানবোর্নকে কার্জন, ১৮ নভেম্বর, ১৯০১,'লেটারস্ অ্যান্ড টেলিগ্রামস, ইংলণ্ড অ্যান্ড অ্যাব্রড'.১৯০১-০৪, ব্রিঃ মিউঃ

২২। হ্যামিলটনকে কার্জন, ১৫ই অক্টো, ১৯০২, Eur. Mss. D 510/12, পৃঃ ৯৯

২৩। ঐ, ২২শে জুলাই, ১৯০৩, Eur. Mss. D 510/13, পৃঃ ১৯৯

২৪। গভর্নর জেনারেলকে ভারত সচিব, ৩১শে মার্চ, ১৮৯৪, পার্লামেন্টারী কালেকশন নং ২৭৬, রেভিন্যু নং ৬৫, পৃঃ ২২২, ঐ ১৩ ডিসেঃ, ১৮৯৪, তদেব, রেভিন্যু নং ১৬৯, পৃঃ ২৩০-৩১

২৫। লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রোসিডিংস, ১৮৯৪, ৩৩তম খণ্ড, পৃঃ ৩৮১-৮৪

২৬। 'মারাঠা', ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪ , 'বেঙ্গলী', ২২শে ডিসেঃ, ১৮৯৪ , 'ইন্দু প্রকাশ', ৩১শে ডিসেঃ, ১৮৯৪ ; 'অমৃতবাজার পত্রিকা', ২৯শে ডিসেঃ, ১৮৯৪

২৭। আর্থার বেডফোর্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার মার্চেন্টস অ্যাণ্ড ফরেন ট্রেড, Vol. 2, P 41, এলগিনকে ফাউলার, ২, ৮, ১১ ও ২৫ জানুয়ারী ও ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৫, এলগিন পেপারস্

২৮। ভারত সচিবকে গভর্নর জেনারেলের তার, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬, পার্লামেন্টারী কালেক্সনস্, নং ২৭৬ পৃঃ ২৯৭

২৯। 'মারাঠা', ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬ , 'বেঙ্গলী' পত্রিকার ঐকমত্য লক্ষণীয়, 'বেঙ্গলী', ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬

৩০। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ডি· ই ওয়াচার বক্তৃতা, ১৯০২, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিবরণী, ১৯০২, পৃঃ ১৪২-৪৩

৩১। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, স্পীচেস (২য় সংস্করণ, মাদ্রাজ, ১৯১৬), পৃঃ ৭৭

৩২। 'কেশরী', ১৭ই মার্চ, ১৮৯৫, ও ২৮শে জানুয়ারী, ১৮৯৬ , রাজা-প্রজার অন্তর্গত 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ একটা চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন।

৩৩। 'মারাঠা', ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬

৩৪। 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া', ১৭ই মার্চ, ১৮৯৬। বাংলায় ইতিমধ্যেই (১৮৯০) স্বদেশী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। 'কনফিডেনশিয়াল অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্য ভার্নাকুলার নিউজ পেপারস্ পাবলিশড্ ইন দ্য লোয়ার প্রভিন্সেস অ্যাণ্ড আসাম ইন ১৮৯১'

৩৫। স্বরাষ্ট্র (পাবলিক) কনফিডেনশিয়াল, অক্টো, ১৮৯৯, Progs 29 (Deposit) পৃঃ ১৪। ১৭ই মে, ১৮৯৬ সালে 'মারাঠা' পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলন প্রসূত প্রত্যক্ষ ফলগুলির উল্লেখ করে। শুধু বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে স্থাপিত হয়েছিল ১৩টি নতুন কাপড়ের কল। স্বদেশী বস্ত্র উৎপাদনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহও কম ছিল না।

৩৬। ব্রডরিককে কার্জন, ২৮শে অক্টোবর, ১৯০৩, লেটারস টু দ্য সেক্রেটারী অফ স্টেট ইত্যাদি, ১৯০৩, ব্রিঃ মিউঃ

৩৭। পার্লামেন্টারী পেপারস, ১৮৯৯ (হাঃ অফ কমঃ) ৬৬ তম খণ্ড, সি ৯২৮৭: ২৫শে অগষ্ট, ১৮৯৮ ও ২৬শে জনুয়ারী, ১৮৯৯-এর ডেসপ্যাচ।

৩৮। হ্যামিলটনকে কার্জন, ২৮শে জুন, ১৮৯৯, Eur. Mss. D 510/2, পৃঃ ৫৮

৩৯। পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, 'দ্য ইণ্ডিয়ান সুগার ডিউটিজ' (কল, ১৮৯৯)

৪০। 'মারাঠা', ২৫শে মে এবং ৮ই জুন, ১৯০২ ; 'কেশরী', ৩রা জুন, ১৯০২

৪১। ব্রডরিককে কার্জন, ১৫ই নভেম্বর, ১৯০৩, লেটার্স টু দ্য সেক্রেটারী অফ স্টেট, ১৯০৩, ব্রিঃ মিঃ

৪২। কার্জনকে হ্যামিলটন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১, Eur. Mss. C 126/3, পৃঃ ৪৯

৪৩। ঐ, ১৬ই সেপ্টেঃ ১৯০৩, Eur. Mss. C 126/5, পৃঃ ৩২৯

৪৪। পুরোনো বন্ধুর এই কোপন স্বভাব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীও দার্শনিকসুলভ নির্লিপ্ততায় সহ্য করতেন। কার্জনকে ব্যালফুর, ১২ই ডিসেঃ, ১৯০২, ও ১৫ই জুন, ১৯০৩, ব্যালফুর পেপারস, Add Mss 49732 ব্রিঃ মিঃ

৪৫। ব্যালফুরকে কার্জন, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩, তদেব

৪৬। ঐ, ৩১শে মার্চ, ১৯০২, তদেব

৪৭। হ্যামিলটনকে কার্জন, ২৮শে মে, ১৯০২, হ্যামিলটন পেপারস, ২৩ খণ্ড, নং ২৪। কার্জনকে লেখা হ্যামিলটনের চিঠিতে (২৫শে জুন, ১৯০২) একটা মনঃসমীক্ষার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তদেব, সংখ্যা ৩৩।

৪৮। হ্যামিলটনকে কার্জন, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯০০, Eur. Mss D 510/4, পৃঃ ৭৩ ও পরবর্তী

৪৯। ব্যালফুরকে কার্জন, ৪ঠা জুন, ১৯০৩, Add Mss.49732, ব্রিঃ মিঃ, f 73। হ্যামিলটনকে কার্জন, ৪ঠা জুন, ১৯০৩, Eur Mss.D 510/14, পৃঃ ৬৫ ও পরবর্তীতে পাই "আমাদের শিক্ষাদর্শের বীজ যার মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্যের ধারণা নিহিত আছে, তা-ই ভারতীয় মানসে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে এবং তার ফসল ফলতেও বেশী দেরী হবে না।"

৫০। ব্যালফুরকে কার্জন, ৩১শে মার্চ, ১৯০১, পৃঃ উঃ, এফ· ৭৪

৫১। হ্যামিলটনকে কার্জন, ১২ই সেপ্টেঃ ১৯০০, Eur, Mss. D 510/15, পৃঃ ৩৮১ ও পরবর্তী।

৫২। ঐ, ১৮ই নভেম্বর, ১৯০০, তদেব, Eur. Mss D 510/6, পৃঃ ২৯৩-৯৪

৫৩। হ্যামিলটনকে কার্জন, ৯ই মার্চ, ১৮৯৯, Eur. Mss. D 510/1, পৃঃ ১৩৭

৫৪। ঐ, ১৬ই মার্চ, ১৮৯৯, তদেব, পৃঃ ২১১ ও পরবর্তী

৫৫। সিমলায় কার্জন-প্রদত্ত ভাষণ, ১লা সেপ্টেঃ, ১৯০১, অন্তর্ভুক্ত ঐ, ৪ঠা সেপ্টেঃ ১৯০১, Eur. Mss D 510/17, পৃঃ ৩৪১-৫৬। কিন্তু হান্টার কমিশনের পরবর্তী সবকারী নীতিও এজন্য নিন্দার্হ। এ বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাবে Secretary of State-কে পাঠানো ডেসপ্যাচে (সংখ্যা ৬৪, ১৫ই মার্চ, ১৮৮৭) ও রেজল্যুশনে (নং ১০/৩০৯ ; তাং ২৩শে অক্টো, ১৮৮৪, হোম ডিপার্টমেন্ট)। এই প্রস্তাবে যে বার্ষিক রিপোর্ট চাওয়া হযেছিল তা ইংলণ্ডে আসতে শুরু করে ১৮৮৮ খ্রীঃ থেকে। এই দলিলগুলির সঙ্গেই বাংলার ডি· পি· আই সাব আলফ্রেড ক্রফ্‌ট-এর প্রথম বছবের রিপোর্টটি পাঠ করা বিধেয়। শিক্ষাখাতে সবকার বছরে মাত্র ৭৫ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করায় এ বিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ ছিল অবধারিত। অপর্ণা বসু, দ্য গ্রোথ অফ এডুকেশন অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, ১৮৯৮-১৯২০, (দিল্লী, ১৯৭৪), ২য অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫৬। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ নেশন ইন মেকিং, পৃঃ ১৭৪ ৭৫

৫৭। এ ব্যবস্থা হ্যামিলটনের উপদেশ অগ্রাহ্য করে গৃহীত হয়। কার্জনকে হ্যামিলটন, ১৯শে সেপ্টেঃ, ১৯০১, Eur. Mss. C 126/3, পৃঃ ৩৯৬ ও পরবর্তী। স্যর গুরুদাস ব্যানার্জি পরবর্তীকালে এই কমিশনেব সঙ্গে যুক্ত হযেছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৭৫

৫৮। এন· কে· সিন্‌হা, আশুতোষ মুখার্জি, এ বায়োগ্রাফিকাল স্টাডি (১৯৬৬) পৃঃ ৬১-৬২, দ্রষ্টব্য সিমলা রেকর্ড, ১, ১৯০৪, ভাবতসরকার, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, এডুকেশন-এ। ইউবোপীয় ও ভারতীয় ফেলোর অনুপাত, ১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। তদেব, পৃঃ ৬৭-৬৮। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে অ্যাক্ট এইট অফ নাইন্টিন হানড্রেড অ্যাণ্ড ফোর, সেক্‌সন ৬(১)—৬ (৪) দ্রষ্টব্য। ভারত সরকারের কাউন্সিলের প্রোসিডিংস, খণ্ড XLIV, এপ্রিল, ১৯০৫—মার্চ, ১৯০৬, পৃঃ ৪৩

৫৯। কার্জনের মন্তব্য, ২০শে জুলাই, ১৯০২, এডুকেশন-এ, ডিসেম্বর, ১৯০২, প্রোসিডিংস ৬৭-৬৮

৬০। টি· ভি· পরবতে, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে, পৃঃ ১৬১-৬৬। লাজপত রাযের অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার বিবরণ পাওয়া যাবে র‍্যালে কমিশনে তাঁর স্মারক-লিপিতে, 'দ্য ট্রিবিউন', ১লা ও ৩রা মে, ১৯০২

৬১। 'জাতীয় শিক্ষা' শব্দটি সম্ভবত প্রথম ব্যবহৃত হয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে 'হিন্দু কলেজ পাঠশালা' প্রতিষ্ঠার সময়, (জুন, ১৮৩৯)। জেনারেল রিপোর্ট অন পাবলিক ইনস্‌ট্রাকশন ইন দ্য লোয়ার প্রভিন্সেস অফ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী ফর ১৮৪৩-৪৪। এ বিষয়ে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ১৮৪০ খ্রীঃ 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৪৬ সালে 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' স্থাপনের সময়। উনিশ শতকের শেষের দিকে রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস ব্যানার্জি এবং রবীন্দ্রনাথকেও জাতীয় শিক্ষাবিষয়ে উদ্যোগী হতে দেখা গিয়েছিল।

৬২। 'ইণ্ডিয়া', ১০ই জুন, ১৯০৪, পৃঃ ২৮১-৮২

৬৩। ব্রডরিককে কার্জন, ২৯শে ডিসেঃ, ১৯০৪, ভারত সচিবকে পত্রাবলী ইত্যাদি ১৯০৪-৫, ব্রিঃ মিঃ, পৃঃ ১৩

৬৪। নৌরজীকে ওয়াচা, ১৫ এপ্রিল, ১৮৯৯, নওরোজি পেপার্স, এন· এ· আই·

৬৫। এন· জি· কেলকর, তিলক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৩

৬৬। জি· জনসন, প্রভিন্সিয়াল পলিটিকস অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম, বোম্বে অ্যাণ্ড দ্য ইণ্ডিয়ান

ন্যাশানাল কংগ্রেস, ১৮৮০-১৯১৫ (কেম্‌ব্রিজ, ১৯৭৩) ও এস· এ· ওলপার্ট, তিলক অ্যাণ্ড গোখ্‌লে : রেভুল্যুশন অ্যাণ্ড রিফর্ম ইন দ্য মেকিং অফ মডার্ন ইণ্ডিয়া (ক্যালিফ, ১৯৬২) দ্রষ্টব্য।

৬৭। জি· এস· খাপার্দে, মারাঠী ভাষায় লেখা তাঁর রোজনামচায় (অপ্রকাশিত) লিখেছেন যে তিলক ১৮৯১ খ্রীঃ-এর বিরোধিতা করেছিলেন। সার্বজনিক সভার কর্তৃত্ব হারানোর ব্যাপারে যোশীকে গোখ্‌লে, ৮ই ফেব্রু, ১৮৯৬, গোখ্‌লে পেপাবস, এন· এ· আই।

৬৮। বিপিনচন্দ্র পাল, 'দ্য ন্যাশানাল কংগ্রেস' (১৮৮৭), পৃঃ ৯

৬৯। তদেব, 'দ্য টেস্ট অফ পেট্রিয়টিজম্‌', নিউ ইন্ডিয়া, ১৭ই জুলাই, ১৯০২

৭০। রবীন্দ্রনাথ, 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৮৯৩), 'রাজনীতির দণ্ড' (১৮৯৩), 'সুবিচারের অধিকার' (১৮৯৪), পরবর্তীকালে 'বাজা-প্রজা' শীর্ষক নিবন্ধে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, (১৩৪৮) বঙ্গাব্দ।

৭১। ভি· সি· যোশী (সম্পাদিত), লাজপত রায়, অটোবায়োগ্রাফিক্যাল রাইটিংস, পৃঃ ৮৬-৯১।"লাজপত রায়, 'দ্য কামিং অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস-সাম সাজেসনস্‌', 'কায়স্থ-সমাচার', নভেম্বর, ১৯০১। ভি· সি· যোশীর মতে এটা ছিল লাজপতের উপর তাঁর কয়েকজন আর্য-সমাজী বন্ধুর, বিশেষ করে রায় মুলরাজেব প্রভাব-প্রসূত। রায় মুলরাজ কংগ্রেসকে শুধু অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে কবতেন না, তাঁর বিচারে কংগ্রেস ছিল জাতীয় স্বার্থেব পরিপন্থী। লাজপত নিজেই কংগ্রেসের আদিপর্বের কাজকর্মের বিশ্লেষণ করে তাকে সাম্রাজ্যিক স্বার্থের নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত একটা প্রতিষ্ঠান বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। ভি· সি· যোশী (সম্পাঃ) লালা লাজপত রায়, পূঃ উঃ, ভূমিকা, পৃঃ ২১-২২। কংগ্রেসে পঞ্জাবী প্রতিনিধিদের মধ্যে আর্য সমাজীদেব সংখ্যা কমে ১৯০১ সালে দাঁড়ায় ৩৩%, ১৯০৪ সাল থেকে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫০% পৌঁছয়। এন· জি· ব্যারিযার, পূঃ উঃ।

৭২। অরবিন্দ, বালগঙ্গাধব তিলক, ভূমিকা, স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অফ তিলক (নটেশন, মাদ্রাজ, ১৯১৮)

৭৩। 'নিউ ল্যাম্পস্‌ ফর ওল্ড' এবং 'ইন্দু-প্রকাশে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপর লেখা ৭টি প্রবন্ধে অরবিন্দ বাংলাকে 'বিপ্লবের লীলাভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে বাংলাই ভারতের এথেন্স, ভারতের ফ্রান্স।'ইন্দু-প্রকাশ', ৩০শে অক্টোঃ, ১৮৯৩, এবং ২৭শে অগষ্ট, ১৮৯৪। তিলকের 'বক্তৃতা-মালা ও প্রবন্ধাবলী'ব ভূমিকাতে অববিন্দ লিখেছিলেন 'সাধারণভাবে আদর্শবাদী ও ভাবপ্রবণ বাঙালী ছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে বৈপ্লবিক অনুভূতি প্রায় আর কারোর মধ্যে নেই বললেই চলে'। বোম্বাইতে প্রদত্ত (১৯শে জানুয়ারী, ১৯০৮) বক্তৃতাটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তুলনীয়—Jules Michelet, Le Peuple. অনুবাদ : সি· ককস, পৃঃ ২৪০-৪৪।

৭৪। বি· জি· তিলক, 'জার্নি টু ম্যাড্রাস, সিলোন অ্যাণ্ড বর্মা' (মারাঠা), পৃঃ ৩ (ওলপার্টের তিলক অ্যাণ্ড গোখ্‌লে ইত্যাদিতে উল্লিখিত, পৃঃ ১৩৫); ভারত-ধর্ম মহামণ্ডলে তিলক-প্রদত্ত ভাষণ, তদেব, পৃঃ ১৭৮-৭৯

৭৫। বিবেকানন্দ, দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস্‌, পূঃ উঃ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭। তিলক মনে করতেন এই ঔপনিষদিক হিন্দুত্ব শুধু উচ্চশিক্ষিতদেরই আকৃষ্ট করবে, সাধারণ লোকের জন্য চাই গণপতি পূজা ও রামদাস।'মারাঠা', ২০ সেপ্টেঃ, ১৮৯৬।

৭৬। বিপিনচন্দ্র, কম্পোজিট পেট্রিয়টিজম,'নিউ ইণ্ডিয়া', ২৭শে মে, ১৯০৫। স্বদেশী অ্যাণ্ড স্বরাজ, পৃঃ ১১-১২, ১৬, ১৭।

৭৭। লাজপত রায়, অটোবায়োগ্রাফিক্যাল রাইটিংস; পূঃ উঃ, পৃঃ ২৬-২৮

৭৮। জে· রীড-গ্রাহাম, দ্য আর্য সমাজ অ্যাণ্ড এ রেফরমেশন ইন হিন্দুইজম উইথ স্পেসিফিক রেফারেন্স টু কাস্ট, পৃঃ ৪৩১

৭৯। সোফিয়া, ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭, পৃঃ ১১ ; রামকৃষ্ণের বিরূপ সমালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, তদেব, অক্টো, ১৮৯৭

৮০। তদেব, জুলাই, ১৮৯৭

৮১। ১৯০১ সালে 'দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীতে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য

৮২। হিন্দুধর্ম বিষয়ে অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রহ্মবান্ধব প্রদত্ত বক্তৃতার (১৯০৩) জন্য 'দ্য ব্লেড' পৃঃ ১১৪ ও পরবর্তী এবং 'বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি', অগষ্ট, ১৯০৬ দ্রষ্টব্য।

৮৩। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ইউরোপীয়ান ডোমিনিয়ন, 'সোফিয়া' ১৮ই অগষ্ট ১৯০০, পৃঃ ৬-৭

৮৪। ঐ, 'দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী', জানুয়ারী, ১৯০১, পৃঃ ১

৮৫। ঐ সময়ে ব্রহ্মবান্ধবকেও শ্রীকৃষ্ণভাবে অভিভূত হতে দেখা গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, সাহিত্য সংহিতা, ৫ম খণ্ড, ১৩১১ বঙ্গাব্দ। ডেভিড কফ বলেছেন সমধর্মী ক্যাথলিক ও পোপের ব্যবহার তাঁকে হিন্দু জাতীয়তাবাদীতে রূপান্তরিত করে। দ্য ব্রাহ্ম সমাজ অ্যাণ্ড দ্য শেপিং অফ মডার্ন ইণ্ডিয়া মাইণ্ড (প্রিন্সটন, ১৯৭৯), পৃঃ ২০১ ও পরবর্তী।

৮৬। অরবিন্দ, অন হিমসেলফ্ ইত্যাদি, পৃঃ ১৮-১৯

৮৭। ঐ, পৃঃ ৩৩। ম্যাৎসিনী সুরেন্দ্রনাথকেও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কিন্তু 'রিসরজিমেন্টো'র নেতা এবং 'কার্বোনারী'র বৈপ্লবিক ভূমিকা বিষয়ে নরমপন্থীরা ইচ্ছে করে নীরব থাকলেও, চরমপন্থীদের এ বিষয়ে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হতে দেখা গিয়েছিল। বাংলায় ম্যাৎসিনী এবং গ্যারিবল্ডীর যে জীবনী যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ লিখেছিলেন তা তরুণ সমাজে পরমাদৃত হয় এবং সন্ত্রাসবাদীদের বহু ব্যায়ামাগারে গ্রন্থগুলি পাওয়া যেতো। সিডিশন কমিটি রিপোর্ট, পৃঃ ১৭। লাজপত রায় উর্দু ভাষায় ম্যাৎসিনীর যে জীবনী লিখেছিলেন তা পঞ্জাব সরকারের সন্দেহের কারণ হয়ে ওঠে।

৮৮। উদ্ধৃতিগুলি ৭ই অগষ্ট, ১৮৯৩—৫ই মার্চ, ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত 'ইন্দু-প্রকাশে'র বিভিন্ন সংখ্যা থেকে গৃহীত। রানাডে এজন্য বিরক্ত হন এবং প্রকাশককে সতর্ক করে দেন, আর অরবিন্দকে দেন কারা-সংস্কার বিষয়ে লেখার উপদেশ। অরবিন্দ, কারাকাহিনী, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৪৪-৪৫।

৮৯। মৃণালিনীদেবীকে অরবিন্দ, ৩০শে অগষ্ট, ১৯০৫। জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের (ন্যাশানাল কলেজ) ছাত্রদের কাছে বিদায় সম্ভাষণে তিনি তাঁর বাল্যকাল থেকে যে ব্রত পালনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন তার উল্লেখ করেন।

৯০। ১৬ই জুলাই থেকে ২৭শে অগষ্টের মধ্যে 'ইন্দুপ্রকাশে' অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ৭টি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৫৪ সালে সেগুলি গ্রন্থাকারে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়। উদ্ধৃতিটি 'ইন্দুপ্রকাশে' (২৭শে অগষ্ট, ১৮৯৪) প্রকাশিত 'আওয়ার হোপ ইন ফিউচার' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

৯১। শ্রীঅরবিন্দ অন হিমসেলফ্ ইত্যাদি, পৃঃ ৩০, ৩৫। বাংলাদেশে বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করে দেওয়ার পরেই যে ১৯০২-৩ সালে ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে যোগ দেন তা প্রমাণ করার জন্য ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মূল পাঠটির ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। বি· বি· মজুমদার, মিলিট্যান্ট ন্যাশানালিজম ইন ইণ্ডিয়া (কল, ১৯৬৬), পৃঃ ৯৯।

৯২। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে সমিতির সংযোগের বিষয়টি কৌতূহল-উদ্দীপক। ১৯০১ সালে ক্রোপট্‌কিন (Kropotkin)-এর প্রভাবে আসার ফলে তিনি গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েন। নিবেদিতা লিখেছেন, "আগের থেকে আমি এখন অনেক বেশী করে হিন্দু, কিন্তু রাজনীতির প্রয়োজনটাও যে আমি অত্যন্ত স্পষ্ট করে অনুভব করছি।" ১৯০২ সালে ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং ঐ জাপানী পণ্ডিতের গ্রন্থ আইডিয়ালস অফ দ্য ইষ্ট তিনিই সম্পাদনা করেন। এর ভূমিকাটাও তাঁর লেখা। ১৯০২ সালের জুলাই মাসে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবসান ঘটে। ঐ বছরে ২০শে অক্টোবরে বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। অরবিন্দ এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লিখেছেন, "আমরা রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা বলেছিলাম।" নিবেদিতার লেখা কালী দ্য মাদার গ্রন্থটি নিয়েও তাঁদের আলোচনা হয়েছিল। পি· মিত্রের নেতৃত্বাধীনে বোম্বাই এবং বরোদাকে একটা কেন্দ্রীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার প্রয়াসী হলে তাতে নিবেদিতাকে অন্তর্ভুক্ত করার কথাও অরবিন্দ ভেবেছিলেন। (শ্রীঅরবিন্দ অন হিমসেলফ্ ইত্যাদি, পৃঃ ১১৬)। নিবেদিতার জীবনীকার লিজেল রেমঁ অনুশীলনের গোপন কার্যকলাপের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগের কথা লিখেছেন। কিন্তু অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন সমিতির প্রথম পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যা তিনি ছিলেন না। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আবার এর প্রতিবাদ করেছেন। উভয়ে অবশ্য যুগান্তর দলের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক অস্বীকার করেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৪৯)। তবে এ সময়ে সমিতিতে প্রায়ই নিবেদিতাকে দেখা যেতো। সদস্যদের সামনে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিপ্লব-সম্পর্কে যে সব বই-পত্র ছিল সেগুলিও তিনি সমিতির গ্রন্থাগারে দান করেন। মাদাম লিজেল রেমঁ (Madame Lizelle Reymond) এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে নিবেদিতাই অরবিন্দকে প্রকাশ্য রাজনীতিতে আনেন। কিন্তু এই মত তথ্যানুগ নয়। সন্দেহ নেই, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতিতে যাঁদের আগ্রহ ছিল আন্তরিক তাঁদের সকলের প্রতি নিবেদিতার অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। ১৯০৬ সালের পর নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা, সিস্টার নিবেদিতা (১৯৬১) ৩৭ তম অধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু (সম্পাদিত) লেটার্স অফ সিস্টার নিবেদিতা, দুই খণ্ড ও নিবেদিতা লোকমাতা, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৯৩। হেমচন্দ্র কানুনগো, বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা গ্রন্থে এই সময়কার বিপ্লবী-সংস্থাগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের বিবরণ আছে, পৃঃ ১৯-২২, ৩৭, ৩৮। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি (পৃঃ ১৯৮)তে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে অরবিন্দ সাময়িকভাবে বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেও বারীন্দ্রের অপপ্রচার ও কুৎসা রটনায় বিক্ষুব্ধ পি· মিত্র অন্যায়ভাবে যতীনকে দল থেকে সরিয়ে দেন। উভয় গ্রন্থকারই দলে এ ভাঙনের জন্য বারীন্দ্রকে দোষ দিয়েছেন।

৯৪। এইটেই ছিল রাওলাট কমিটি-কৃত 'ভবানী মন্দিরে'র ব্যাখ্যা। কমিটির মতে বইটি ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপপ্রয়োগের একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। হেমচন্দ্র কানুনগো এই ব্যাখ্যাটা মেনে নিয়েছেন। অরবিন্দের প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা (১৯০২-০৪) ব্যর্থ হয় কারণ তা ছিল বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রয়াস, এ কারণেই তিনি দ্বিতীয় উদ্যোগটিতে ধর্মের একটা আবরণ দিতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দ স্বয়ং বইটার উপর বেশী গুরুত্ব দিতে চান নি। সমস্ত ব্যাপারটা ছিল বারীন্দ্রের মস্তিষ্ক-প্রসূত, এবং এর বাস্তবায়নে তাঁর বিশেষ চেষ্টা ছিল না, পবিকল্পনার ব্যর্থতাও তাঁকে বিমর্ষ করেনি।

৯৫। এম জি· রানাডে, মিস্লেনিয়াস রাইটিংস, পৃঃ ৭০-৮৬। আর· জি· ভাণ্ডারকরের 'এ নোট অন দ্য এজ অফ ম্যারেজ অ্যাণ্ড ইটস কনসামেশন অ্যাকরডিং টু হিন্দু রিলিজিয়াস ল' দ্রষ্টব্য।

৯৬। ১৮৯০ এর জুলাই মাসে বাংলা দেশে একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা সমস্যাটা তুলে ধরে। জনৈক হরিমোহন মাইতি তাব এগার বছবের স্ত্রী শ্রীফুলমণির সঙ্গে জোর করে সহবাস করতে গেলে তার মৃত্যু ঘটে ও হবিমোহন দায়বা সোর্পদ হয়। তখনকার আইনে তা ধর্ষণ বলে গণ্য হতো না। স্বামীর মাত্র এক বছরেব জেল হয়। কিন্তু বালিকা বধূদের রক্ষার্থে আইনেব প্রসঙ্গ জোরদাব হয়। ল্যান্সডাউনের মন্তব্য, ১৫ই সেপ্টেঃ, ১৮৯০, হোম, জুডিসিয়াল প্রোসিডিংস অক্টো, ১৮৯০, নং ২১০-১৩। বিদ্যাসাগর বাল্য-বিবাহেরেই বিবোধী ছিলেন। ১৮৬০ সালে যে সহবাস-সম্মতি আইন পাশ হয় তাতে দশ বছরের কম বযসী বধূদের সঙ্গে সহবাস ধর্ষণ বলে পরিগণিত হতো। এখন তাঁর মত জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোনও বযস নির্ধারণ না কবে প্রথম রজোদর্শনের উপর গুরুত্ব দেন ও তাব আগে সহবাস নিষিদ্ধ করার উপদেশ দেন। তিনি স্পষ্টই বলেন এ আইন শাস্ত্রবিরোধী হবে না। গর্ভাধানের অজুহাত তিনি লোকাচাব বলে উড়িয়ে দেন। অমলেশ ত্রিপাঠী, বিদ্যাসাগর দ্য ট্রাডিশনাল মডার্নাইসার (লংম্যান, ১৯৭৪), পৃঃ ৬৯। 'এজ অফ কনসেন্ট বিল' বাংলাতেও প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল ; কিন্তু 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতিলাল ঘোষ এবং 'বঙ্গবাসী'ব যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ছাড়া অন্যান্য চরমপন্থীদেব এ বিষয়ে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব প্রমুখের বিরোধিতা রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত করেছিল। এককভাবে রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে স্বাস্থ্যের কারণে মেয়েদের পক্ষে বাল্য-বিবাহ অশুভ, কিন্তু আইন করে এই প্রথা রদ কবার চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়, কেন না দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক অবস্থাই এর অবলুপ্তি ঘটাবে। 'হিন্দু-বিবাহ' (১২৯৪ বঙ্গাব্দ),'সমাজ', রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০ম খণ্ড (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ)।

৯৭। ক্রশকে ল্যান্সডাউন, ১৪ই ও ২১শে জানুয়ারী, ১৮৯১, Eur. Mss.E 243/3D পৃঃ ১৮ ; কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী, ঐ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১, তদেব, পৃঃ ৩২

৯৮। গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদ, Progs, 1891, পৃঃ ৮৩।

৯৯। পালান্ডে (Palande) (সম্পাদিত) দামোদর এইচ চাপেকর, আত্মজীবনী, সোর্স মেটিরিয়াল ফর এ হিস্ট্রী অফ দ্য ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭৯-৮০, ৯৮৫

১০০। ১৮৯৫ খ্রীঃ কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ রানাডের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রশংসা করে বলেছিলেন "তাঁরই জন্য আমরা একটা গভীর সঙ্কট থেকে মুক্ত হয়েছি—যে সঙ্কট আমাদের সর্বনাশ ঘটাতে পারতো।"

১০১। ওলপার্ট, পৃঃ উঃ, ৩য় অধ্যায়

১০২। বিবেকানন্দ, কালী দ্য মাদার

১০৩। নিবেদিতা, কালী দ্য মাদার (২য় সংস্করণ, ১৯৫৩), পৃঃ ৫৪-৫৫, এবং দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম (দ্য স্বামী অ্যাণ্ড মাদার ওয়ারশীপ)

১০৪। শক্তি-প্রতীক-তত্ত্ব সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায় বিপিনচন্দ্রের দ্য সোল অফ ইণ্ডিয়াতে ; পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৬২-৯৪

১০৫। আর. ক্যাশম্যান, দ্য পলিটিক্যাল রিক্রুটমেন্ট অফ গড গণপতি, (ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিস্ট্রী রিভ্যু), সপ্তম খণ্ড (১৯৭০)

১০৬। তিলক, 'কেশরী', ৮ই সেপ্টেঃ, ১৮৯৬

১০৭। এই বিক্ষোভের ভাষ্যকার ডি· এফ· ম্যাকক্রোকেন, ৯ই অগষ্ট, ১৮৯৩, স্বরাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশনা, ১৮৯৪, Part B, Progs No-309-414; দ্রষ্টব্য জে· পি· হিওয়েট, ১২ই অগষ্ট, ১৮৮৯, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পুলিশ, সেপ্টেঃ, ১৮৮৯, Progs. No 12 B. । রবীন্দ্রনাথেব 'রাজা-প্রজা'য় অন্তর্ভুক্ত 'সুবিচারের অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়টির বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

১০৮। বোম্বাই-এর লাট হ্যারিস প্রথমে যাই বলুন, পরে এক গোপনীয় চিঠিতে মুসলমানদের দায়ী করা হয়। Bombay Confidential Despatch to Secy. of State, ২৬শে অক্টো, ১৮৯৩

১০৯। উত্তর প্রদেশের লাট ম্যাকডোনেল মুসলমানদের দায়ী করেছিলেন এবং আমলারা তাদের পক্ষপাতী ছিল বলেছেন, ল্যান্সডাউনকে ম্যাকডোনেল, ৪ঠা অগষ্ট, ১৮৯৩, ল্যান্সডাউন পেপারস : Eur. Mss. D 558/IX, Vol 10, Part I, No 86.

১১০। গোহত্যা বিরোধী আন্দোলনের উপব ল্যান্সডাউনেব নোট, তদেব, Vol XIII; কিম্বাবলেকে ল্যান্সডাউন, ২২শে অগষ্ট, ১৮৯৩, ঐ, Vol V, P. 127। হিন্দু-মুসলমানের এই সংঘাতে খুশী হয়েছিলেন কিম্বাবলে। ল্যান্সডাইনের কাছে তাঁর চিঠি, ২৫শে অগষ্ট, ১৮৯৩, (নং ৫৩), তদেব, পৃঃ ৭৩। গে-হত্যাজনিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরও কিছুকাল চলেছিল, কিম্বারলেকে এলগিন, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪, Eur. Mss.F 84/12

১১১। 'কেশরী,' ১৫ই ডিসেঃ, ২৯শে ডিসেঃ, ১৮৯৬

১১২। হ্যামিলটনকে এলগিন, ২৪শে মার্চ, ও ৩১শে মার্চ, ১৮৯৫, Eur. Mss F 841/14, পৃঃ ২৮১, ২৮৭। ঐ, ৭ই এপ্রিল, ১৮৯৭, তদেব, পৃঃ ৩৮২

১১৩। শিবাজী-উৎসব ও তৎসম্পর্কিত মামলাব বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : চার্জ টু দ্য জুরী ইন দ্য কেস অফ কুইন এম্প্রেস ভাবসাস বি· জি· তিলক অ্যাণ্ড কে· এম· বাল ইন দ্য হাইকোর্ট অফ বম্বে, মাননীয় বিচারক স্ট্রাচি কর্তৃক পরিমার্জিত ও সংশোধিত, পরিশিষ্টসহ। হোম পল (এ) মে, ১৮৯৮, ৩৫৬, এন· এ· আই। তিলককে ভারতীয় দণ্ড বিধির '১২৪ ক' ধারায় নিম্নলিখিত কারণে অভিযুক্ত করা হয় : (১) কবিতার আকাবে শিবাজী বিষয়ে একটা রচনার ('শিবাজীর উক্তি') জন্য, এবং (২) শিবাজী উৎসব উপলক্ষে ১৮৯৭, প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণের জন্য যেগুলি 'কেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৫ই জুন, ১৮৯৭)। কবিতা থেকে উদ্ধৃতির জন্য-'চার্জ টু দ্য জুরীর' ৩৪-৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এগুলিতে মাওলা কৃষকদের দুর্দশা, ব্রাহ্মণকে কারারুদ্ধ করা, পবিত্র গো-জাতি হত্যা, ভারতীয়দের উপর গুলি বর্ষণ ও নারীজাতিব প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং বেনিয়া ইংরেজ কর্তৃক দেশীয় নৃপতিবর্গের অবমাননার জন্য শোকোচ্ছ্বাস আছে। ভাষণগুলির মধ্যে রয়েছে অধ্যাপক ভানুর প্রয়োজনের খাতিরে শিবাজী কর্তৃক আফ্‌জল খাঁকে হত্যার সমর্থন (পৃঃ ৫৫-৫৬), অধ্যাপক জিন্‌সিভেল কর্তৃক নেপোলিয়ান ও ফ্রান্সের বিপ্লবী নেতৃবর্গের আচরণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে সেগুলির অকুণ্ঠ সমর্থন (পৃঃ ৬০) এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত দ্বাবা তিলক কর্তৃক উক্ত ঘটনাব সমর্থন (পৃঃ ৬৩ ও পরবর্তী)

১১৪। হ্যামিলটনকে এলগিন, ২৯শে জুন, ১৮৯৭, Eur.Mss. F 84/15, P. 54; App.

১১৫। ঐ, ২০শে জুলাই, ১৮৯৭, তদেব, পৃঃ ৬৩-৬৭, App.

১১৬। ঐ ২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৭, তদেব, পৃঃ ১৩০

১১৭। হানস্ কোন দ্য আইডিয়া অফ ন্যাশানালিজম, ম্যাকমিলান পেপার ব্যাক, পৃঃ ৩০০। অধ্যাপক জে· এইচ· প্লাম একেই বলেছেন, "the socially active past, the past as a weapon in the battle for the future, the past as a process of destiny." The Death of the Past, P. 81.

১১৮। বিপিনচন্দ্র পাল, স্বদেশী অ্যাণ্ড স্বরাজ, পৃঃ ১৭-১৯

১১৯। উদ্ধৃতিগুলি ১৯১৮-২১ সালে প্রকাশিত 'আর্য' থেকে নেওয়া। এই রচনাগুলিই পরবর্তীকালে দ্য ফাউণ্ডেশনস অফ ইণ্ডিয়ান কালচার গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সহজাত আধ্যাত্মিকতা ('ভারতীয় মানসিকতার সবচেয়ে উজ্জ্বল অভিজ্ঞান') ছাড়াও অরবিন্দ 'সৃজনের এক অনিঃশেষ উৎস এবং প্রবল প্রাণের প্রকাশের' উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করছে শক্তিশালী, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিচারী এক ধী শক্তি। এই ধী শক্তি আবার অতি প্রবল যুক্তি প্রবণতা, নৈতিকতা, ও নান্দনিকতার সম্মিলিত রূপ হিসেবে বর্ণিত হতে পারে। দ্য রেনেসাঁস ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৯-১৮

১২০। বালগঙ্গাধর তিলক, দ্য ওরিয়ন, (১ম সংস্করণ, ১৮৯৩) এবং দ্য আরক্টিক হোম ইন দ্য বেদস (১ম সংস্করণ, ১৯০৩)। প্রথম রচনাটিতে তিনি বেদের জন্মকাল কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে দিয়েছেন, আর দ্বিতীয়টিতে ঋক্ বেদের কয়েকটি শ্লোক ভূ-বিদ্যার সূত্র অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে তিনি বৈদিক

দেবদেবীর মধ্যে মেরু দেশীয় বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে 'আর্যদের আদিবাসভূমি ছিল মেরু প্রদেশ ও হিমবাহ মধ্যবর্তী অঞ্চল।' দ্য আর্ক্টিক হোম, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৬, পৃঃ ৬। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত ও ঐতিহাসিক বিচারের দাবী করে তিনি ৮০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের আগেই বৈদিক সভ্যতার এক অতি উন্নতমান অর্জনেব তত্ত্ব প্রচার করেছেন।

১২১। শিবাজীব উপর তিলকের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ২৩শে এপ্রিল, ১৮৯৫ সালে 'কেশরী' পত্রিকায়। রায়গড়ে ১৫ই এপ্রিল, ১৮৯৬ সালে (শিবাজীর জন্মদিনে) প্রথম শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; দ্বিতীয়টি ১৩ই জুন, ১৮৯৭ (যে দিন শিবাজী ছত্রপতিরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন)। দ্বিতীয় দিনেই শিবাজী কর্তৃক আফ্‌জল খাঁর হত্যার যে নৈতিক সমর্থন করেন তিলক ('কেশরী,' ১৫ই জুন, ১৮৯৭) তা-ই হযতো চাপেকরদের অনুপ্রাণিত করেছিল। খাপার্ডের ডায়েরীর ১৮৯৫, ১৫ই সেপ্টেম্বর ও ১৮৯৯-এর ২১-২৪ জুনের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১২২ জি· জনসন, 'চিৎপাবন ব্রাহ্মিনস্ অ্যান্ড পলিটিকস্ ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া', লিচ অ্যান্ড মুখার্জী (সম্পাঃ), এলিটস্ ইন সাউথ এশিয়া (কেমব্রিজ, ১৯৭০)

১২৩। বিপিনচন্দ্র পাল, স্বদেশী অ্যাণ্ড স্বরাজ, পৃঃ ৭৩-৮৩

১২৪। সখারাম গণেশ দেউস্করেব 'শিবাজীর দীক্ষা' পত্রিকার জন্যই রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি রচনা করেন (১৯০৪)। কবিতাটি বঙ্গদর্শনের আশ্বিন সংখ্যা, ১৩১১ বঙ্গাব্দেতেও প্রকাশিত হয়।

১২৫। কে· এল· বলহ্যাচেট, ব্রিটিশ পলিসি অ্যাণ্ড সোস্যাল চেঞ্জ ইন ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া; অরবিন্দ, 'ইউনিটি অ্যাণ্ড ব্রিটিশ রুল', বন্দেমাতরম, ২রা মে, ১৯০৭; কিশোরগঞ্জের 'পল্লী সমিতি'তে ভাষণ।

১২৬। বিপিনচন্দ্র পাল, স্বদেশী অ্যাণ্ড স্ববাজ, পৃঃ ৩১, ৩৭। বর্তমানে এই গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আঁদ্রে বেতেইযে, দ্য ইন্ডিয়ান ভিলেজ : পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট; ই·জি· হবসবম (সম্পাঃ), পেজেন্টস ইন হিষ্ট্রী : এসেজ ইন অনার অফ ড্যানিয়েল থর্নার (অক্সফোর্ড, ১৯৮০), পৃঃ ১০৭-২০

১২৭। 'কাস্ট অ্যাণ্ড ডেমোক্র্যাসী', বন্দেমাতরম, ২১শে সেপ্টে, ১৯০৭। রচনাটি বিবেকানন্দের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। বিবেকানন্দ লিখেছিলেন : "ব্যক্তির নিজের স্বরূপ, তার প্রকৃতি, জাতের সুষ্ঠু ও সাবলীল বিকাশের জন্যই 'জাতি'র ধারণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আজকেব দিনে 'জাত' প্রকৃত জাতির সমার্থক নয়; সেটা তার প্রগতির প্রতিবন্ধক। এই জাতিভেদ প্রথাই জাতির উন্মীলন ও তার বৈচিত্র্যের অবাধ প্রকাশের পথ রোধ করে দিয়েছে।" দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭২। নিবেদিতা, সিভিক অ্যাণ্ড ন্যাশানাল আইডিয়ালস (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৪৪-৪৫

১২৮। বিপিনচন্দ্র, দ্য সোল অফ ইণ্ডিয়া, পূঃ উঃ, পৃঃ ১০৮-১১২

১২৯। রবীন্দ্রনাথ, 'ব্রাহ্মণ', বঙ্গদর্শন, আষাঢ়, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।

১৩০। তিলকের ব্রাহ্মণত্বের উপর পুলিশ ইনস্‌পেক্টার ব্রেউইনের রিপোর্ট, পুলিশ হিষ্ট্রী সীট, ১৮৯৭, পৃঃ ৫, পল সিক্রেট ডিপার্টমেন্ট, ১৮৯৯, ২৩-৪৯

১৩১। মৃণালিনীদেবীকে অরবিন্দ, ৩০শে অগষ্ট, ১৯০৫। অরবিন্দের কারা কাহিনী দ্রষ্টব্য পৃঃ ৮৮।

১৩২। অরবিন্দ, 'বন্দেমাতরম', সাপ্তাহিক সংস্করণ, ৮ই ডিসেঃ, ১৯০৭। নিবেদিতা অবশ্য ব্রাহ্মণত্বকে একটা জাতি গঠনের উপাদান হিসেবে যথেষ্ট বিবেচনা কবেননি। হিন্দুধর্মের মধ্যে যখন ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অপর একটা শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে হিন্দুধর্ম তখনই একটা পূর্ণ জাতির রূপ দিতে সক্ষম হয়। আর ক্ষত্রিয়ই সেই প্রতিদ্বন্দ্বী-কেন্দ্র হতে পারে। সিভিক অ্যাণ্ড ন্যাশনাল আইডিয়ালস, (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৩২

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গ-ভঙ্গ

১৮৯৯-এর ২৬শে জানুয়ারীতে লেখা একটা চিঠিতে কার্জন ম্যাক্সমূলারকে জানিয়ে ছিলেন, "এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ভারতবর্ষে এক ধরনের আধা-আধ্যাত্মিক ভাব-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এর চরিত্র ঘোরতর রক্ষণশীল, তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বললেও অত্যুক্তি হয় না। কুসংস্কার, অতীন্দ্রিয়বাদ, আত্মশ্লাঘা এবং ঘোলাটে বুদ্ধিবাদের এই সম্মেলন—যার উপর আবার বহু পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা এসে পড়েছে—তার মধ্য থেকে কী বস্তু যে নির্গত হবে তা কে বলতে পারে!" চরমপন্থা নামধেয় এতাবৎ অপরিচিত এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে কার্জনকে বিচলিত করেছিল, হয়তো-বা কিছুটা উদ্বিগ্নও, কিন্তু বিষয়টা নিয়ে ভাববার অবকাশ তিনি পাননি। ঠিক ঐ সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আরও বেশী প্রশাসনিক তৎপরতা অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। মাসকট, কোয়েট এবং পারস্যকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত সমস্যাগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তারক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। সেগুলিকে অবহেলা করা কার্জনের পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না। আবার ভারতবর্ষেই শিক্ষা থেকে সেচ ব্যবস্থার মতো কমপক্ষে দশটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।[১] কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলকে কেন্দ্র করে যে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি হবে কার্জন তা ধরে নিয়েছিলেন। তবে কংগ্রেসের কাছ থেকে কোনো বড় প্রতিবাদের আশঙ্কা ছিল না। ওয়েডারবার্ন পরিচালিত 'ইণ্ডিয়া' নামক পত্রিকাটি অর্থাভাবে বন্ধ হতে বসেছিল।[২] মুষ্টিমেয় কিছু জমিদার ও দেশীয় রাজন্যবর্গের বদান্যতার উপর কংগ্রেসকে নির্ভর করতে হতো।[৩] র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্ষ্ট হত্যার সঙ্গে নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের যোগাযোগের কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল না। তাই রাজদ্রোহ নির্মূল করার জন্য কোনও আইন তৈরীর প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেননি। কিছুটা হালকা মেজাজেই তিনি লিখেছিলেন, "আমার অনুমান রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কোনও ষড়যন্ত্রের কথা এখন আর কেউ বিশ্বাস করে না।"[৪] নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে মুক্তি দেবার পরামর্শ তিনিই বোম্বাই-এর গভর্নর স্যাণ্ডহার্স্টকে দিয়েছিলেন, কেননা তাঁর ধারণা হয়েছিল এতে "গোখলের হাত শক্ত হবে, সহজ হবে তাঁর পক্ষে বোম্বাই আইন পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে তিলককে হারিয়ে দেওয়া।" ইতিমধ্যে যে সব পুলিশ-রিপোর্ট তাঁর হাতে এসেছিল তার থেকে তিনি জেনে-ছিলেন যে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশন মোটেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ঐ সম্মেলনে প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ন'শোর মতো।[৫] এঁদের মধ্যে আবার অনেককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাজির করাতে হয়েছিল। পরের বছর নৌরজীর কাছে ওয়াচা অনুযোগ করেছিলেন, "আপনাদের বড় বড় নেতারা তো কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেই চান না।"[৬] এই সময়েই কংগ্রেস সম্পর্কে কার্জনের অবমাননাকর মন্তব্য শোনা গিয়েছিল: "আমার বিশ্বাস, ভেঙে পড়ার আগে কংগ্রেস টলমল করছে এবং ভারতবর্ষে

থাকা-কালে তার শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে সাহায্য করবো—এটাই আমার অন্যতম উচ্চাকাঙ্ক্ষা।"[৭] কংগ্রেস যেভাবে সংগঠিত হয়েছে, বিশেষ করে ইদানীং কালে তার যে হাল, তাতে দেশের একটা আনুবীক্ষণিক অংশের প্রতিনিধিত্ব করার বেশী কিছু সে দাবী করতে পারে না। লাহোর কংগ্রেসে কার্জনের কিছু স্তুতি শোনা গিয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ সভায় স্বদেশীরা যেসব আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন 'সেগুলিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়াটা কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে' তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না।

এ সিদ্ধান্ত আজ বোধহয় তর্কাতীত যে 'রাজদ্রোহী' কংগ্রেসকে ধ্বংস করার কোনও উদগ্র বাসনা থেকে বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনার জন্ম হয়নি। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজ আমলাদের প্রচণ্ড বাঙালী-বিদ্বেষ, আর বাংলার ভৌগোলিক এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি-জাত অতি জরুরী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা থেকেই এর উদ্ভব। চরমপন্থী জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতে কংগ্রেসবিরোধী আয়তন যুক্ত হয়। কার্জন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কর্মকুশলতার দ্বারা তা কাজে পরিণত করতে পেরেছিলেন এবং সেই সঙ্গে মুমূর্ষু কংগ্রেসের ধমনীতে সঞ্জীবনী রস সঞ্চার করেছিলেন।

মেকলে তাঁর 'এডুকেশন মিনিটে' একদা এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে 'মতে ও রুচিতে, নীতি এবং বুদ্ধিতে ইংরেজ—এমন এক মধ্যবিত্ত বাঙালী শ্রেণীর সৃষ্টি হবে যারা শাসক ও লক্ষ লক্ষ শাসিত মানুষের মধ্যে একটা সেতু বন্ধনের ভূমিকা নেবে।'[৮] তাঁর ভগ্নীপতি চার্লস ট্রেভেলিয়ান এমন ভবিষ্যৎবাণী করতেও দ্বিধা করেননি যে ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের একটা সুফল হিসেবে এদেশের জাতীয় উদ্যোগ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিদ্যা আহরণ ও বিস্তারের কাজে এবং ইউরোপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির জাতীয়করণের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হবে। ফলে, মহাকালের অলঙ্ঘ্য বিধানে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন একদিন অবসিত হলেও "লাভজনক" প্রজারা আরও "লাভজনক" মিত্রে পরিণত হবে। ট্রেভেলিয়ান এই আশা করেছিলেন যে, "আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী ভারতবর্ষই হবে ব্রিটিশ মহানুভবতার উন্নততম স্মারক স্তম্ভ।"[৯] কিন্তু মাত্র দু দশকের মধ্যেই এধরনের সুখ-স্বপ্ন সন্ধ্যারক্তরাগের মতো বিলীন হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে সেসিল বিডন এ দেশের মেধাবী ছাত্রদের উচ্চতর হারে সরকারী বৃত্তি দেবার প্রস্তাব করলে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট স্যর চার্লস উড মন্তব্য করেছিলেন, "সরকারী ব্যয়ে বঙ্গ যুবক বেকন এবং সেক্সপীয়র পড়ল কি না অথবা তার জন্য বৃত্তি পেল কিনা তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্রও মাথা-ব্যথা নেই।"[১০] ১৮৫৩ সালে প্রবর্তিত সিভিল সার্ভিস চাকরীর জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা কেবলমাত্র লণ্ডনেই হবে বলে স্থির হয়েছিল, কেন না (উডের অভিমতে) ভারতবর্ষে এমন চাকরী লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে গেলে যে ধরনের চরিত্র বলের দরকার তা গঠনোপযোগী শিক্ষা একমাত্র দেওয়া হয় হেইলেবেরি কলেজে, ভারতবর্ষে কোথাও নয়।"[১১]

এর পরেই আচম্বিতে একটা প্রলয় ঝঞ্ঝার মতো ভারতবর্ষের উপর আছড়ে পড়ল সিপাহী বিদ্রোহ। কয়েক মাসের জন্য পরিচিত রাজনৈতিক দৃশ্যপট হিংস্র তমসায় মুছে গেল। সংঘটিত হলো একটা কালান্তর। মীরাট, দিল্লী, কানপুর ও লক্ষ্ণৌ-এর তিক্ত স্মৃতি ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে ভয় এবং সন্দেহের এক অবিস্মরণীয় রক্তরেখা টেনে দিল। ১৮৬০ সালে উড (তখন ভারতসচিব) স্বীকার করেন যে বাছবিচার না করে সমস্ত ভারতবাসীকে একই মর্যাদার অনুভূমিকে নামিয়ে আনা উচিত হয়নি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে

তখনও পর্যন্ত যে সমস্ত উচ্চ বা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে তাদের কিছু পরিমাণে সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু কি ভাবে? পেরী বলেছিলেন ভারতবর্ষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্তন করেই তা সাধিত হবে। ট্রেভেলিয়ানকে উড লিখলেন, "সন্দেহ নেই (এ ভাবে) তুমি যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য ভারতীয়ের সন্ধান পাবে। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে আমরা যা চাই তা হচ্ছে নৈতিক চরিত্র, আর কোনও পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তা যাচাই হতে পারে না।"[১২] দক্ষতার চেয়ে সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশী ছিল। ক্যানিংকে তিনি জানিয়েছিলেন যে "কলকাতার কেতাব-মুখস্থ-করা বাবুদের" মধ্যে নয়, অযোধ্যার তালুকদারদের মধ্যেই এ ধরনের মানুষের দেখা পাওয়া যেতে পারে।[১৩]

সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ সম্মান বিতরণের সময় ক্যানিং অবলীলাক্রমে ভুললেন বাঙালীদের, সশস্ত্র সাহায্য করতে না পারলেও লেখনীর দ্বারা যারা যথেষ্ট বিশ্বস্ততা দেখিয়েছিল। রাজন্যবর্গ ফিরে পেলেন দত্তক নেবার অধিকার, তালুকদাররা—বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির সঙ্গে উপরি স্বরূপ পুলিশী ক্ষমতা, আর পঞ্জাবের সর্দাররা পেলেন তাঁদের বিক্ষিপ্ত জায়গীরগুলি সংহত করার অনুমতি। অথচ, মধ্যবিত্ত বাঙালীর সামান্য দাবী—ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে যুগপৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা—অগ্রাহ্য হলো! যে সব মুষ্টিমেয়, মেধাবী ধনী সন্তান বিলেত গিয়ে ভাগ্য যাচাই করার সুযোগ পেতেন—তাঁদের অন্যতম—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি তুচ্ছ অপরাধে কর্মচ্যুত হলেন। উপরন্তু ভারতসচিব সলস্‌বেরি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসবার বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ করে দিলেন। এই ব্যবস্থা নেওয়ার পিছনে তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরেজ সন্তানদের সুবিধে করে দেওয়া, যদিও প্রকাশ্যে তিনি বলেছিলেন এর ফলে সকল পরীক্ষার্থীর জন্য ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা সহজতর হবে, সম্ভব হবে বিফল পরীক্ষার্থীদের অল্প বয়সে বিকল্প কোনও জীবিকা গ্রহণ।[১৪] সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়ের নিয়োগ পার্লামেন্ট কর্তৃক ১৮৬৯ সালে আইনানুমোদিত হলেও (৩৩ ভিক্ট· সি ৩) আরগিল এবং সলস্‌বেরি (পর্যায়ক্রমে ভারতসচিব হিসেবে) এবং ভাইসরয় রূপে নর্থব্রুক তার প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন।[১৫] শুধু দেশীয়দের নিয়ে ক্ষুদ্রতর যে সিভিল সার্ভিসের পরিকল্পনা লিটন করেছিলেন তার ভাগ্যেও প্রত্যাখ্যান ছাড়া অন্য কিছু জোটেনি। দেব-বাঞ্ছিত ঐ পদের মর্যাদা রক্ষায় অতন্দ্র ছিলেন সলস্‌বেরি।[১৬] পার্লামেন্টে আইন পাশ হবার ন'বছর পরে লিটন সেই স্ট্যাটুটারী সিভিল সার্ভিস প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। ফলে সিভিল সার্ভিসে ঢোকার বয়স কমিয়ে দেওয়ার নিয়মটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে বিরূপতা বাড়িয়ে দিল। রিপন বিধানটার অযৌক্তিকতা স্বীকার করে লিখেছিলেন: "বয়স-সীমা হ্রাস করার পর থেকে ১৮৮৩ খ্রীঃ মধ্যে মাত্র একজন দেশীয় যুবক ইংলণ্ডের ঐ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হতে পেরেছে।"[১৭] ইংরেজ আমলারা যে ঐ পদ এবং তার সঙ্গে জড়িত বিপুল সুবিধাগুলিকে তাদের বাহু-বলে অর্জিত সম্পত্তি ছাড়া ভিন্ন চোখে দেখেন না তা সলস্‌বেরির অজানা ছিল না; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অন্যায় চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে তাঁর বাধেনি।[১৮] রিপনের অভিযোগ বাতিল করে কিম্বারলে বলেছিলেন, "আমাদের ভারতীয় শাসন যন্ত্রের মেরুদণ্ড হলো ইংরেজ সিভিলিয়ান, ভারতীয়েরা তো লিটনের সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে পারে।" অথচ ১৮৮৬ সালে উক্ত সার্ভিসে ভারতীয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৪৮।

১৮৬০ সাল থেকেই ইংরেজদের কায়েমী স্বার্থ বাঙালীদের সম্পর্কে নানাবিধ মিথ্যাগুজব

ছড়াতে শুরু করে। এই অপকর্মে বড়লাটদেরও কম অবদান ছিল না। নর্থকোটকে জন লরেন্স তো লিখেই ফেলেছিলেন, "সন্দেহ নেই বর্তমান ব্যবস্থা দেশীয়দের পক্ষে বেশী সংখ্যায় এই চাকরীতে ঢোকার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। কিন্তু বিচার বিভাগের উচ্চতর পদগুলিতেও ভারতীয়দের বেশী সংখ্যায় না ঢুকতে দেওয়াই উচিত। এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে দেখা যায় যে অধিকতম সুযোগ পাওয়ার ফলে এবং বাঙালীদের বুদ্ধি অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে সূক্ষ্ম ও ক্ষুরধার হওয়ায় তারাই ইংরেজী শিক্ষায় বেশী শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরীক্ষা পাশ করার ব্যাপারে খুবই দক্ষ ও মেধাবী হলেও সুশাসক হবার কোনও গুণই তাদের নেই। সাহস, ক্ষিপ্রতা, কর্মনৈপুণ্য ও আত্ম-নির্ভরতা ইত্যাদি যে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অসংখ্য ইংরেজ সুদক্ষ প্রশাসক হতে পেরেছেন, বাঙালীদের মধ্যে তার একান্ত অভাব।"[১৯] পঞ্জাবীরা (লরেন্স তাদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন অন্যেরা তাই ধ্রুব সত্য বলে মনে করতেন) বরং ইংরেজদের শাসন মেনে নেবে, কিন্তু 'কৃশকায়, দুর্বল স্বাস্থ্য', 'ভীতু বাঙালী'র শাসন তারা সহ্য করবে না।[২০] সুতরাং যথেষ্ট যত্ন সহকারে পঞ্জাবী ও পাঠানদের মতো 'বলিষ্ঠ-জাতি', 'পরিশ্রমী জাতিগুলিকে' 'রমনী-সুলভ, কোমল-স্বভাব' বাঙালীদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা শুরু হয়েছিল, এমন কি বুদ্ধিমান বাঙালীদের ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে বিদেশী বলে বর্ণনা করা হচ্ছিল। বাঙালীর গুণগ্রাহী চার্লস ট্রেভেলিয়ানের পুত্র জি· ও· ট্রেভেলিয়ান বাঙালীদের মিথ্যুক বলতেও দ্বিধা করলেন না।[২১] ট্রেভেলিয়ানের এই আবিষ্কার সানন্দে সমর্থিত হলো লর্ড রবার্টস-এর *ফরটিনাইন ইয়ারস্ ইন ইণ্ডিয়া* গ্রন্থে (১৮৯৭) এবং ১৯০৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কার্জনের দীক্ষান্ত-ভাষণে। ইংরেজরা অবশ্য অন্যান্য প্রদেশের মানুষজনকেও ছেড়ে কথা কয়নি। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত *দ্য লেটারস ফ্রম এ কম্পিটিশন-ওয়ালা* গ্রন্থের লেখক জি· ও· ট্রেভেলিয়ান যে ছবিটি এঁকেছেন তাতে দেখানো হয়েছে তারুণ্য-দীপ্ত, স্বর্ণাভকেশ অ্যাংলো-স্যাকসন টম দাক্ষিণাত্য বা রাজপুতানার নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবদের আইন-কানুন শেখানোর মহৎ কর্তব্যপালন করছেন। সবাই কিপলিং-এর গঙ্গাদীন ছিল না, যার কালো চামড়ার অন্তরালে লুকিয়ে আছে শ্বেতকায় এক হৃদয় ('white, clear white, inside,')।

যখন পঞ্জাব-ঘরানার সমর্থক গোষ্ঠী উড-কথিত 'মুখস্থ বুলি কপ্‌চানো কলকাতার বাবুদের' বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছিলেন, তখন তাঁদের ঐকতানে যোগ দিয়েছিলেন চা-বাগিচার সাহেব, নীলকর এবং ব্রিটিশ বণিককুল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট', দীনবন্ধু মিত্র ও তাঁর *নীলদর্পণ*, এবং হতভাগ্য নীল-চাষীদের (উড স্বীকার করেছিলেন এদের জবরদস্তি করে বেগার খাটানো হয়) সমর্থনে এগিয়ে আসা বাঙালী-জমিদার এবং জোতদারদের মধ্যে ইংরেজ আমলারা ইংরেজী-শিক্ষার ফলে সৃষ্ট একটা বেয়াদপ জাতকেই দেখেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত সরকারের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছিল ফিটজেমস্ ষ্টিফেনের স্বৈরতন্ত্রী উদারনীতি (যা ছিল মিলের গণতান্ত্রিক উদারনীতির বিপরীত)। ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক গোবিনো (Gobineau) পাশ্চাত্য জাতিগুলির অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক যে 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ প্রচার করেছিলেন, ইংরেজ আমলারা কিছুমাত্র বাছ-বিচার না করেই তাও গ্রহণ করলেন। নব-নিযুক্ত সাহেব সিভিলিয়ানরা নিজেদের প্লেটো-বর্ণিত 'গার্ডিয়ান' বলে মনে করতে থাকেন এবং অত্যাচারী জমিদার, মহাজন ও উকিল-মোক্তারদের হাত থেকে দীন-দরিদ্র ভারতবাসীকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁদের উপরেই বর্তেছে বলে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে থাকেন। তাঁরাই তো

গরীবের মা-বাপ, শরণাগতের ত্রাতা। সেক্সপীয়ারের 'প্রস্পেরো' যেমন 'এরিয়েল' এবং 'ক্যালিবান'—উভয়ের উপরেই তাঁর যাদু-দণ্ড ঘোরাতেন, সাহেব সিভিলিয়ানরা তেমনি শিষ্ট ও দুষ্ট—উভয়প্রকার ভারতীয় প্রজারই ভাগ্যবিধাতা হতে চেয়েছিলেন। তখনও পর্যন্ত মুষ্টিমেয় যে ক'জন ইংরেজ উদারনীতির ঐতিহ্য ভুলতে পারেননি, যেমন এ· ও· হিউম, উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন এবং হেনরী বেভারীজ—তাঁদের বাতুল বলে উপহাস করা হতো। ষ্ট্রেচি বলতেন, "আমরা চলে গেলে এ দেশে মাৎস্যন্যায় অনিবার্য।" আরও একধাপ এগিয়ে লরেন্স এই দর্পিত উক্তি করলেন, "বাহুবলে আমরা ভারতবর্ষ জয় করেছি, বাহুবলের দ্বারাই আমরা এ দেশে আমাদের অধিকার বজায় রাখবো। সব সময়েই ইংরেজরা থাকবেন পয়লা সারিতে, সমস্ত সম্মান এবং উচ্চপদ তাঁদেরই প্রাপ্য।" ষ্ট্রেচি আরও বলেছিলেন, "কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ বা ক্ষমতা, বিশেষ করে জেলা শাসকের পদটি যেন কখনো কোনও বাঙালীকে না দেওয়া হয়। শিক্ষিত বাঙালীর মতো আর কেউ ইংরেজদের এতো ঘৃণা করে না।"[২২] লিটন প্রশ্ন করেছিলেন, "এই সব বাবুদের ভবিষ্যৎ কি? এরা শুধু পরকে অন্ধের মতো অনুকরণ করতে শিখেছে, শেখেনি অনুসরণ করতে, স্বাবলম্বী হতে। নিজেদের সামাজিক বৈষম্য প্রতিফলিত করা ছাড়া তারা আর কিছুই করে উঠতে পারে নি।"[২৩]

ইংরেজদের এই বাঙালী বিদ্বেষ কুৎসিততম চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময়। Brasonism (দ্রঃ লোকরহস্য) নামক ব্যঙ্গরচনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গোটা ভারতের হয়ে ইঙ্গ-ভারতীয়দের এই ঘৃণা ও উচ্চমন্যতার উত্তর দিয়েছিলেন। ওয়াল্টার স্কটের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঙালীরাও বলতে পারত—স্কটল্যাণ্ডের নিম্নবিত্ত পরিবারগুলি থেকে কনিষ্ঠ পুত্রদের অবধারিত ভাবে ভারতবর্ষেই পাঠানো হয় ঠিক যেমন তাদের কালো রঙের গো-মেষাদি দক্ষিণের বাজারে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। চার্লস ট্রেভেলিয়ান-তনয় জি· ও· ট্রেভেলিয়ান যাদের গুণগান করেছিলেন সেই স্বর্ণাভ-কেশ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক টম, ডিক ইত্যাদিও যে অবিশ্বাস্য রকমের ঔদ্ধত্য এবং অবিনয় সহকারে প্রচণ্ড বিরক্তিকর ভুলভ্রান্তি করতে পারে—সে কথাটা শাসক গোষ্ঠী অবলীলাক্রমেই ভুলেছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডে যেমন ঘটেছিল ভারতবর্ষেও তেমনি জাতীয় চরিত্র হনন শুরু হয়েছিল। অপরকে তুচ্ছ এবং অধঃস্তন পদে নামিয়ে দেওয়ার আগে তাকে হীন ও হেয় জ্ঞান করাটাই মানুষের স্বভাব। পরাধীনতার অজস্র অবমাননার মধ্যে এই অবজ্ঞা ও ঘৃণাটাই ভারতীয়দের কাছে সবচেয়ে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।[২৪]

এই সব 'নেটিভ'রা যে স্বায়ত্ত শাসনের কথা উচ্চারণ করবে ষ্টিফেনের মতো মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের কাছে তা ধৃষ্টতারও বাড়া। রসিক বেয়ারিঙ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'বাঙালীবাবুরা যদি নিজেদের নর্দমা আর স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করতে চায়, করুক না যত খুশী।' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংহতিনাশের বদলে এ ধরনের উদ্যোগ 'সেফটি ভাল্‌ভ'-এর কাজ করবে বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন।[২৫] কিন্তু বাস্তব-বোধ-রহিত ষ্টিফেনের মধ্যে বেয়ারিঙ-এর কৌতুকপ্রিয়তার লেশমাত্রও ছিল না। 'টাইমস' পত্রিকার স্তম্ভে তিনি সাম্রাজ্যিক মহিমার প্রশস্তি করেই ক্ষান্ত হলেন না, 'নাইন্টিনথ্ সেঞ্চুরী' পত্রিকাতে গ্ল্যাডস্টোনের উদারনীতিরও শ্রাদ্ধ করলেন।[২৬] কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, অদৃষ্টবাদী, অশিক্ষিত এবং বহু জাত-সম্প্রদায়ে বিভক্ত একটা জাতির সামনে যখন অপর একটা সুসভ্য প্রগতিশীল জাতি বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন প্রথমোক্তদের জন্যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছাড়া আর কি গত্যন্তর থাকতে পারে? ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে কলোনিয়াল সেক্রেটারী জোসেফ্ চেম্বারলেন তাঁর শ্রোতৃবর্গকে বললেন: "আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে

পারেন, সুসভ্য করে তুলবো বলে যে দেশের শাসনভার আমরা হাতে নিয়েছি তাকে বর্বরতার মধ্যে আবার ফিরে যেতে দেওয়ার কোনও ইচ্ছেই আমাদের নেই।" মানচিত্র লাল করে দেওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদে যাঁর প্রবল আপত্তি ছিল সেই লর্ড সলস্‌বেরিও একজন সৎ খ্রীস্টান হিসেবে এই ধারণা পোষণ করতেন যে সভ্যতর জাতিগুলি মানব সমাজের হিত-সাধনে দায়বদ্ধ। তাঁর এ বিশ্বাসে কোনও ফাঁক ছিল না যে এই অভিভাবকত্ব যথাযথ ভাবে পালন করা সম্ভব একমাত্র নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ইংরেজরা ভারতীয়দের রক্ষা করবেন, যোগ্য এবং শিক্ষিত করে তুলবেন, কিন্তু যতো দিন না এই পোষ্যবর্গ স্বাবলম্বী হয়ে আত্ম—কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার মতো উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব অর্জন করছে ততোদিন তাদের স্বায়ত্ত শাসনদানের প্রশ্নই উঠতে পারে না। সলস্‌বেরির মতো লোকেরা এটা ভেবে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন যে ভারতবর্ষে ইংরেজদের অসামান্য সাফল্য তাঁদের যোগ্যতা ও সততারই পুরস্কার। প্রকৃতি বিশেষভাবে তাঁদেরই এই দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করেছে কেননা প্রাকৃতিক নির্বাচনে শুধু শারীরিক দিক দিয়েই নয়, নৈতিক বিচারেও তাঁরা যোগ্যতম বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন। বেশির ভাগ ইংরেজেরই এই ধারণা দৃঢ়মূল ছিল যে 'কালা-আদমী'দের 'অন্ধ-তামস' থেকে শ্বেতকায়দের 'আলোকিত জগতে' পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হলেও শাসকদের দায়িত্বপূর্ণ আসনে তাদের বসানো যায় না। গিলবার্ট মারে'র মতো ধ্রুপদী সাহিত্যে পণ্ডিত এবং উদারনৈতিক বলে প্রসিদ্ধ মানুষও কালো, তামাটে ও পীতবর্ণের মানুষের থেকে শ্বেতকায়দের সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতেন। তিনি লিখেছিলেন, "এ কথাটাই বলতে চাই যে সামগ্রিক বিচারে শাসন করার অধিকার ও যোগ্যতা সাদা মানুষেরই সহজাত ; আর অন্য রঙের মানুষরা জন্মেছে শাসিত হবার জন্যে।" ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত *প্রবলেম্‌স্ অফ দ্য ফার ইষ্ট* গ্রন্থটি কার্জন তাঁদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করেন যাঁরা বিশ্বাস করতেন বিধাতার বিধানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই মানব-মঙ্গল-সাধনের মাধ্যমগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছিলেন যে মেলিয়ান বিতর্কে এথেনীয়দের উত্তরে এমনি দম্ভের সুর লেগেছিল।[২৭]

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'ন্যাশানাল কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় কংগ্রেসের উপর অত্যল্পকালের মধ্যে তাঁর ঈর্ষণীয় প্রভাব বিস্তারে ইংরেজ আমলাদের বাঙালী বিদ্বেষ আরও বেড়ে যায়। লর্ড ক্রশ কোনও দিনই কংগ্রেস নেতৃবর্গকে সুনজরে দেখেন নি। তাঁর মত ছিল এঁরা জনগণের দোহাই দিয়ে নিজের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধি করতে চান।[২৮] ডাফ্‌রিন সুরেন্দ্রনাথের অনুগামীদের কংগ্রেস দলের মধ্যে "অধিকতর হিংস্র ও অভদ্রদের উপদল" ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেননি। কংগ্রেসের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের দলকে আয়ারল্যাণ্ডের হোমরুলপন্থীদের সঙ্গেই তিনি তুলনা করেছিলেন এবং বাঙালীদের মধ্যে 'bastard disloyalty'র গন্ধ পেয়েছিলেন।[২৯] তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে পৌরুষহীন, 'দুব্‌লা' হিন্দুদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে 'মরদ' মুসলমানরা ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। বিচক্ষণ ইংরেজরা এই অবস্থায় কি করেই বা একটা 'আনুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু দলে'র হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে? তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার যে এদের পিছনে না আছে অভিজাতদের সমর্থন, না আছে জনসাধারণের আনুগত্য।[৩০] ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে একই সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্মতি জানিয়ে ১৮৯৩ সালে হাউস অফ কমন্স-এ যে প্রস্তাব নেওয়া হয় তার উপর মন্তব্য করার সময় ল্যান্সডাউন এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এ ধরনের উন্মুক্ত, অবাধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলে 'ইম্পিরীয়াল সার্ভিস' থেকে মুসলমান, শিখ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় বাদ পড়ে যাবে। যদিও পুঁথিগত

শিক্ষায় এরা পিছিয়ে আছে, তা হলেও এদেরই আছে শাসন করার ঐতিহ্য এবং প্রয়োজনীয় চরিত্রবল। ১৮৯২-এর ২২শে মার্চ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট-এর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন কালে কার্জন যে উক্তি করেছিলেন তা ছিল উড থেকে ডাফ্‌রিনের আমল পর্যন্ত প্রচারিত ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মতের প্রতিধ্বনি। ভারতবর্ষে ভাইসরয় হিসেবে মনোনীত হবার দু বছর আগে থেকেই কার্জন ঐ সময়কার বাঙালী-বিদ্বেষী, হিন্দু বিরোধী এবং কংগ্রেস বিদ্বেষী শাসননীতিতে দীক্ষিত হয়েছিলেন।[৩১]

তবে ১৯০৫-এর বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের এই মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি ছাড়া প্রশাসনিক সংস্কারেরও একটা তাগিদ ছিল। বাংলা প্রেসিডেন্সী ছিল ভারত সাম্রাজ্যের পাদপীঠ, তার রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক আধিপত্যের বনিয়াদ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার সীমানা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় শতদ্রু নদীতে গিয়ে ঠেকেছিল। এর সঙ্গে আমেরিকার পশ্চিমাভিমুখী বিস্তারের তুলনা করা যেতে পারে। ১৮৫৪ সালে (এই সময় থেকেই একজন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ রূপে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়) পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বাদ দিয়ে সমস্ত উত্তর ভারত ছিল বাংলার অন্তর্ভুক্ত।[৩২] ১৮৬৭ সালে উড়িষ্যায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হলে এই অতি-স্ফীত প্রদেশ শাসনের সংখ্যাতীত অসুবিধা ছোট লাট সিসিল বিডন মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। এই কারণে গ্রে, ফ্রিয়ার ও মেইন বলেছিলেন মাদ্রাজ এবং বোম্বাই-এর মতো বাংলাকেও একজন গভর্নরের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন করলে প্রশাসনিক সমস্যাগুলির সমাধান হতে পারে। সে ক্ষেত্রে একটা এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সহায়তায় তিনি সহজেই বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই প্রদেশের দায়-দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। কিন্তু ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলার সুদীর্ঘকালের নিবিড় সম্পর্ক ও নির্ভরতার কারণে বড়লাট জন লরেন্স এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন। লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে আলাদা যে কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব উইলিয়ম গ্রে করেছিলেন তাও লরেন্সের পছন্দ হয়নি। তাঁর মত ছিল 'সরকারের সংহতি, কর্মতৎপরতা ও সঙ্গতি রক্ষার জন্য তাকে কিছুটা অনিয়মতান্ত্রিক-ক্ষমতা দান অত্যাবশ্যক।' শাসন-ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ না করেও জনসাধারণের সঙ্গে কালেক্টরের ব্যক্তিগত যোগাযোগ সহজতর করার উদ্দেশ্যে বাংলার জেলাগুলিকে ক্ষুদ্রতর করার যে প্রস্তাব কেউ কেউ করেছিলেন তা অবশ্য জন লরেন্সের মনঃপূত হয়েছিল, কেননা অযোধ্যা, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ এবং কিছু পরিমাণে (এবং তাও বেশ উল্লেখযোগ্য) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এই জাতীয় প্রশাসন চালু ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, "আমি আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তিন বিভাগে বিভক্ত করে, একজন মুখ্য কমিশনারের অধীনে স্থাপন করার পক্ষপাতী। আর্থিক দিক থেকে ব্যবস্থাটা খুব বাঞ্ছনীয় না হলেও এর দ্বারা বাংলা সরকারের দায়-দায়িত্ব কমানো যাবে, সম্ভব হবে আসামের উন্নতি তরান্বিত করা।"[৩৩] পরবর্তীকালে লেখা একটা চিঠিতে তিনি এ ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন যে আসামের সন্নিহিত বাংলার পূর্ব-প্রত্যন্তের কিছু জেলাও তিনি ছেড়ে দিতে রাজী। তবে বিহার ও উড়িষ্যা সম্পর্কে তিনি কোনও পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন।[৩৪] এই ছিল বাংলা-ব্যবচ্ছেদের আসল বীজ-সন্ধি।

১৮৭২ সালে অনুষ্ঠিত এ দেশের প্রথম আদমসুমারীতে দেখা গেল বাংলা প্রেসিডেন্সীর জন-সংখ্যা ৬ কোটি ৭০ লক্ষে পৌঁছেছে। ছোটলাট ক্যাম্পবেল বড়লাট নর্থব্রুককে জানালেন যে এই পরিস্থিতিতে সুশাসন সম্ভব নয়। সরকার তখন সবেমাত্র জমিদারদের উপর 'সেস' (পথ ও শিক্ষাবাবদ স্থানীয় কর) বসিয়েছেন, আর জমিদারেরাও তার প্রতিবাদে

মুখর হয়ে উঠেছেন। জেলাগুলির আয়তন সঙ্কুচিত করে কালেক্টর এবং রায়তদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত না হলে জমিদারেরা যে প্রজাদের উপর সেস-এর বেশির ভাগটাই চাপিয়ে দেবেন এবং দিলে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা জেলা শাসকদের পক্ষে যে সম্ভব হবে না তা সরকার উপলব্ধি করেছিলেন। ক্যাম্পবেল নিজস্ব মত প্রকাশ করলেন যে দু কোটি হিন্দীভাষী লোককে বাংলা থেকে পৃথক করে দেওয়া উচিত।[৩৫]

ক্যাম্পবেলের সুপারিশ বাস্তবায়িত করার বদলে ১৮৭৪ সালে ২০ লক্ষ মানুষের দেশ আসামকে বাংলা থেকে আলাদা করা হলো। কিন্তু কোনও অভিজ্ঞ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী সিভিলিয়ান নতুন-তৈরী এই ক্ষুদ্র প্রদেশে যেতে রাজী হলেন না ; কেননা সেখানে না ছিল পদোন্নতির সম্ভাবনা, না ছিল অধঃস্তন কর্মচারীদের আলাদা কোনও 'ক্যাডার' বা সংগঠন। এ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথেব সরস টিপ্পনীটি উপভোগ্য : "প্রদেশটির ভালোমন্দ সিভিল সার্ভিসের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হওয়ায় আসামের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াটা নিশ্চয়ই অত্যাবশ্যক।" কিন্তু এই রূঢ় সত্যটা বুঝতে কারো দেরী হয়নি যে বাংলার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা রোধে উক্ত ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। ১৮৯৬ সালে স্যর উইলিয়ম ওয়ার্ড পরিকল্পনা করলেন—বাংলার চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা জেলা ও মৈমনসিং জেলা এবং আসামকে নিয়ে লেঃ গভর্নরের শাসনাধীন একটা প্রদেশ গঠিত হোক। কিন্তু পরবর্তী চীফ কমিশনার স্যর হেনরী কটন এর প্রতিবাদ করে বললেন যে আসামের সঙ্গে চট্টগ্রাম জুড়ে দিলে বাংলা বা চট্টগ্রামের কোনও সুবিধেই হবে না, উপরন্তু হবে অর্থের শ্রাদ্ধ।[৩৬] এ দিকে ১৮৯৭ সালের মধ্যেই জনমত নামক বস্তুটি প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং পুনর্গঠিত লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তার প্রতিনিধিরা চুপ করে থাকার পাত্র ছিলেন না। সুতরাং চট্টগ্রামবাসীদের প্রতিবাদের সঙ্গে গোটা বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠ সরব হয়ে ওঠায় ওয়ার্ডেব পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলো।[৩৭] কেবল লুশাই পর্বতমালা আসাম পেল।

বাংলার এই সমস্যাটা এতোদিন আমলা-মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ভাইসরয় পদে যোগ দেবার পর কয়েক বছর তা নিয়ে কার্জন মাথা ঘামাননি। কিন্তু ১৯০০ সালের মার্চে আসাম সফরে গেলে সেখানকার চা-বাগিচার সাহেবরা তাঁর কাছে এই আর্জি পেশ করেন যে আসাম-বাংলা রেলপথ দিয়ে চা রপ্তানীর ব্যয় হয় অত্যধিক অথচ কলকাতার থেকে নিকটবর্তী কোনও বন্দর পেলে তাঁদের পণ্য পরিবহণের খরচ অনেক হ্রাস পায়।[৩৮] এর প্রায় দু বছর পরে, বেরার-সমস্যা সমাধানের সময় আসাম, তথা পূর্ব ভারতের, প্রাদেশিক সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নটা কার্জনের মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যে কোনও সমস্যাকে বৃহত্তর একটা পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিবেচনা করাই ছিল কার্জনের স্বভাব। ভারত সচিবকে তিনি লিখলেন, "একজনের দায়িত্ব নেবার পক্ষে বাংলা প্রশ্নাতীত ভাবে বিরাট বড়ো। চট্টগ্রামের কি বাংলার মধ্যে থাকা উচিত, না কি আসামকে সমুদ্রে বেরোবার একটা পথ করে দেবার জন্য তাকে আসামের সঙ্গে যোগ কবে দেবো ? কলকাতা থেকে শাসন করলে তা কি আসামের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে ? গঞ্জামের কি মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ?"[৩৯] এই ভাবেই সেন্ট্রাল প্রভিন্সের সঙ্গে বেরার-এর সংযুক্তির প্রশ্নটা সামগ্রিক ভাবে প্রাদেশিক সীমানাগুলির পুনর্নির্ধারণেব বিষয়টিকেও সরকারের সামনে এনে দিয়েছিল। অবশ্য গোটা ব্যাপারটা তখনো কার্জনের মনে ছিল নীহারিকার মতোই অস্পষ্ট।

এমন সময় প্রায় দেড় বছরের পুরোনো, নানা দপ্তর-ঘোরা, ছোটো-বড়ো-মাঝারি নানান আমলার বিভিন্ন মন্তব্যের নামাবলী গায়ে স্যর অ্যানড্রু ফ্রেজারের এক পরিকল্পনা তাঁর টেবিলে এসে উপস্থিত হলো। বাংলার জনসংখ্যা যে ৭ কোটি ৮০ লক্ষে পৌঁছেছে সে

বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সি· পি-র শাসনকর্তা ফ্রেজার সাহেব প্রস্তাব করেছিলেন যে সম্বলপুর সহ উড়িষ্যাকে অবিলম্বে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, গোটা ব্যাপারটা কার্জনকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। লাল-ফিতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি লিখলেন (২৪শে মে, ১৯০২) তাঁর বিখ্যাত "রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড নোট।" তড়িৎগতিতে, সুচারুরূপে কর্তব্য সম্পাদনের আদর্শে তাঁর বিশ্বাস কোনও দিন শিথিল হয়নি। তাঁর বিচারে এইটেই ছিল সুশাসনের একমাত্র মানদণ্ড ; সাম্রাজ্যবাদের স্বপক্ষে অকাট্যতম যুক্তি। আর তাঁরই নাকের ডগায় ফ্রেজারের প্রস্তাব শম্বুকগতিতে এগোয়! আমলাদের সামনে নিয়মানুবর্তিতা ও কর্মনিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কালবিলম্ব না করে তিনি সীমানা সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে বৃহত্তর এক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করলেন। শুরু হলো একযোগে বাংলা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ এবং মাদ্রাজের সীমান্ত সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা। আণ্ডার-সেক্রেটারী অফ স্টেট গড্‌লেকে তিনি লিখলেন—"আগামী প্রজন্মের স্বার্থের কথা ভেবে আমি এই সব মান্ধাতা-আমলের, অযৌক্তিক এবং কর্ম-কুশলতার পরিপন্থী প্রাদেশিক সীমানাগুলির সার্বিক পুনর্বিন্যাস চাই।"[৪০] পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেননি কার্জন। অ্যান্‌ড্রু ফ্রেজার তখন সবে বাংলার ছোটলাট হয়ে এসেছেন। তাঁকেই তিনি আদেশ দিলেন অবিলম্বে প্রাদেশিক সীমান্ত-পুনর্বিন্যাসের একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা পেশ করতে। "মহামহিম দেবরাজের" কুপিত হবার কোনও সুযোগ যাতে না থাকে সে জন্য কালক্ষেপ না করে ফ্রেজার ১৮৯৬ সালে তৈরী স্যর উইলিয়ম ওয়ার্ডের পরিকল্পনাটাই, সামান্য কিছু রদ-বদল করে, ১৯০৩-এর মার্চের শেষে কার্জনের দরবারে পেশ করলেন।[৪১] এটি পড়ে রিজলে চট্টগ্রামকে বাদ দেওয়ার বাণিজ্যিক সুবিধার কথা তুললেন, ইবেট্‌সন বাংলার ভার কমাবার কথা বললেন, একমাত্র ব্যামফিল্ড ফুলার ঢাকা ও মৈমনসিং-এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা জানালেন। কার্জনও ১৯০৩ সালের ১লা জুন ঐ পরিকল্পনাটার উপর বিস্তারিত একটা 'নোট' তৈরী করলেন। প্রশাসনিক সমস্যার উপর জোর দিয়েছিলেন তিনি। ভারতসচিবের অনুমোদন লাভ করে এই দলিলটি ৩রা ডিসেম্বর, ১৯০৩ খ্রীঃ 'রিজলে-পেপার' নামে সর্বসাধারণ্যে প্রকাশিত হলো।[৪২] এই দলিলের সুপারিশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা ও মৈমনসিং যুক্ত হবে আসামের সঙ্গে, ছোটনাগপুর মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে, আর মধ্যপ্রদেশ থেকে সম্বলপুর এবং মাদ্রাজ থেকে গঞ্জাম নিয়ে তাদের জুড়ে দেওয়া হবে বাংলার সঙ্গে। এই সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে বাংলার লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ থেকে কমে গিয়ে দাঁড়াবে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষে, আর তার ফলে জেলা শাসকরাও সক্ষম হবেন তাঁদের অধীনস্থ জনসাধারণের সুখদুঃখের প্রতি নজর দিতে। প্রস্তাবটিতে এ কথাও বলা হয়েছিল যে নতুন ব্যবস্থার ফলে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলিও কলকাতার 'সর্বগ্রাসী ও অহিতকর' প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে, মঙ্গল হবে ঐ অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসীদের। আসামের চা'ও চট্টগ্রাম বন্দর থেকে স্বল্পতর ব্যয়ে বিদেশে রপ্তানী করা যাবে। তা ছাড়া সমস্ত ওড়িয়া-ভাষী মানুষও একই সরকারের অধীনে আসবে, আর সহজতর হবে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।[৪৩]

ভারতবর্ষের শ্বেতাঙ্গ আমলারা কিভাবে ভাইসরয়দের (এমনকি কার্জনকেও) হাতের মুঠোয় পুরতেন—সীমানা পুনর্নির্ধারণের ব্যাপারটা তারই একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আগেই বিশদভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে বাংলা ভাগের এই পরিকল্পনাটা কার্জনের নয়, তা ছিল ফ্রেজারের মস্তিষ্ক-প্রসূত এবং রিজলে-অনুমোদিত। এটাকে বাংলার চরমপন্থী

আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ বলে বর্ণনা করলে অন্যায় হবে না। অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ঢাকা ও মৈমনসিং-এর মতো বাংলার কতকগুলি জেলাকে শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে করতেন।[৪৪] ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলা দিয়ে দিতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কলকাতার নেতারা এবং কয়েকটা খবরের কাগজ এই সব অঞ্চলে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছে। বেশি দেরী না করে এর একটা বিহিত করতে তিনি উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। রিজলেও তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন।[৪৫]

সরকারের এই দুরভিপ্রায় প্রকাশ পাওয়ামাত্র সমস্ত বাংলাদেশ যে প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী নব-গঠিত প্রদেশটি একজন চীফ্ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত হওয়ার কথা ছিল। তা ঘটলে বহু বাঙালী আইন-পরিষদ, বোর্ড অফ রেভিনিউ এবং কলকাতা হাইকোর্টের সুযোগ-সুবিধা হারাবে।[৪৬] তখন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন কটন। তিনি সরকারেব কাছে প্রস্তাব করলেন—হিন্দীভাষী বিহার ও ওড়িয়া-ভাষী উড়িষ্যাকে পৃথক করে শাসনতান্ত্রিক সমাধানের একটা যুক্তিসঙ্গত পন্থা নেওয়া হোক। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাংলার অতিকায় আয়তন হ্রাস পাবে (এইটেই ছিল বঙ্গ-বিভাগের স্বপক্ষে সরকারের প্রধান যুক্তি), অথচ বাঙালীদের সংহতিও রক্ষা পাবে। ১৯০৩ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে রিজলের পরিকল্পনাকে 'জঘন্য' আখ্যা দেওয়া হলো, কেননা তা ভারতের ঐক্যে আঘাত হানতে উদ্যত ; আর এটি কাজে পরিণত হলে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও নষ্ট হবে। সব চেয়ে পরিতাপের বিষয় যে এতো অর্থ ব্যয় করে, অগণিত মানুষের স্বার্থে এবং মনে ঘা দিয়ে মাত্র ১ কোটি ১০ লক্ষ লোক বাংলা থেকে সরানো হচ্ছে। এর ফলে অর্জিত প্রশাসনিক সুবিধাও হবে নাম মাত্র। আর একটা বিকল্প প্রস্তাব এল—মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মতো বাংলাকে গভর্নর-শাসিত প্রদেশে পরিণত করা হোক। এটা হলে গভর্নরের অধীনে একটা এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল থাকবে, সুতরাং প্রশাসনিক অনুপুঙ্খ সম্পর্কে অবহিত হওয়া গভর্নরের পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে না। অর্থাৎ রিজলে পরিকল্পনার দুটি বিকল্প পেশ করা হয়েছিল : (ক) বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং (খ) বোম্বাই ও মাদ্রাজের মতো বাংলাকেও একটা গভর্নর-শাসনাধীন প্রদেশে রূপান্তরিত করা। বলা বাহুল্য, প্রথম প্রস্তাবটি প্রবলপ্রতাপান্বিত আমলারা সরাসরি বাতিল করে দেন, এবং দ্বিতীয়টি মাত্র দুজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী—সি· সি· স্টিভেন্স এবং সি· ই· বাকল্যাণ্ড দ্বারা সমর্থিত হলেও, রিজলে কর্তৃক রূঢ়ভাবেই প্রত্যাখ্যাত হলো। হোম সেক্রেটারীর এমন একটা ধারণা হয়তো হয়েছিল যে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে নতুন গভর্নর আসবেন বিলেত থেকে এবং সেখানকার শাসকগোষ্ঠীরই একজন হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই তিনি এ দেশের আই· সি· এস-দের গ্রাহ্য করবেন না। তা ছাড়া তাঁর অধীনে গঠিত হবে একটা শাসন পরিষদ এবং তাতে প্রবেশাধিকারের জন্য বাঙালীরা তুমুল হৈ চৈ করতে আরম্ভ করবে। ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বড়ো রকমের ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করবে এবং কে বলতে পারে তার থেকে নতুন কোনও বিপদ দেখা দেবে না ?

এ সময়ে বাংলার লেঃ গভর্নর স্যর অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের উদ্যোগে বেশ কয়েকটা সম্মেলন বসেছিল বেলভেডিয়র-এ। এগুলির মাধ্যমে বাংলার বিক্ষুব্ধ নেতৃবর্গকে বোঝাবার, নরম করার লোক-দেখানো চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। আশুতোষ চৌধুরী বাংলার স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ থাকবেন এই ধারণাবশতঃ সুরেন্দ্রনাথ এর থেকে দূরে সরে ছিলেন। তাঁর আশা হয়েছিল যে জনমতের চাপে শেষপর্যন্ত সরকার দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে বাধ্য হবেন। আর,

সরকারী উদ্যোগ-আয়োজন এ সময়ে কিছুটা স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে কার্জনের জেদ কিন্তু রিজলের থেকে কম ছিল না। প্রাদেশিক সীমানা পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে সারা দেশের যে তীব্র বিক্ষোভের বিবরণ ভাইসরয়ের কাছে পৌঁছেছিল, সেটাকে তিনি অতিরঞ্জিত বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যটা ছিল এই রকম : "সীমানা-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা নতুন নয়, কিন্তু তিনি সমস্যাটার একটা যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান করা মাত্র সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো এই অভিযোগ তুলে প্রচণ্ড হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে যে তাদের চিরকালের জননীর বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে ; এই অপচেষ্টাটা শুধু ভুল নয়, তা একটা মহা অপরাধ।" আসামের সঙ্গে ঢাকা এবং মৈমনসিংকে সংযুক্ত করার প্রস্তাবে ঐ সব জায়গায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। 'কিন্তু', তিনি লিখেছেন, 'এ পর্যন্ত ঐ বিষয়ে, অন্তত পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে আমার হাতে শতাধিক যে সব চিঠিপত্র ও স্মারক-লিপি এসেছে সেগুলোর মধ্যে একটা লাইনেও যুক্তি নেই, আছে শুধু বাগাড়ম্বর এবং উচ্ছ্বাস।... এটা এমন একটা দেশ যেখানে জনমত কখনোই সুস্থির নয়, তা সব সময়েই গুজবের উপর নির্ভরশীল। এখানে সস্তা ভাবালুতা সমস্ত যুক্তিতথ্য ঢেকে দেয়, ফলে এ দেশে সুনির্দিষ্ট, অত্যন্ত জরুরী কোনও প্রশাসনিক সংস্কারের চেষ্টা কেউ করলেই তাঁকে বিরক্ত, ক্লান্ত এবং হতাশ হতে হবেই।'"[৭] আর, কংগ্রেসের নেতাদের মতো 'অশিক্ষিত, জড়-বুদ্ধি' কিছু মানুষের বস্তা-পচা, ছেঁদো বুলি এবং তার বিরক্তিকর পুনরুক্তি তিনি শুনবেন কেন ? আসলে একজন ইংরেজের প্রখর এবং সহজাত বুদ্ধি দিয়ে তিনি বুঝলেন যে তাঁর আমলারা ঠিক পথেই চলেছে : রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ নিশ্চয়ই অতি বাঞ্ছনীয় একটা ব্যবস্থা, তা নইলে কংগ্রেস ও বাঙালীরা এমন উন্মাদের মতো চেঁচায় কেন ?

এ সময়ে ভারতসচিব ব্রডরিককে লেখা একটা চিঠিতে কার্জনের আসল অভিসন্ধিটা উদ্ঘাটিত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, "বাঙালীরা নিজেদের একটা মহা জাতি মনে করে এবং তারা এমন একটা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যখন দেশ থেকে ইংরেজরা বিতাড়িত হয়েছে এবং জনৈক 'বাবু' কলকাতার লাট-প্রসাদে অধিষ্ঠিত ! এই সুখ-স্বপ্নের প্রতিকূল যে-কোনও ব্যবস্থা তারা নিশ্চয়ই ভীষণভাবে অপছন্দ করবে। আমরা যদি দুর্বলতাবশতঃ তাদের হট্টগোলের কাছে নতি স্বীকার করি তবে কোনও দিনই আর বাংলার আয়তন হ্রাস বা বাংলা ব্যবচ্ছেদ সম্ভব হবে না। (এ পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে) আপনি ভারতবর্ষের পূর্ব-সীমান্তে এমন একটা শক্তিকে সংহত ও সুদৃঢ় করবেন যা এখনই প্রচণ্ড, এবং অদূর ভবিষ্যতে যা সুনিশ্চিতভাবেই ক্রমবর্ধমান অশান্তির উৎস হয়ে উঠবে।"[৪৮]

এই মনোভাব নিয়েই কার্জন ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাঁর বহু-খ্যাত পূর্ব-বঙ্গ সফর শুরু করেছিলেন। মৈমনসিং-এ থাকার সময় ঢাকার নবাব ও চট্টগ্রামের সেরাজুল ইসলামের মতো গণ্যমান্য রহিসদের সমর্থনে ১৪ই ফেব্রুয়ারী রিজলে-পরিকল্পনার একটা ব্যাপকতর রূপ দিলেন তিনি।[৪৯] তাঁর প্রস্তাব ছিল যে রাজশাহী বিভাগ (দার্জিলিঙ বাদ দিয়ে কিন্তু মালদা সমেত), ঢাকা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ—সবটাই অন্তর্ভুক্ত হবে নব-পরিকল্পিত পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে। এর পর ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকাতে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তাতে তাঁর মত পরিবর্তনের কারণটা স্পষ্ট হয়ে গেল। বঙ্গ-বিভাগের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বললেন (শ্রোতারা অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান) "পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনগণ, প্রাচীন সুলতান ও সুবেদারদের আমল থেকেই, রাজনৈতিক ঐক্য-বঞ্চিত ; সে ঐক্য তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।"[৫০] বলা বহুল্য বাংলার লাগোয়া একটা মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ

প্রদেশ সৃষ্টি ইংরেজ শাসকদের কাছে অতি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক চাল হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছিল। কার্জনের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহায়তা করেছিলেন আমাদের পূর্বপরিচিত তিনজন সিভিলিয়ান—বাংলার ছোটলাট অ্যান্‌ড্রু ফ্রেজার, আমলা-প্রবর ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার (আসামের চীফ কমিশনার ও পরে পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম ছোটলাট) এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যর হার্বার্ট রিজলে। তবে পাবনা, বোগরা এবং রঙপুর ছাড়তে স্যর অ্যান্‌ড্রুর আপত্তি না থাকলেও ছোটনাগপুরকে বাংলা থেকে বাদ দেওয়ায় তাঁর মত ছিল না।[৫১] বাংলা থেকে বাদ-দেওয়ার উপযুক্ত জেলাগুলির তালিকায় রাজশাহী, দিনাজপুর, মালদা এবং কুচবিহারকে যুক্ত করতে উৎসাহী ছিলেন রিজলে। ফুলার বড়লাটকে বুঝিয়েছিলেন যে আসামের আয়তন আরও না বাড়ালে সেখানে কোনও দক্ষ, অভিজ্ঞ সিভিলিয়ান যেতে রাজী হবেন না। তবে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ তিনি চাননি। ১৮৯৬ সালের ওলড্‌হ্যামের মন্তব্য অনুযায়ী নতুন প্রদেশটিকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গড়ে তোলার সুপরামর্শ দিয়েছিলেন রিজলে। "ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটা শক্তি, কিন্তু বিভক্ত হলে তার শক্তি বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হবে। এটাই কংগ্রেসের নেতারা বুঝতে পেরেছেন...তাঁদের ভয় পুরোপুরি সমূলক, আর তা-ই বাংলা-ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান গুণ। আমাদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শক্তি-বিরোধী দৃঢ়বদ্ধ দলটাকে ভেঙে দুর্বল করে ফেলা।"[৫২] প্রস্তাবগুলি খুবই মনে ধরেছিল কার্জনের।[৫৩] নামমাত্র সুদে £ ১০০,০০০ পাউণ্ড ঋণদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁকে অতি সহজেই দলে টানলেন[৫৪] এবং একটা মুসলমান-প্রধান প্রদেশ গঠনের জন্য বড়লাটের এই প্রস্তাবে জয়ধ্বনি দেবার মতো মুসলমান শ্রোতা সংগ্রহ করতেও নবাব বাহাদুরের খুব বেশি অসুবিধে হয়নি।

অবশ্য এ তথ্য স্মরণ রাখা দরকার যে সব মুসলমানই নবাবের দলে ভেড়েননি। বঙ্গ-বিভাগের বিরোধিতায় হিন্দুদের সঙ্গে সমানভাবে সক্রিয় হয়েছিলেন আব্‌দুল রসুল এবং লিয়াকৎ হোসেনের মতো নেতা, দুঃখও বরণ করেছিলেন সমানভাবে। ১৯০৪ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে সরকারী প্রস্তাবের বিরূপ সমালোচনা আরেকবার ধ্বনিত হলো। কংগ্রেস সভাপতি কটন(সদ্য বিলেতপ্রত্যাগত) কার্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলেন, ইচ্ছা—তাঁকে বঙ্গ-ভঙ্গের পরিকল্পনা ত্যাগে রাজী করিয়ে বাংলাকে একটা গভর্নর-শাসিত প্রদেশে রূপান্তরিত করার জন্য অনুরোধ জানানো। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির এই মীমাংসা-সূত্রকে সামান্যতম গুরুত্ব দিতেও কার্জন রাজী ছিলেন না। তিনি তখন এক সর্বনাশা-রাজনীতির খেলায় মত্ত। পরিহাস করে গড়লেকে তিনি লিখলেন, "কংগ্রেস ছাড়া এখন সবাই বঙ্গ-বিভাগে রাজী। বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে ভবিষ্যতে (ভারতীয় রাজনীতিতে) বাংলার প্রভাব হ্রাসের আশঙ্কাই কংগ্রেসের এ জাতীয় মনোভাবের কারণ। তা ছাড়া (বাংলা বিভক্ত হলে) একজন'বাবু লেঃ গভর্নরের' অধীনে স্বাধীন বাংলার যে স্বপ্ন কটন দেখছেন তা-ও হবে সুদূরপরাহত।"[৫৫] বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে তাঁর পরবর্তী চিঠিটি (২রা ফেব্রুয়ারী ১৯০৫, লেখা) আরও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাগের পক্ষে সুপরিচিত সাফাই গাওয়া ছাড়াও এই চিঠিটির মধ্যে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পিছনের মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে কার্জনের নিজের অভিসন্ধিও প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, "কলকাতাকে কেন্দ্র করেই কংগ্রেস সমগ্র বাংলায়, এমন কি. গোটা ভারতবর্ষে, আন্দোলন পরিচালনা করছে। যারা এর কলকাঠি নাড়ছে, বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে মুখে ফেনা তুলছে, তারা সবাই কলকাতার বাসিন্দা। এই নেতাদের সংগঠনে কোনও দুর্বলতা নেই, আর নিজেদের স্বৈরতন্ত্র খাটাবার ব্যাপারেও তারা সিদ্ধহস্ত। কলকাতার

জনমত এদেরেই নিয়ন্ত্রণাধীনে, কলকাতা হাইকোর্টও তার থেকে মুক্ত নয়। স্থানীয় সরকারকে মাঝে মাঝেই তারা দিশেহারা করে তোলে, এমন কি ভারত সরকারের উপরও তারা প্রভাব বিস্তার করে। তাদের উদ্দেশ্য এমন একটা শক্তিশালী দল গঠন যা সরকারের সামান্য দুর্বলতার সুযোগেই নিজ দাবী পূরণে তাকে বাধ্য করবে। সেজন্য যে কোনও প্রস্তাব, যা বাংলা-ভাষীদের বিচ্ছিন্ন করবে বা যার ফলে অন্যত্র স্বাধীনভাবে ভিন্ন কোনও মত বা প্রতিপত্তি গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে, অথবা যা ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে কলকাতাকে করবে গদীচ্যুত এবং উকিল শ্রেণীর (যারা সমস্ত সংগঠনটা নিয়ন্ত্রণ করছে) প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করবে—তার তীব্র বিরোধিতায় তারা বদ্ধপরিকর। এদের প্রতিবাদ সব সময়েই উচ্চারিত হয় উগ্র ভাষায় এবং উচ্চগ্রামে। তবে তাকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, কেননা এ দেশেরই একজন আমায় বলেছেন যে 'সরকার কর্তৃক যে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের আগে আমাদের দেশের মানুষ স্বভাবতই প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে, আব সেটা গৃহীত হলে তারা একেবারে চুপ করে যায়'!"[৫৬] কংগ্রেস = কলকাতার নেতৃবর্গ = কলকাতার ব্যবহারজীবী—এ জাতীয় একটা অতি সরল সমীকরণ ছিল কার্জনের মনে। কিন্তু প্রতিবাদে কর্ণপাত করার পাত্র তিনি ছিলেন না। তাঁর এদেশীয় বিশ্বস্ত সংবাদদাতাটির মতো তিনিও জানতেন যে "বাঙালীদের মাত্রাজ্ঞান নেই, নেই বাস্তববোধ অথবা সাধাবণ-বুদ্ধির ছিটেফোঁটা।" তারা "সারা বছর ধরে ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরির মতো উত্তপ্ত ভাষায় অগ্ন্যুদ্গার করে, আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দেয় লাভার মতো বক্তৃতার কর্দম।"[৫৭] কিন্তু বাঙালীচরিত্র সম্পর্কে কার্জনের এই ভাসাভাসা জ্ঞান এবং তাচ্ছিল্যভাবই শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। অক্লান্তকর্মা কার্জনের অন্তর্দৃষ্টি ছিল কম, আরও কম ছিল তাঁর মানবিক সহৃদয়তা, আর সে কারণেই তাঁর নীতি যে কি পরিমাণে মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে তা তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি। বাঙালীর এই অন্তর্দাহকে তিনি তাঁর চিঠিপত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই উল্লেখ করেছেন ; তাঁর ধারণা ছিল প্রশাসনিক সুবিধা-অসুবিধাগুলিকে এ দেশের লোকজন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-ভাষণে কার্জন বাঙালী-হৃদয়ের জ্বালাটাকে আরও তীব্র করে দিয়েছিলেন, ক্ষতের সঙ্গে যোগ করেছিলেন অপমান। সমসাময়িক পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে এবং (বাঙালীর) জাতীয় চরিত্র বিষয়ে তিনি কয়েকটা 'সাদা, বিশুদ্ধ সত্য কথা' বলতে চেয়েছিলেন—এবং কথাগুলি, নির্মমভাবে না হলেও, বলেছিলেন রূঢ় ভাবে। কিন্তু রূঢ়তা নয়, তাঁর সীমাহীন অবজ্ঞাই ভাবপ্রবণ বাঙালীর মর্মে আঘাত করেছিল। এ দেশের মানুষের কাছে কার্জনের 'অতিকথন' বা 'বাগাড়ম্বর' অসহ্য ও অক্ষমনীয় হয়ে উঠেছিল, কেননা তাদের নিজেদেরও অল্প-বিস্তর এই সমস্ত দোষ ছিল। ১৯০৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষান্ত-ভাষণে কার্জন বলেছিলেন, "সত্যানুরাগকে আমি যদি বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশের মানুষের চরিত্র-ভূষণ রূপে বর্ণনা কবি তা হলে নিশ্চয়ই অতিরঞ্জন বা মিথ্যা-ভাষণের দায়ভাগী হবো না।" ভারতবর্ষের সব মানুষই যে অসৎ বা দুর্বল-চরিত্রের—তা হয়তো কার্জন বলতে চাননি, কিন্তু প্রতীচ্যের জাতিগুলির এই একপেশে চরিত্র-বন্দনা সেই সব মানুষের কাছে নিশ্চয়ই অবমাননাকর এবং অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল, যাদের উপর তিনি হঠাৎ বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার দুঃসহতর পরিবর্ধিত সংস্করণটা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "এই পরিবর্তিত পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছিল গোপনে, আলোচিত ও গৃহীত হয়েছিল আরও গোপনে যাতে জনসাধারণ তার বিন্দু-বিসর্গ না জানতে পারে। লর্ড কার্জনের পূর্ববঙ্গ সফরের পর ঝটিকা-পূর্ব স্তব্ধতা দেখে মনে

হয়েছিল বুঝি বা বঙ্গ-ভঙ্গর পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছে।"[৫৮] এটা কি পাশ্চাত্য সত্যানুরাগের নিদর্শন ? তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার সঙ্গে যে প্রজন্মের সুনিবিড় পরিচয় ছিল, যে সময় বাঙালীমাত্রই গভীর আগ্রহ এবং গর্বভরে পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন দেশে বিবেকানন্দের ধর্ম-বিজয়ের বিবরণ অনুধাবন করছিল, তারা শাসক গোষ্ঠীর এমন অন্যায় দাবীর কাছে মাথা নীচু করবে সে আশা করা যায় না। কার্জন ভুলে গিয়েছিলেন যে (বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে) তাঁর শ্রোতৃবর্গ উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের 'ইয়ং বেঙ্গলের' সদস্য নন, তাঁরা বিশ শতকের চরমপন্থায় দীক্ষিত বাঙালী। কার্জন ভুল করে এই ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে এটা শুধু বাংলা দেশের ব্যাপার। বোম্বাই নীরব, মাদ্রাজে কিছু বিক্ষোভ জমে উঠলেও তা অপ্রকাশিত, আর অন্যত্র কেউ-ই এ বিষয়ে আগ্রহী নয়। তিনি আশা করেছিলেন কংগ্রেস আর একদফা শূন্য-গর্ভ বাক্যের রঙীন ফানুষ উড়িয়ে ভাইসরয়ের শ্রাদ্ধের জন্য তৈরী হবে।[৫৯] তিনি ভাবতে পারেন নি যে বেনারসের কংগ্রেস অধিবেশন অতোটা নিরামিষ হবে না।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রস্তাব (যেটা স্বয়ং কার্জন রচনা করেছিলেন) ইংলণ্ডে পাঠানো হয় ১৯০৫ সালেব ২রা ফেব্রুয়ারী। ভারতসচিব ব্রডরিক ইতিমধ্যে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভের সংবাদ পেয়েছিলেন। তবে তিনি যে এ বিষয়ে খুব মন দিয়েছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তিনি অবশ্য বিভাজ্য জেলাগুলি পরিদর্শনের কথা বলেছিলেন, কিন্তু কার্জনকে এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর দেখে তিনি তাঁর সাধ্যমতো প্রস্তাবটি সমর্থনের আশ্বাস দেন।[৬০] ব্রডরিক এ আশাও প্রকাশ করেছিলেন যে কমিটি এবং কাউন্সিলে কার্জনের পরিকল্পনাটি যাতে অপরিবর্তিত থাকে তার ব্যবস্থা করতেও তিনি সক্ষম হবেন। ভারত সচিবের কাউন্সিলে কিন্তু প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। স্যর আলফ্রেড লিয়াল বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে বাংলার কয়েকটি জেলা—যেমন ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যাকে—একজন কমিশনারের অধীনে স্থাপন কবার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। প্রয়োজন হলে, সিন্ধু প্রদেশের নজিরে, এই কমিশনারকে লেঃ গভর্নরের ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে বলে তিনি জানান। তাঁর মতে সরকারের উদ্দেশ্য বাংলার লেঃ গভর্নরের দায়-দায়িত্ব হ্রাস এবং অনুন্নত জেলাগুলির উপর শাসকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা—'রাজদ্রোহী' বাঙালীদের শাস্তি বিধান নয়। কাউন্সিলের চাপে ভারতসচিব (ভারত সরকারের কাছে) জানতে চাইলেন—এ জাতীয় কোনও প্রস্তাব ১৯০৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারির আগে কার্জন বিচার-বিবেচনা করেছিলেন কিনা।[৬১] ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে কার্জন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে "'প্রস্তাবটি' গ্রহণের অযোগ্য কেননা তা অবাস্তব।" তাছাড়া এতে বাংলার লেঃ গভর্নরের দায়িত্ব বা কার্যভার বিন্দুমাত্র কমবে না ; বাংলার জন-সংখ্যা থেকে মাত্র ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক বাদ দিয়ে সমস্যাটির কোনও সুরাহা হবে না। কার্জন এ তথ্যটিও জানিয়ে দেন যে ঐ প্রস্তাবের দ্বারা আসামের উন্নতির সম্ভাবনা লোপ করা হবে ; সম্ভব হবে না তার জন্য দক্ষ এবং স্বতন্ত্র একটা 'ক্যাডার' সৃষ্টি। আসাম চিরদিনই অক্ষম, অনুপযুক্ত, অনিচ্ছুক প্রশাসনের অধীনেই থেকে যাবে। কাউন্সিলের প্রস্তাব মেনে নিলে "অবাঙালীদের বিচ্ছিন্ন করে বাঙালীদের সংহতি দৃঢ়তর করার পথ প্রশস্ততর হয়ে উঠবে—যে পরিণতিটা আমরা সবাই এড়াতে চাই। কংগ্রেস যে আমাদের প্রস্তাবটা অপছন্দ করছে সেটাই তার রাজনৈতিক মূল্যের সবচেয়ে বড়ো স্বীকৃতি।"[৬২] ব্রিটিশ সরকারকে কার্জন স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা যদি তাঁর পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন তবে ভারত

সরকারের মানমর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের নথি-পত্র থেকে জানা যায় যে সদস্যদের আপত্তি ব্রডরিক এবং গড়্‌লের বহু আয়াসে প্রশমিত হয়। ব্রডরিক অবশ্য তখনো কার্জনের যুক্তির সারবত্তা সম্পূর্ণ রূপে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর পরবর্তী ডেস্‌প্যাচে (৯ই জুন, ১৯০৫) বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনায় তাঁর সম্মতি জানিয়ে তিনি লিয়াল এবং অন্যান্য সদস্যদের আপত্তির কারণের কথা উল্লেখ করে নিজের বিবেকের (অত্যন্ত দেরীতে জাগ্রত) অস্বস্তির আভাসও দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : '৪ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষের এক বৃহৎ এবং মোটামুটি সুসংহত এক মানবগোষ্ঠী, কলকাতা যাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক জীবনের পীঠস্থান, তারা নিজ গোষ্ঠীর পাঁচ ভাগের তিনভাগ বহু দূর-স্থিত এক রাজধানীতে, নতুন এক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে চলে যাচ্ছে দেখে আপত্তি জানাচ্ছে। নিজেদের বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক যোগসূত্র ছিঁড়ে যাওয়ার এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবার আশঙ্কায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এতে আমি বিন্দুমাত্র অবাক হই নি।"[৬৩] এই মন্তব্য সত্ত্বেও ভারত সচিব কেন এই হঠকারিতা মেনে নিয়েছিলেন, সহ্য করেছিলেন এই অন্যায়—এ প্রশ্ন স্বভাতবই উঠতে পারে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে অধিকতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কার্জনের কাছে নতিস্বীকার করে ব্রড্‌রিক কর্তব্যভ্রষ্ট হয়েছিলেন।

বিলেতের সম্মতি পাবার পর কার্জন এবং অ্যানড্রু ফ্রেজার অবিলম্বে বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। কার্জন স্বয়ং রচনা করেছিলেন সরকারী আদেশ-নামা। সেটা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই। এর সামান্য কিছু পরেই বঙ্গ-ভঙ্গবিরোধী আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। 'সঞ্জীবনী' ২২শে জুন সর্বপ্রথম বয়কটের আহ্বান জানালেও 'বেঙ্গলী' তার সমর্থন করে ১২ই অগষ্ট। ৭ই অগষ্ট কলকাতার টাউন হলে যে ঐতিহাসিক সমাবেশ হয়েছিল তাতে নরেন্দ্রনাথ সেন-উত্থাপিত প্রস্তাবটা নিতান্তই মৃদু প্রকৃতির বলে মনে হয়। নরমপন্থীরা তখনো পর্যন্ত প্রতিরোধ নয়, প্রতিবাদের নীতিই আঁকড়ে ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার, কার্জনের আপত্তি সত্ত্বেও, বাংলা-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কিত কিছু কাগজপত্র পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করে প্রকাশ করেছিলেন ১০ই অক্টোবর। তিন সপ্তাহের জন্য প্রস্তাবটি কার্যকর করা থেকে বিরত থাকার জন্য ভাইসরয়কে অনুরোধও জানানো হয়। কার্জন কিন্তু আর সামান্য দেরী করতেও রাজী ছিলেন না। ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন হলো। বাংলা হারাল পনেরোটি জেলা, তার জনসংখ্যা হলো ৫ কোটি ৪০ লক্ষ (৪ কোটি ২ লক্ষ হিন্দু ও ৯০ লক্ষ মুসলমান)। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জনসংখ্যা হলো ৩ কোটি ১০ লক্ষ (১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান, ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু)।

জাতীয় পতাকায় 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র উৎকীর্ণ করে এই দুঃসহ অবিচারের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য বাঙালীরাও তৈরী হলো। এই নতুন জাতীয়তাবাদী ভাবপ্রবাহের কবির ভূমিকা নিলেন রবীন্দ্রনাথ। যে দেশ এবং জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করা হচ্ছে তার আশ্চর্যসুন্দর, মহিমময় রূপ উদ্‌ঘাটন করে তিনি উদ্দীপিত করলেন বঙ্গ-ভঙ্গবিরোধী আন্দোলন। তাঁ স্বদেশ বন্দনার গান এবং কবিতার প্রতিটি ছত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল স্মৃতি-সুরভিত, আবেগতপ্ত, তীব্র এক ভালবাসা যা দেশমাতৃকার মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের আহ্বান পৌঁছে দিল প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে।[৬৪] একজন সহৃদয় বিদেশী শ্রমিক-নেতা, র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড, এই সময়কার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে 'ডেইলী ক্রনিক্‌ল' পত্রিকায় লিখেছিলেন—কিভাবে দেশবন্দনা ও মাতৃপূজার মধ্য দিয়ে বাংলা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের

সৃষ্টি করছে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতগুলির কথা, যার সুর, তিনি লিখেছিলেন,—"আমাদের অজানা, যার সঙ্গে আমাদের গানের কোনও মিল নেই, তবুও সেগুলি, সারাদিন, অনুক্ষণ আমাদের কানে অনুরণিত হতে থাকে।" এজরা পাউণ্ডের ভাষায়, "গান গেয়েই ঠাকুর বাঙালীদের মহাজাতিতে পরিণত করলেন।" ১৯০৫ সালে বেনারস কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে গোখলে বললেন : "বঙ্গ-ভঙ্গের পরিকল্পনাটা অন্ধকারের আবরণে রচিত এক ষড়যন্ত্র, এবং বিগত অর্ধশতক ধরে বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে (দেশবাসীর) সুতীব্র বিক্ষোভের আত্মপ্রকাশ সত্ত্বেও তা বাস্তবায়িত করা হচ্ছে।" তাঁর বিচারে সমস্ত ঘটনাটি ছিল, "সমসাময়িক আমলাশাহী কর্তৃক জনমতকে অবজ্ঞা করার, দুঃসহ উচ্চমন্যতার এবং প্রজাদের কোমলতম অনুভূতিগুলির রূঢ় অবমাননার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। এতে শুধু প্রশাসনিক স্বার্থরক্ষার কথাই চিন্তা করা হয়েছে, একেবারেই পরিত্যক্ত হয়েছে জন-স্বার্থ এবং মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা।" তবে এই সরকারী অবিচারের একটা ভালো দিকও হয়তো ছিল। "বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সব থেকে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ ফল হলো এই যে এর মধ্য থেকেই সমস্ত দেশ দুর্জয় শক্তির একটা উৎস খুঁজে পেয়েছিল। এ জন্য গোটা ভারতবর্ষের ঋণ বাংলার কাছে···।"[৬৫]

১৯০৫ সাল জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটা অবিস্মরণীয়, যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবেই জনমানসে চিহ্নিত হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, ১৮৫৭ সালের পর, ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের তিক্ততা এ সময়েই তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জের কয়েকটি চিঠি (যেগুলি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 'ক্রু-পেপারস'এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) দিয়ে এই দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়ের উপসংহার করা যেতে পারে। একটা চিঠিতে হার্ডিঞ্জ ভারতসচিব ক্রুর কাছে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিয়ে লিখেছিলেন : "সন্দেহ নেই যে প্রশাসনিক সুবিধা বঙ্গ-ভঙ্গের অন্যতম কারণ ছিল, কিন্তু এই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটা কার্যকর করার সময় বাঙালীদের উপর একটা কঠিন আঘাত হানার ইচ্ছে অন্য উদ্দেশ্যগুলিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।" যে আশায় বাংলা ভাগ করা হয়েছিল তা যে অপূর্ণ থেকে গেছে তা-ও হার্ডিঞ্জ স্বীকার করেছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায় বাড়তি কিছু সুযোগ-সুবিধা পেলেও "বাঙালীর রাজনৈতিক সংহতি ক্ষুণ্ণ করা যায়নি। তাছাড়া বাঙালীর রক্তে রয়েছে বিক্ষোভ প্রকাশের উন্মাদনা এবং যতোদিন না বঙ্গ-ভঙ্গের কিছু পরিবর্জন বা পরিমার্জন হচ্ছে ততোদিন তারা আন্দোলন থেকে বিরত হবে না।"[৬৬] এর কারণটাও সহজবোধ্য। বাংলা এবং সদ্যোসৃষ্ট পূর্ববঙ্গ ও আসামের আইন পরিষদে বাঙালীরা হয়ে পড়েছিল সংখ্যালঘিষ্ট—প্রথমোক্ত প্রদেশটিতে বিহারী ও ওড়িয়াদের দ্বারা, এবং দ্বিতীয়টিতে মুসলমান ও অসমীয়াদের অন্তর্ভুক্তির ফলে। এখন যা অবস্থা, তাতে এই দুই প্রদেশের কোনওটিতেই তারা তাদের শিক্ষাদীক্ষা, সংখ্যা এবং আর্থিক সংগতি অনুযায়ী প্রাপ্য প্রাধান্য ভোগ করতে পারবে না। হার্ডিঞ্জ ছিলেন কার্জনের থেকেও কৌশলী। বাঙালীর ভাবপ্রবণতার সুযোগ তিনি নিয়েছিলেন। ১৯১১ খ্রীঃ দিল্লী দরবারে রদ করা হলো বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ। বিহার এবং উড়িষ্যা আলাদা হয়ে গেল বাঙলা থেকে, পূর্ববঙ্গ ও আসাম থেকে আসাম। উভয় বঙ্গ আবার যুক্ত হলো। কিন্তু ভাইসরয়ের শাসন-পরিষদ বাংলার সীমানা এমনভাবে নির্ধারণ করলেন যে নতুন বাংলায় মুসলমানরা, অল্প হলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে গেল। তা ছাড়া কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হলো মুসলমান শাসনের পাদপীঠ দিল্লীতে। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রদে সম্মতিদানের জন্যে এইটেই ছিল মুসলমানদের পুরস্কার।[৬৭] বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে পুলকিত হয়েছিলেন ক্রু।

তখন কেউ না বুঝলেও, নিয়তি আরও অনেক বেশী মর্মন্তুদ এক বঙ্গ-ভঙ্গের ইঙ্গিত দিয়েছিল। সীমাবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আপাত-সাফল্যে আত্মহারা বাঙালী কিন্তু সে দিনের সেই ভয়ঙ্কর দেওয়াল-লিখন পড়তে পারেনি।

তৃতীয় অধ্যায়
টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১। ভারত সচিবকে কার্জন, ২৩শে মার্চ, ১৮৯৯, Eur. Mss.D 510/1, p. 216 তালিকাটি বৃদ্ধি পেয়ে পরে ১২-তে দাঁড়ায়

২। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির পক্ষ থেকে হিউম এবং ওয়েডাববান-এর স্ট্যাণ্ডিং কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও সদস্যদের কাছে আবেদন, তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬-৯৭

৩। কংগ্রেসের আর্থিক সাহায্যের উৎস সম্পর্কে বেইলীর নোট, ১৮ই জুন, ১৮৯৯, তদেব, ২য় খণ্ড ; পৃঃ ৬৩-৬৭, ঐ উদ্দেশ্যে বোল্টনের চিঠি, ১৮ই জুলাই, ১৮৯৯, তদেব, পৃঃ ২২৭-৩০

৪। ভারত সচিবকে কার্জন, ১৪ই জুন, ১৮৯৯, তদেব, পৃঃ ২৫

৫। ঐ, ১লা, ফেব্রু, ১৯০০, তদেব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৭

৬। দাদাভাই নৌরজীকে ওয়াচা, ১৬ই ফেব্রু, ১৯০১, নওরোজি পেপার্স, ভারতীয জাতীয় অভিলেখ্যাগাব, নিউ দিল্লী।

৭। জর্জ হ্যামিলটনকে কার্জন, ১৮ নভেঃ, ১৯০০, Eur. Mss. D 510/6, pp. 293-94

৮। মেকলের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫, এইচ শার্প (সম্পাদিত), 'সিলেক্শন্স ফ্রম এডুকেশন্যাল রেকর্ডস', ১ম পর্ব, ১৭৮১-১৮৩৯, পৃঃ ১০৭ ও অন্যান্য

৯। সি· ই· ট্রেভেলিয়ান, দ্য এডুকেশন অফ দ্য পিপল্ অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৯২, ১৯৫

১০। হ্যালিডেকে উড, ২৪শে জুলাই, ১৮৫৪, উড পেপারস, (ইণ্ডিয়া বোর্ড) ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৪। ডালহৌসিকে উড, ৮ই জুন, ১৮৫৪, তদেব, পৃঃ ১১৮

১১। পার্লামেন্টে উড-এর ভাষণ, ২২শে জুলাই, ১৮৫৩; হ্যানসার্ড, CXXIX, পৃঃ ৬৮৫

১২। ট্রেভেলিয়ানকে উড, ৯ই এপ্রিল, ১৮৬০, উড পেপারস, (ইণ্ডিয়া অফিস), তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১—১০, ক্যানিংকে উড, ১৮ই এপ্রিল, ১৮৬০, তদেব, পৃঃ ২৮

১৩। ক্যানিংকে উড, ২৭শে অগষ্ট, ১৮৬০, তদেব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৪

১৪। ভারত সরকারের কাছে ভারত সচিবের নির্দেশ, ২৪শে ফেব্রু, ১৮৭৬, পার্লামেন্টারী পেপারস, দ্য সিলেকশন অ্যান্ড ট্রেনিং অফ ক্যান্ডিডেটস ফর দ্য আই· সি· এস· (১৮৭৬) সি· ১৪৪৬, পৃঃ ৩২৪-২৬ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ঊর্ধ্বতন বয়ঃসীমা ১৮৫৯ সালে ২২ বছর, ১৮৬৪ সালে ২১ বছর ও ১৮৭৬ সালে ১৯ বছর করা হয়।

১৫। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজের ভিত্তি দৃঢ়তর করার জন্যে ইংরেজ রাজকর্মচারীর আনুপাতিক সংখ্যাবৃদ্ধি অত্যাবশ্যক বলে মনে করতেন আরগিল, এবং এ কারণে তিনি 33 Vict. C 3 বিধান প্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। দ্রষ্টব্য : ভারত সরকারের কাছে ভারত সচিবের নির্দেশ, ২২শে অক্টো, ১৮৭২। পার্লামেন্টারী পেপারস, দ্য অ্যাডমিশন অফ নেটিভস টু দ্য সিভিল সার্ভিস অফ ইন্ডিয়া, (১৮৭৮-৭৯) C. 2376 ক্রমিক সংখ্যা ১৪

১৬। ভারত সচিবের কাছে ভারত সরকারের ২-৫-১৮৭৬ তাং চিঠির উত্তরে তাঁর পত্র, তদেব, ক্রঃ সংখ্যা ১৬। ১৮৭৭র ৩০শে মে'র লিটনের মিনিট দ্রষ্টব্য। লিটন পেপারস, Eur Mss E 218/520/Vol I, পৃঃ ৫৫৪-৮৯

১৭। রিপনের মিনিট, ১০ই সেপ্টে, ১৮৮৪ ; পার্লামেন্টারী পেপারস, করসপন্ডেনস্ অন দ্য এজ অ্যাট হুইচ ক্যাণ্ডিডেটস্ আর অ্যাডমিটেড ফর কমপিটিশন্ ইন ইংলণ্ড, (১৮৮৪-৮৫) C. 4580; encl. 3 of no 4.

১৮। লিটনকে সল্সবেরি, ২৭শে অক্টো, ১৮৭৬, Eur. Mss. E 218/516/Vol. I.

১৯। নর্থকোটকে লরেন্স, ১৭ই অগষ্ট, ১৮৬৭, লরেন্স পেপারস, (I.O.L.) Eur. Mss. F 90. ৪র্থ খণ্ড। জন স্ট্র্যাচির 'ইন্ডিয়া' (লণ্ডন, ১৮৮৮)-তেও অনুরূপ মত প্রকাশিত হয়েছে, পৃঃ ৩৫৮-৬১। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসি অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮৯-তে ৫ই

জুন, ১৮৭৬ তারিখের স্যর রিচার্ড টেম্পল্-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

২০। ক্র্যানবোর্নকে লরেন্স, ৮ই নভেম্বর, ১৮৬৬, লরেন্স পেপারস, পূর্বোল্লিখিত।

২১। হাউস অফ কমন্স-এ ভাষণ, ৫ই মে, ১৮৬৮, হ্যানসার্ড, CXCL, Col. 1845, মনে হয় তিনি যেন কর্নওয়ালিশ-এর (L.S.S. O' Malley, The Indian Civil Service, 1601-1930, P. 16) এবং জেমস মিল-এর (হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ২য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৫) মতের প্রতিধ্বনি করছেন। 'লেটাবস ফ্রম এ কমপিটিশনওয়ালার' গ্রন্থকারের পক্ষে এ জাতীয় মন্তব্য মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না।

২২। স্ট্রাচির মিনিট, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৬৮, Printed Notes no.C 114-427. নর্থকোটকে লেখা লরেন্স-এর চিঠিও দ্রষ্টব্য ; ১৭ই অগষ্ট, ১৮৬৭, পূর্বোল্লিখিত।

২৩। *লেডি বেটি বালফুর, পার্সোনাল লেটারস অফ রবার্ট আর্ল অফ লিটন* (১৯০৬) ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১

২৪। এ· পি· থর্নটন, ডকট্রিনস্ অফ ইম্পিরীলিয়াজম, (নিউ ইয়র্ক ১৯৬৫), পৃঃ ১৫৮

২৫। ম্যালেটকে বেয়ারিং, ২৫শে সেপ্টেঃ, ১৮৮২, Add. Mss. 43605, no 196 encl., Brit. Mus.

২৬। 'দ্য টাইমস' পত্রিকায় ষ্টিফেনের চিঠি, ১লা মার্চ, ১৮৮৩ , দ্য ফাউণ্ডেসনস্ অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, নাইন্টিনথ্ সেঞ্চুরী, অক্টো, ১৮৮৩, পৃঃ ৫৪৮-৬১।

২৭। রবীন্দ্রনাথ, 'ইম্পিরীয়ালিজম', ভারতী, বৈশাখ সংখ্যা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

২৮। ডাফরিনকে ক্রশ, ৮ই সেপ্টেঃ, ১৮৮৬, ডাফরিন পেপারস, (মাইক্রোফিল্ম), ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী।

২৯। কিম্বারলেকে ডাফরিন, ২৬শে এপ্রিল, ১৮৮৬, Eur. Mss. E. 243/21, P. 12; ক্রশকে ডাফরিন, ১৭ই অগষ্ট, এবং ২৯শে অক্টোবর, ১৮৮৮, তদেব, পঞ্চবিংশতি খণ্ড ; 'সেন্ট অ্যাণ্ড্রুস ডে ডিনার স্পীচ', ৩০শে নভেঃ, ১৮৮৮।

৩০। ডাফরিনের মিনিট, নভেঃ, ১৮৮৮। ইন্ডিয়া পাবলিক লেটারস, ৯ম খণ্ড, ১৮৮৮, পৃঃ ১১৯৫-১২০০।

৩১। পার্লামেন্টারী ডিবেটস্ অন ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স, ১৮৯২, পৃঃ ১২৫-৩২

৩২। ষ্ট্যাটুট ১৬ ও ১৭ ভিক· সি· ৯৫, এস ১৬ ও তদনুসারে ভারত সরকার (হোম), ১৮৫৪-এর ২০ এপ্রিলের ৪১৪ সংখ্যক প্রস্তাব অনুসারে বাংলা আলাদা প্রদেশ হয়। দি ফার্স্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্টে (১৮৫৫-৫৬) বাংলার আয়তন দেখান হয়েছিল, ২,৫৩,০০০ বর্গ মাইল ও জনসংখ্যা ৪ কোটি।

৩৩। নর্থকোটকে লরেন্স, ৩০শে জুলাই, ১৮৬৭, লরেন্স পেপারস, পূর্বোল্লিখিত, ৪র্থ খণ্ড, ও গভর্নর জেনাবেলের মেমো, ২০ জানুয়ারী, ১৮৬৮, হোম (পাব্) কনসালট ১৪৮-৬৩, ২৮ মার্চ, ১৮৬৮, পৃঃ ২৫-২৭।

৩৪। নর্থকোটকে লরেন্স, ২২শে জানুয়ারী, ১৮৬৮, পূর্বোল্লিখিত, ৫ম খণ্ড।

৩৫। নর্থব্রুককে ক্যাম্পবেল, ৮ ও ১৮ই সেপ্টে· ১৮৭২· Eur. Mss. C 144 ভারতবর্ষে অবস্থানরত বিভিন্ন জনের সঙ্গে লর্ড নর্থব্রুকের পত্র বিনিময়, কালসীমা—৮ই মার্চ—৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৭২।

৩৬। ভারতবর্ষ থেকে এবং বাংলা থেকে 'পাবলিক' চিঠি, ১৮৯৭, চতুর্বিংশতি খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫-৬৮। এই প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের কমিশনার ওলড্হ্যামের একটা নোট স্মরণীয়। তিনি আসামকে পূর্ববঙ্গের কিছু জেলা দিতে চেয়েছিলেন মুসলিম স্বার্থে, হিন্দু ভদ্রলোকদের অত্যাচার থেকে তাদের বাঁচাতে। বাংলা সরকারকে ডব্লু· বি ওল্ডহ্যাম, নং ৭২২ জি, ৭ ফেব্রু· ১৮৯৬, হোম· পাব্· মে, ১৮৯৭, ২০৪-২৩৪ এবং ১ কিপউইথ।

৩৭। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৮৪-৮৫

৩৮। ভারত সচিবকে কার্জন, ১১ই মার্চ, ১৯০০, Eur. Mss. D. 510/4 pp. 167-8.

৩৯। ঐ, ৩০শে এপ্রিল, ১৯০২, তদেব, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৬৩

৪০। ঐ,৩০ এপ্রিল, ১৯০৩

৪১। স্যর অ্যানড্রু ফ্রেজারের নোট, ২৮ মার্চ, ১৯০৩, হোম· পাব· প্রসিডিংস (এ) ডিসেম্বর, ১৯০৩, নং ১৪৯-৬০

৪২। বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবের কাছে ভারত সরকারের চিঠি, ৩রা ডিসে· ১৯০৪, নং ৩৬৭৮। স্যর হার্বার্ট রিজলে তখন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব। তাঁর খসড়ায় রাজনৈতিক কারণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কার্জন তা বদলে দেন। কার্জনের নোট, ১০ই নভেম্বর, ১৯০৩।

৪৩। পার্লামেন্টারী পেপারস, ১৯০৫, সি· ২৫৬৮ ও হোম· পাব্· (এ) ডিসেম্বর, ১৯০৩, নং ১৪৯-৬০

৪৪। কার্জনের ১লা জুন, ১৯০৩-এর মিনিটে এমন ইঙ্গিত আছে।

৪৫। বাংলা সরকারের নং ৫০৬৩ জে· ২১শে ডিসে· ১৯০৩-এর উত্তরে রিজলের চিঠি, নং ৩৮০৮, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০৩, হোম· পাব্· প্রসিডিংস্ (এ) ডিসে· ১৯০৩ নং ১৫৯-৬০

৪৬। ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে আবেদন ও স্মারকলিপি, বাংলা সরকারের চিঠি, নং ২৫৫৬, জে· ৬ই এপ্রিল, ১৯০৪ হোম· পাব· প্রসিডিংস (এ) নং ১৫৬, ফারদার পেপারস্ রিলেটিং টু দ্য রিকনস্ট্রাকসান অফ বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম, হাউস অফ কমন্স, ১৯০৬, ৮১ খণ্ড 'সি' ২৭৪৬

৪৭। ব্রডরিককে কার্জন, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯০৩, করসপণ্ডেনস্ উইথ দ্য সেক্রেটারী অফ স্টেট ; ইত্যাদি, ১৯০৩, ব্রিঃ, মিউঃ পৃঃ ৪৫২-৫৩

৪৮। তদেব, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪, কার্জন পেপারস, ১৬৩তম খণ্ড, ২য় পর্ব, সংখ্যা ৯

৪৯। কার্জনের নোট, ১৪ ফেব্রু, ১৯০৪, হোম· পাব· ফেব্রু· ১৯০৫, নং ১৫৫-১৬৭এ

৫০। ঢাকায় প্রদত্ত ভাষণ, ১৮ই ফেব্রু ১৯০৪, পার্লামেন্টারী পেপারস, ১৯০৫, 'সি' ২৭৪৬, পৃঃ ২২২ ব্রডরিককে লেখা পূর্বোল্লিখিত চিঠিটি আগের দিন (১৭ই ফেব্রু) লেখা হয়েছিল

৫১। ফ্রেজারের নোট, ভারত সরকারকে বাংলা সরকার ৬ এপ্রিল, ১৯০৪, নং ২৫৫৬ জে

৫২। রিজলের নোট, ৭ ফেব্রু, ১৯০৪, হোম· পাব· প্রসিডিংস(এ) ফেব্রু, ১৯০৫, নং ১৫৫ ও ৬ই ডিসেঃ, ১৯০৪, ঐ, নং ১৬৪

৫৩। কার্জনকে অ্যাম্পথিল, ১৯শে সেপ্টেঃ, ১৯০৪, অ্যাম্পথিল করসপণ্ডেনস্ Eur. Mss. E. 233/37, P. 214; দ্রষ্টব্য—স্যর অ্যানড্রু ফ্রেজার, ২১শে এপ্রিল, ১৯০৪ ও ব্যামফিল্ড ফুলার, ৫ই এপ্রিল, ১৯০৪—এগুলির মধ্যে এমন বহু তথ্য আছে যেগুলি সরকারী চিঠিপত্রে প্রকাশ করার অসুবিধে ছিল।

৫৪। ১৯০৬-এর কংগ্রেস অধিবেশনে নবাব আতিকুল্লা খাঁর ভাষণ, ক্রুকে লেখা হার্ডিঞ্জের চিঠির মধ্যে এর সমর্থন মেলে, ২৪শে অগষ্ট, ১৯১১।

৫৫। গডলেকে কার্জন, ৫ই জানুয়ারী, ১৯০৫, করসপণ্ডেনস্ উইথ সেক্রেটারী অফ স্টেট, ইত্যাদি, ১৯০৪-৫, ব্রিঃ মিঃ, পৃঃ ২০-২১

৫৬। ব্রডরিককে কার্জন, ২রা ফেব্রু, ১৯০৫, তদেব, পৃঃ ৫১-৫২

৫৭। ঐ, ২৩শে মার্চ, ১৯০৫, তদেব, পৃঃ ৯২। ডেনজিল ইবেটসন মন্তব্য করেছিলেন 'নেটিভরা নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নেবে।' ইবেটসনের নোট, ৮ই ফেব্রু, ১৯০৪।

৫৮। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৮৬

৫৯। গড্‌লেকে কার্জন, ১৬ই মার্চ, ১৯০৫, ভারত সচিবকে চিঠি, ১৯০৪-৫, ব্রিঃ মিউঃ, পৃঃ ৯০

৬০। কার্জনকে ব্রডরিক, ৩রা মার্চ, ১৯০৫, ভারত সচিবের চিঠি, ১৯০৪-৫, ব্রিঃ মিউঃ পৃঃ ৬০

৬১। কার্জনকে ভারত সচিব, ২০শে মে, ১৯০৫, ভারত সচিব ও ভাইসরয়ের মধ্যে টেলিগ্রামের আদান-প্রদান, ব্রিঃ মিউঃ, সংখ্যা ২৩৭

৬২। ব্রডরিককে কার্জন, ২৪শে মে, ১৯০৫, তদেব, সংখ্যা ২৮৪

৬৩। ডেসপ্যাচ, নং ৭৫ (পাবলিক) ৯ই জুন, ১৯০৫, হোম পাব (এ) প্রসিডিংস, অক্টোবর, ১৯০৫, নং ১৬৩-৯৮। পার্লামেন্টে উপস্থাপিত দলিলপত্রে এই অংশটুকু অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৬৪। মডার্ন রিভিয়ু, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৫৮ ও অন্যান্য। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতের বেশীর ভাগই প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১২ বঙ্গাব্দ ভাদ্র ও আশ্বিনের 'ভাণ্ডার' পত্রিকাতে, এবং ১৩১২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যার 'বঙ্গ দর্শনে'। আশ্বিনের মাঝামাঝি সময়ে 'বাউল' পত্রিকায় এই গানগুলি সংকলিত হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী', ২য় খণ্ড (পরিবর্ধিত সংস্করণ), ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১২৬ ও তৎপরবর্তীতে 'রাখীবন্ধন' উৎসব রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৬৫। গোখ্‌লের এই মনোভাব গড়ে তোলার পিছনে ভগিনী নিবেদিতার অবদান ছিল বলে অনুমান করা হয়। গোখ্‌লেকে নিবেদিতার পত্র ২০শে সেপ্টেঃ, ১৯০৫, ভি· ভি· পেন্ডসের 'গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লেকে লেখা নিবেদিতার পত্র' প্রবন্ধে উল্লিখিত, সিস্টার নিবেদিতা বার্থ সেন্টেনারী স্যুভেনির, অক্টো, ১৯৬৬। কিন্তু বেনারসের পূর্বেই গোখলের লণ্ডন বক্তৃতাবলীতে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধিতার সুর ও বয়কটের হুমকি শোনা গিয়েছিল। কাভে ও আম্বেদকর (সম্পাঃ) গোখ্‌লেজ স্পীচেস অ্যান্ড রাইটিংস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২১-২৫

৬৬। ক্রুকে হার্ডিঞ্জ, ১৩ই জুলাই, ১৯১১, ক্রু পেপারস, (কেমব্রিজ ইউনিঃ গ্রন্থাগার); লর্ড হার্ডিঞ্জ, মাই ইন্ডিয়ান ইয়ার্স, ১৯১০-১৬ (লন্ডন, ১৯৪৮), পৃঃ ৩৭-৪০

৬৭। ক্রুকে হার্ডিঞ্জ, ২৪শে অগষ্ট, ১৯১১, তদেব। ভারত সরকারকে ভারত সচিব, ১লা নভেম্বর, ১৯১১, পার্লামেন্টারী পেপারস, 'সি' ৫৯৭৯, ১৯১১।

চতুর্থ অধ্যায়

সক্রিয় চরমপন্থা

চরমপন্থায় বিশ্বাসী নেতাদের চিন্তাধারায় দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে কোনও মৌলিক তত্ত্বের উন্মেষ ঘটেনি। দাদাভাই নৌরজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে এবং রমেশচন্দ্র দত্ত ব্যাখ্যাত অর্থনীতির সুপরিচিত সূত্রগুলির উপরেই তাঁরা তাঁদের ধ্যান-ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। একটু উচ্চগ্রামে হলেও, সেই একই সুরে বাঁধা ছিল চরমপন্থীদের এ দেশের অর্থনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় বক্তব্য। তাঁদের কণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—'হোমচার্জে'র চাপে 'ধন-নিষ্কাশনে'র বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তনের ফলে দেশের সুপ্রাচীন কুটির শিল্পগুলির ধ্বংসের বিরুদ্ধে ধিক্কার। সদ্যোজাত দেশীয় শিল্পগুলির সকরুণ অবস্থা তাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ইংলণ্ডে কাঁচামাল রপ্তানী ও আমদানী-কৃত বিলেতী মাল বিক্রির সুবিধের জন্য রেলপথের অহেতুক সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে তাঁরাও উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন এবং অত্যধিক রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের সর্বনাশ ও দুর্ভিক্ষের পৌনঃপুনিক আবির্ভাবের জন্য সরকারের সমালোচনাতেও তাঁদের ক্লান্তি ছিল না। দাদাভাই নৌরজীর বিশ্লেষণ-ধর্মী "পভার্টি অ্যান্ড আন্-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া"র তুলনায় সখারাম দেউস্করের 'দেশের কথা' (১৯০৪) অবশ্যই ব্রিটিশ অর্থনীতির কঠোরতর সমালোচনা।[১] তবু অরবিন্দও স্বীকার করেছিলেন, "ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের যে লজ্জাকর ছবি রমেশচন্দ্র দত্তের 'ইকনমিক হিস্ট্রী'তে উদ্ঘাটিত হয়েছে তার সহায়তা ছাড়া বয়কট নামক অস্ত্র প্রয়োগের জন্য জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি এতো সহজে গড়ে উঠতো না। এই একটি ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে রমেশচন্দ্র শুধু ইতিহাস রচনাই করেন নি, তা সৃষ্টিও করেছেন।"[২] কিছু ব্যাপারে নরমপন্থীদের মধ্যেও মতদ্বৈধ দেখা যায়, কিন্তু ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির মৌলিক সূত্রগুলির সব অবস্থায় এবং সব দেশে প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে রানাডের আপত্তি এবং অর্থনীতির ব্যাপারে আপেক্ষিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ—নরম ও চরম—উভয় পন্থায় বিশ্বাসীদের চিন্তাধারার একটা ছক তৈরী করে দিয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে নরমপন্থীরা ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য ঘোষণায় অতি আগ্রহী হলেও, মন্ময় বিচারে তাঁরাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের (যাকে তাঁরা বিধির বিধান ভাবতেন) অস্তিত্বনাশে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং তাঁদেরও রাজদ্রোহিতার একটা প্রধান উৎস বলে মনে করা যেতে পারে।[৩] তাঁরা বুঝেছিলেন ভারতীয় অর্থনীতির অধীনতামূলক ভূমিকাতেই নিহিত ছিল সাম্রাজ্যের সার তত্ত্ব, আর অধীনতার প্রতীক হলো-সম্পদ নিষ্কাশন এবং বহিঃপ্রকাশ—দেশ জোড়া দারিদ্র্য। তাঁরা শুধু অর্থনৈতিক শেকলটাই আলগা করে দিতে চান নি, দেশের স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তিস্থাপনও করতে চেয়েছিলেন। তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মতোই, হয়তো তার চেয়েও বেশী করে, স্বদেশের অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশ নরমপন্থীদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য, শুল্ক ও মুদ্রা ব্যবস্থা, আর্থিক সংস্থান—এমন কি

কৃষি ও শিল্প-উৎপাদনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করে নরমপন্থীরা ভারতবর্ষে শিল্প বিপ্লবের একটা উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরা শ্রেণী বিশেষের লাভ চেয়েছিলেন এমন অপবাদ সত্য নয়। আয়কর কমানো বা তুলোর উপর উৎপাদন শুল্ক হ্রাসের জন্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে লবণ কর এবং খাজনা কমানোর জন্যও বেশ কিছু নরমপন্থী সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ কথা সত্য যে কৃষক ও শ্রমিকদের বিশেষ শ্রেণীগত দাবী প্রতিষ্ঠার কথা তাঁরা আদপেই চিন্তা করেননি। কিন্তু এ বিষয়ে চরমপন্থীরাও যে খুব বেশি প্রগতিশীল ছিলেন তাও বলা যায় না। নরমপন্থীরা মনে করতেন যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ফলে উপকৃত হবে সর্ব শ্রেণীর মানুষ। সর্বহারা এবং ধনিক শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সুবিচার স্থাপনের কোনও প্রচেষ্টা তাঁদের আন্দোলিত করেনি ; তাঁরা সারা দেশের জন্য চেয়েছিলেন সুবিচার। দেশে ঐক্য স্থাপন যখন অত্যন্ত জরুরী তখন বিভেদ-বিচ্ছেদের ওপর জোর দেওয়া ভুল হবে বলে মনে করতেন তাঁরা। এঁদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে এবং পৃষ্ঠপোষকদের ধনী-ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সঙ্গে সমগোত্রীয় ভাবা ঠিক হবে না। বোম্বাই-এর কাপড়-কলের মালিকরা নরমপন্থীদের সমর্থনে কদাপি আগ্রহান্বিত না হওয়ায় তাঁদের প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করতে হয়েছিল রাজন্যবর্গ বা ভূস্বামীদের বদান্যতার উপর। আসলে নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য ছিল না, পার্থক্য ছিল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অগ্রাধিকার নির্বাচনে। ভারতবর্ষের দুঃসহ দারিদ্র্যের জন্য উভয় দলই দায়ী করেছিলেন ইংরেজদেব (দাদাভাই নৌরজীর ভাষায় আন্-ব্রিটিশ), তবে নরমপন্থীরা যেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত ছিলেন, তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা সেখানে তার অবসান ঘটানোতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন ; আর এইটেই তাঁদের মতে ছিল ভারতবর্ষের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের পূর্বসর্ত।

সুরেন্দ্রনাথের বিচারে বাংলার প্রতি গভীর অবিচারের (বঙ্গ-ভঙ্গ) প্রতি ব্রিটিশ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল বয়কটের অদ্বিতীয় লক্ষ্য, বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করে বাঙালীদের অভিযোগ দূর করলেই বয়কটের প্রয়োজনও ফুরোবে। বয়কটকে এঁরা 'ম্যানচেষ্টারের' বিরুদ্ধে একটা 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর বেশি কিছু মনে করতেন না। 'হোয়াইট হল' থেকে সহৃদয়তার উষ্ণ বাতাস বইতে শুরু করলেই তার অবসান হবে। একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যবহার্য বিশেষ রাজনৈতিক অস্ত্র ছাড়া বয়কটের দ্বিতীয় কোনও সংজ্ঞা গোখ্‌লের মাথাতেও আসেনি। তিনি এবং সুরেন্দ্রনাথ ভারতপ্রেমী ইংরেজদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাননি।[১] লাজপৎ রায়ের কণ্ঠে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন : "স্বীকার করি, ব্রিটিশ জনমতের ক্ষমতা আছে আমাদের অভিযোগ দূর করার, কিন্তু পকেটে টান না পড়লে ভারতীয়দের প্রতি অবিচারের দিকে তাদের দৃষ্টি কি আকর্ষিত হবে ? আত্মিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর অভ্যেস ইংরেজদের কোনও দিনই নেই। সুতরাং নৈতিকতা, সুবিচার, ঔচিত্য-অনুচিতের প্রশ্ন তুলে তাদের কাছে আবেদন করা অরণ্যে রোদন করারই সামিল হবে। ইংরেজরা অত্যন্ত আত্ম-সচেতন, স্বাবলম্বী ; অহঙ্কার তাদের রক্তে, আর সে জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে আত্ম-সম্মান বোধ ও আত্ম-নির্ভরতার প্রকাশ দেখলে তারা খুশীই হয়।"[২] তিলক, বিপিনচন্দ্র এবং অরবিন্দ বয়কটের মধ্য দিয়ে দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করতেন। তাঁরা ম্যানচেষ্টারের উপর বৈষয়িক চাপ সৃষ্টি করে তার দ্বারা ব্রিটিশ সরকারকে রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন ; দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে বয়কটকে তাঁরা ব্রিটিশ শক্তির 'মায়া' দূরীকরণের কাজে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। চরমপন্থীদের আশা ছিল বয়কটই দেশবাসীকে স্বরাজের জন্য

প্রয়োজনীয় 'ত্যাগ' স্বীকারে উদ্দীপিত করবে। তিলক বয়কটকে 'বহিষ্কারের যোগ', বা আত্ম-নিগ্রহের একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'স্বদেশী'র মধ্যে গোখ্‌লে দেখেছিলেন রানাডের কাছ থেকে আহরিত ভারতে শিল্পবিপ্লব সম্পর্কিত ধারণার বাস্তবায়নের একটা প্রকৃষ্ট উপায়। সুরেন্দ্রনাথও স্বদেশী আন্দোলনকে মূলত ভারতীয় শিল্প-সংরক্ষণের একটা প্রয়াস রূপে বর্ণনা করেছিলেন। চরমপন্থীদের কাছে কিন্তু 'স্বদেশী'র সংজ্ঞা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পার্থিব সুখ-বৃদ্ধির বাহন হিসেবে নয়, তিলক এবং লাজপৎ 'স্বদেশী'র নৈতিক মূল্যের উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 'স্বদেশী' যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্রতর করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে স্বাবলম্বন, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি গুণে ভূষিত করবে—সে বিষয়ে তাঁদের সন্দেহ ছিল না। আরও মহৎ এবং ব্যাপক এক লক্ষ্য 'স্বদেশী'র মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখেছিলেন অরবিন্দ। তাঁর এ প্রত্যয় ছিল যে স্বাধিকার এবং স্বচ্ছলতালাভের মতো বিশুদ্ধ বৈষয়িক লক্ষ্য পূরণ কখনোই এর উদ্দেশ্য হতে পারে না ; ভারতবর্ষই যে একদিন মানব সমাজের ত্রাতা হবে—বিশ্বাসের এই দৃঢ়ভূমিতে 'স্বদেশী'ই সুনিশ্চিতভাবে এদেশের মানুষকে পৌঁছে দেবে বলে তিনি ঘোষণ করেছিলেন।

বিদেশী সরকারের শোষণ নীতির বিরুদ্ধে সাধারণভাবে উষ্মা প্রকাশ ছাড়াও বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে তার নগ্ন রূপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছিল চরমপন্থীদের। চেনাব উপত্যকায় যারা বসতি স্থাপন করেছিল তাদের উপর সরকারী অত্যাচারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন লাজপৎ। অশ্বিনীকুমার দত্তও এগিয়ে এসেছিলেন বরিশালের কৃষকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে। রাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ হবার আগে 'খাজনা-বন্ধ' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। কিন্তু নরমপন্থীরাও এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র (কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ থাকলেও, দৃষ্টিভঙ্গীতে নরমপন্থী) চা-বাগানের কুলিদের জন্য সমবেদনা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশে কার্পণ্য করেননি। ১৮৮৬-র ডিসেম্বরে এবং আবার, ১৮৮৮-র মে মাসে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এদের দুর্দশার কথা জানিয়ে সরকারের কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন। অন্যায় অবিচারের প্রতিকারের জন্য আন্দোলনের সংখ্যার উপর নয়, এই দুই শ্রেণীর রাজনীতিকদের বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠেছিল তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। বাস্তবের কঠিন ভূমিতে দাঁড়িয়ে নরমপন্থীরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন নির্দিষ্ট অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে; অপর পক্ষে, চরমপন্থীরা, বিশেষ করে অরবিন্দের নেতৃত্বে, সাময়িক ও সীমিত প্রতিকারেই সন্তুষ্ট থাকতে চাননি। বিদেশী শাসনের কিছু উপসর্গ নিরাময় নয়, দুষ্ট-ক্ষতসম বিদেশী শাসনকে নির্মূল করতেই তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

অবশ্য বয়কট এবং স্বদেশী-সম্পর্কিত ধারণা এ দেশে অভিনব ছিল না। ১৮৮১ সালেই বয়কটের কথা উঠেছিল এবং ১৮৯৬ সালে তা প্রয়োগেরও চেষ্টা হয়েছিল। স্বদেশীর কথা শোনা গিয়েছিল ১৮৪৯ সালে—গোপাল রাও দেশমুখের কণ্ঠে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্‌গাতা রূপে সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ থেকেই হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে স্বদেশী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।' মহারাষ্ট্রে স্বদেশীর গুণগানে মুখর হতে দেখা গিয়েছিল মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, জি· ভি· যোশী (সর্বজনিক কাকা) এবং ভি· ফাডকে-কে। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬-এর মধ্যে 'মুখার্জীজ ম্যাগাজিনে' স্বদেশী সম্পর্কে দীর্ঘ এবং মূল্যবান একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন ভোলানাথ চন্দ্র।

'বয়কট' শব্দের বদলে তিনি ব্যবহার করেছিলেন 'নৈতিক শত্রুতা', যার ব্যবহারে রাজা, জমিদার এবং বাবুদের দ্বারা যে ক্ষতিসাধন হয়েছে তার নিরাময় হবে। তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের সক্রিয় সহযোগিতাই ম্যানচেষ্টারের শ্রীবৃদ্ধির কারণ, আর তা বন্ধ করে দিলে বিদেশী শিল্পের অধঃপতন অনিবার্য।"

এ জাতীয় চিন্তা ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগের সীমানা ছাড়িয়ে একটা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নেয় যখন ১৮৯০-এর দশকে বিভিন্ন শিল্প-সম্মেলন এবং প্রাদেশিক সভাসমিতিগুলিতেও এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবী উচ্চারিত হতে থাকে। ১৮৯১ এবং ১৮৯৪ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বিষয়টি উত্থাপন করেন লালা মুরলীধর। ১৮৯৪ সাল থেকে সরকারের শুল্ক সংক্রান্ত নীতি বয়কটকে দানা বাঁধার একটু সুযোগ এনে দেয়। স্বদেশী জিনিষকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগের কথা সকলেরই জানা। ১৮৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথ পত্তন করেন 'স্বদেশী ভাণ্ডার', ১৯০৩-এ সরলাদেবী 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। 'ডন' সোসাইটিও ১৯০৩ সালে একটা স্বদেশী বিপণির পরিচালন ভার গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। স্বদেশী শিল্পোৎপাদনে অতি উজ্জ্বল একটা ভূমিকা নিয়েছিলেন জে· চৌধুরী। তাঁরই চেষ্টায় ১৯০১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সঙ্গে শিল্প-প্রদর্শনীর যে ব্যবস্থা হয়েছিল তা পরবর্তীকালেও অব্যাহত থাকে। 'স্বদেশী' পরোক্ষ ভাবে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের ভূমিকা নিতে পারে বলে রানাডেরও বিশ্বাস ছিল।[৯]

চরমপন্থীরা এই আদর্শগুলিকেই গুণ এবং পরিমাণের দিক থেকে বাড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। অরবিন্দ এবং বিপিনচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল বয়কটকে ব্যাপকতর করে তাকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের স্তরে তোলা। শুধু বিলেতী পণ্য বর্জনই নয়, বয়কটের পরিধির মধ্যে বিদেশী সরকারের সমস্ত প্রকাশকেও তাঁরা অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই দুই নেতার বক্তব্য ছিল—দেশবাসীর কর্তব্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারে অথবা যার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ আমলাশাহী ভারতবর্ষে শোষণের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। প্রধানত চারটি ক্ষেত্রে তাঁরা এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রয়োগের কথা ভেবেছিলেন—অর্থনীতি, শিক্ষা, বিচার ব্যবস্থা এবং প্রশাসন।[১০] চরমপন্থী প্রায় সকলেই বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় ভাবধারায় সিঞ্চিত না হলে কোনও উদ্যোগই ভারতবর্ষে সফল হবে না। সুতরাং বয়কটকেও ধর্মীয় অনুশাসনের শক্তি দিতে হবে। স্বদেশী জিনিষ ব্যবহারের শপথ গ্রহণের প্রথা (কালীঘাটে, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫) চালু করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ।[১১] 'সন্ধ্যা' পত্রিকা কিন্তু আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। লিভারপুলে তৈরী লবণ এবং মরিশাসের চিনি যে অস্থি-চূর্ণ দ্বারা শোধিত করার পর ব্যবহারযোগ্য হয়—এ তথ্য ঐ কাগজেই প্রথম সবিস্তারে ছাপা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াতে যে গরু এবং শুয়োরের হাড় সমানভাবে কাজে লাগানো হয়—সে কথাও লেখা হয় যাতে হিন্দু এবং মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষই ধর্মনাশের ভয়ে পণ্য দুটি বর্জন করে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় 'চর্বি-যুক্ত কার্তুজ' ঘিরে যে কাহিনী গড়ে উঠেছিল—তারই একটা বিপজ্জনক প্রতিধ্বনি এ ধরনের কথার মধ্যে শোনা গেল। তিলকের কাছে বয়কট রাজনৈতিক যোগ-সাধনা হয়ে উঠেছিল, আর কে না জানে, স্বল্প মাত্রস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। বিপিনচন্দ্রের বক্তব্য ছিল—একটা জাতি যখন অপরের উপর আধিপত্য স্থাপন করে তখন সর্বক্ষেত্রেই বিজয়ীপক্ষ পদানতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন অবিচার অনাচারে ভরে তোলে, আর তখন বয়কটই হয়ে ওঠে শৃঙ্খলিতের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মূর্তপ্রকাশ।[১২] তবে বিদেশী পণ্যমাত্র বর্জনেই সায় ছিল না তিলক

এবং অরবিন্দের। ব্রিটিশ পণ্যের বদলে জার্মান, অস্ট্রীয় অথবা আমেরিকান জিনিষপত্র ব্যবহারে এঁরা আপত্তি জানাননি। আর সব রকম বিদেশী পণ্য বর্জন যে সম্ভব নয় সে বিষয়ে প্রায় সমস্ত চরমপন্থী নেতাই একমত ছিলেন। তাঁরা এটাকে বাঞ্ছনীয় বলেও মনে করতেন না। এ দেশে তৈরী জিনিষপত্র বিদেশে রপ্তানীর প্রয়োজন ভারতবর্ষেরও একদিন হবে। ভবিষ্যতে পণ্যের এই লেনদেনের পথ আগে থেকেই চরমপন্থীরা রুদ্ধ করতে চাননি। এমন কি ইংলণ্ডে তৈরী সমস্ত রকম পণ্য বয়কটের জন্যও এঁরা তৈরী ছিলেন না। প্রথমে কাপড়, চিনি, নুন এবং এনামেল বর্জনযোগ্য পণ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রেলপথ বা ট্রাম-গাড়িকে এই তালিকায় স্থান দিতে আপত্তি ছিল বিপিনচন্দ্রের ; আর ইংরেজী বইপত্তর বা বৈদ্যুতিক আলোর সরঞ্জাম বর্জন করার অর্থ যে অন্ধকার যুগে ফিরে যাওয়া—সে বিষয়েও তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।[১৩]

জবরদস্ত সাম্রাজ্যবাদী কার্জন শাসন ও শোষণকে ভারত সরকারের কর্মসূচীতে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রশাসনের সবল হস্ত লাট-ভবন থেকে চেম্বার অফ কমার্স পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।[১৪] চরমপন্থীরা এটুকু বুঝেছিলেন যে রূপকথার মৎস-কন্যাদের মতোই ইংরেজ সরকারের সত্তা ছিল আধা বণিক আধা শাসকে বিভক্ত। স্বদেশী এবং বয়কটকে এই দুই-এর বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন চরমপন্থীরা। তাই বয়কটের আওতার মধ্যে এসেছিল মিউনিসিপ্যালিটি, আইন-পরিষদ, আদালত ও সরকারী খেতাবের সঙ্গে সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতার বিষয়গুলি। বেশ স্পষ্ট ভাবেই তাঁরা জানিয়ে দিয়েছিলেন—'এই বয়কটের মধ্যে এবং এর দ্বারাই আমরা জন-মানসে পর-রাজ এবং স্বরাজ সম্পর্কে চেতনার উন্মীলন ঘটাতে চাই।'[১৫] ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্বের মূলে আঘাত হানলে তার 'মায়া' ছিন্ন হয়ে যাবে—আর এই মায়াই ইংরেজদের সামরিক শক্তির চেয়ে অনেক বেশি পরাক্রান্ত। বয়কট এবং স্বদেশীর ফলে জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণই শুধু হবে না (রানাডে এবং গোখ্‌লে এর বেশি কিছু চাননি), এই দৃষ্টিভঙ্গীই রক্ষা করবে জাতীয় পৌরুষ, জাগিয়ে তুলবে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য আত্মত্যাগের বাসনা। বয়কট তাই চরমপন্থীদের কাছে শুধু পরিহারের, কেবলমাত্র বর্জনের, একটা নঙর্থক মাধ্যম হয়ে থাকেনি। প্রয়োজন-ভিত্তিক অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগের সঙ্কীর্ণ সীমানা ছেড়ে তা বের হয়ে এসেছিল, ন্যায়ধর্মের বর্মাচ্ছাদিত হয়ে জাতীয় শক্তির সেনাপতিত্ব করতে।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর ধ্বনিত হয়েছিল : "বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ।… আমাদের সৌভগ্যক্রমে দেশে স্বদেশী উদ্‌যোগ আজ যে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বয়কট তাহার প্রাণ নহে।… এই যে স্বদেশী উদ্‌যোগের আহ্বান মাত্রে দেশ এক মুহূর্তে সাড়া দিয়াছে, কার্জনের সঙ্গে আড়ি তাহার কারণ হইতেই পারে না ; জগতে কার্জন এতো বড়ো লোক নহে, এই আহ্বান দেশের শুভবুদ্ধির সিংহদ্বারে আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই আজ ইহা এতো দ্রুত সমাদর পাইয়াছে।"[১৬] স্বদেশীকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের কাছে বয়কটের সমর্থন মেলে নি। স্বদেশীর মধ্যে আত্মশক্তির উদ্বোধনের বিপুল এক সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন, আর এই আত্মশক্তি তাঁর কাছে শুধু আত্মনির্ভরতার নামান্তরই ছিল না, এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কিছু স্পর্শও তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল স্বদেশীর আহ্বান জাতির সুপ্ত চেতনার দ্বারে আঘাত করবে, আর এই চেতনা জাগ্রত হলে তাঁতি শুধু কাজ পাবে না, অনাথ শুধুই ত্রাণ এবং নিরক্ষর শিক্ষার আলো, তা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের, জমিদার ও কৃষকের, হিন্দু ও মুসলমানের, ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাবে। পরিণামে হিতৈষণা যুক্ত হবে ঐক্যের সঙ্গে, আর বিদেশী

শাসনকে আক্রমণ না করেও দেশবাসীর পক্ষে সম্ভব হবে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা এক সমান্তরাল গণ-শাসন প্রতিষ্ঠা[১৭] তা ছাড়া প্রতিটি গ্রামে যদি কুটির শিল্প-শিক্ষালয়, সর্বজনীন শস্যাগার, সমবায়িক খামার, ব্যাঙ্ক এবং বিপণি গড়ে তোলা যায়, তাহলে জমিদার, মহাজন, আদালতের কেরানি ও পুলিশের সামনে নিতান্ত দীনহীনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখবে। রাজনীতির সমস্যাগুলো আপনা থেকেই অন্তর্হিত হবে। সৃজনশীলতায় আজীবন বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ বয়কটের মধ্যে বিদ্বেষ এবং জবরদস্তির প্রকাশই দেখেছিলেন।

তা ছাড়া শাসক গোষ্ঠীকে যারা চালায় সেই কায়েমী স্বার্থ যে বয়কটের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করবেই সেটাও তাঁর জানা ছিল। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতি তখনও দানা বাঁধে নি, এবং বয়কটের ফলে কোনও কোনও জাত ও সম্প্রদায়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। এ দেশের মিলে তৈরী কাপড় চালু করার জন্য দরিদ্রের নাগাল থেকে সস্তা বিলেতি-বস্ত্র সরিয়ে নেওয়া শুধু অন্যায় নয়, তা নিয়ে হিন্দু আন্দোলনকারীরা বাড়াবাড়ি করলে মুসলমানদের বিরাগ বাড়বে, কারণ মুসলমানরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র।[১৮] রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "এ কথা আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিত রূপে জানা আবশ্যক ছিল, আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক—এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাই না কেন, এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনোই বিস্মৃত হইবে না। এ কথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনও পাপই ছিল না, ইংরেজরাই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।"[১৯] এই অনৈক্যের সংবাদ শাসকশ্রেণী জানে এবং অসন্তোষের সুযোগ নিতেও তারা ছাড়বে না।

এর অনেক আগে, ১৮৯৪ সালে হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গ ও উচ্চবর্গের মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যে অমানবিকতা ও অবিচারের নিত্য প্রকাশ ঘটে আসছে তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। "আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চ-নীচে বিভক্ত ; যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে।...ভদ্রলোকের নিকট 'চাষা-বেটা' প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে।...আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপবিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি।"[২০] তা ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সমাজ, লোকাচার। "কিন্তু আসল কথা সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব কাজ করিতেছে কি না।" তাঁর সিদ্ধান্ত—"না।"[২১] কিন্তু এই স্ববিরোধিতা নিজেদের মধ্যে জীইয়ে রাখলে বয়কট প্রমুখ যে কোনও বিপ্লব প্রচেষ্টার ব্যর্থতা অবধারিত। আর বিদ্রোহের জন্য বিদ্রোহকে আমাদের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের প্রধান উপায় বলে মানাও সম্ভব নয়। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যয়ী বিঘোষণা : "গড়িয়া তুলিবার, বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীব ভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবন-ধর্ম, তাহাদের সৃজনীশক্তিকেই যথেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপ সৃষ্টিকে নতুন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুধুমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনও মতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।"[২২]

আমাদের মধ্যে বহুকাল ধরে দাসত্বের যে মনোভাব দৃঢ়মূল হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজশাসনকে তারই ফলশ্রুতি বলে মনে করতেন। তাঁর অভিমত ছিল—এই পরিস্থিতিতে একাত্ম হয়ে সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগই জাতীয় সংহতির পথ করে দিতে পারে ; আবার জাতীয় সংহতি আমাদের জাতীয় মুক্তি অর্জনের উপযুক্ত করে তুলবে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে (যেমন বিলেতি জিনিস কেনার

স্বাধীনতা) কোনও মুক্তি সংগ্রাম শুরু করা যায় না ; আর বল-প্রয়োগ করলে এ দেশের সমাজের অন্তর্নিহিত বিচ্ছিন্নতা (বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে) প্রবল হয়ে উঠে আমাদের ঠুনকো ঐক্য ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবে।

কৃত্রিম, খণ্ডিত, প্রয়োজনভিত্তিক ঐক্যের বদলে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রকৃত মিলনের পথ-নির্দেশ করতে ব্যাকুল হয়েছিলেন, অসহিষ্ণুতার পরিবর্তে সহিষ্ণুতার আহ্বান করেছিলেন, জাতিবৈরের জায়গায় বসাতে চেয়েছিলেন ভালবাসাকে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য উন্মত্ত প্রতিযোগিতার বদলে শোনাতে চেয়েছিলেন বিশ্বমানবতার কথা— অরবিন্দ তখন 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় একগুচ্ছ প্রবন্ধে (১১-২৩শে এপ্রিল, ১৯০৭) সার্বিক বয়কটকে (তিনি যাকে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' বলতেন) জোরালো ভাষায় সমর্থন করতে শুরু করেন। তিনি লিখেছিলেন, "প্ররোচনা সত্ত্বেও বয়কটের নীতির মধ্যে কোনও রাগ বা ক্ষোভ নেই। এর জন্ম হয়েছে সাধারণ মানুষের গভীরভাবে অনুভূত এক বাসনার মধ্য থেকে—যে বাসনা সৃষ্টির মূলে সত্যদ্রষ্টা কবির অবদানও কম নয়।"[২৩] স্বৈরাচারী শাসনের অসংখ্য বিধিনিষেধে আবদ্ধ, নিরস্ত্র, অসহায় এক জাতির সামনে দেশের প্রয়োজনে সাড়া দেওয়ার জন্য বয়কটকেই তিনি একমাত্র পথ বলে মনে করতেন। তিনি লিখেছিলেন, "১৯০৫-এর ৭ই অগষ্ট আমরা যখন বয়কটের নীতি গ্রহণ করি, তখন শুধুমাত্র একটা অর্থনৈতিক সংগ্রামের ডাকই আমরা দিই নি, এরই সঙ্গে জাতীয় মুক্তির একটা ক্ষেত্রও আমরা নির্মাণ করতে চেয়েছি, কেন না অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী এবং বিশিষ্ট হওয়ার প্রয়াস থেকেই আমরা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারবো। আমাদের প্রচেষ্টা দুটি বিচ্ছিন্ন নয়, তারা একে অন্যের পরিপূরক।"[২৪] স্বাধীন দেশগুলিতে (যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) জাতীয় শিল্প-সংরক্ষণের দরকার হলে তা বিধানসভায় গৃহীত আইনের দ্বারা করা সম্ভব, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতাই সে কাজ করে। কিন্তু পরাধীন জাতিকে (একই আমেরিকার উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে যা হয়েছিল) বয়কটের পথ নিতে হয় ; আর এ ক্ষেত্রে অনুমোদন আদায় করতে হয় এক অনিচ্ছুক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে "যারা জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক।" অরবিন্দ শুধুমাত্র বয়কটের সমর্থনেই এগিয়ে আসেননি, তাকে এক মানবিক প্রতিবিধানের মর্যাদায় ভূষিতও করেছিলেন।[২৫] তাঁর মতে বিশ্বমানবিকতা বা আন্তর্জাতিকতার স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য শুধু নৈতিকতার মূল্য পেতে পারে। নিপীড়িত, অসহায় একটা জাতির কাছে তা অসার আশ্বাসের বেশি কিছু হতে পারে না। তিনি লিখেছিলেন, "কোনও জাতি শুধুমাত্র বিদ্বেষ এবং শত্রুতাকে ভিত্তি করে বড় হতে পারে না—এই আপ্তবাক্য যেমন সত্য তেমনি ইতিহাসের সংখ্যাতীত দৃষ্টান্ত এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে কোনো দেশই নিছক সৌভ্রাতৃত্ব, আন্তর্জাতিক মৈত্রী বা বিশ্বমানবিকতার আদর্শের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়নি।" পরের স্বাধীনতা যারা হরণ করে তাদের পক্ষে অন্যের কাছে উদারতা বা মহত্ত্বের আশা করা শোভা পায় না, কেন না "নিজেদের তুচ্ছ স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য তারা অন্যায় ও অবিচারকে স্থায়ী করতে সর্বথা সচেষ্ট হয়"। সংঘাতের মধ্য দিয়েই শান্তির প্রতিষ্ঠা হবে, জাতি-বৈরের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনই জন্ম দেবে সংহতির—এটাই ঈশ্বরের বিধান। প্রত্যেক মানব-ত্রাতাই তার শুভব্রতের প্রারম্ভিক পর্বে ঘোষণা করেছেন যে 'শান্তির ললিতবাণী নয়, তোমাদের কাছে উন্মুক্ত অসি নিয়েই আমি আবির্ভূত হয়েছি'।[২৬] অরবিন্দ ইতিমধ্যে নিজের মধ্যে এক মানব-ত্রাতার স্পন্দন অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, শুভ ও অশুভের মধ্যে, আলো ও অন্ধকারের শক্তির সংগ্রাম বেদ-বর্ণিত দেবাসুরের দ্বন্দ্ব। যে রাজনীতি বিশেষ করে ক্ষত্রিয়ের

বৃত্তি[২১] এই ধারণা দৃঢ় হয়ে উঠেছিল তাঁর মনে। কিছুকাল পূর্বে (এপ্রিল মাসে) জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম প্রসঙ্গে তিনটি বিকল্প পদ্ধতির কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সেগুলি ছিল যথাক্রমে : আয়াল্যাণ্ডে পারনেল-অবলম্বিত শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ, রুশ নিহিলিষ্ট-অনুসৃত সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সামরিক অভ্যুত্থান। শেষোক্ত দুটি পথ গ্রহণের সম্ভাবনা তিনি একেবারেই বাতিল করে দেননি। তিনি লিখেছিলেন : "প্রতিরোধের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় সরকারী দমননীতি বা প্রতিক্রিয়ার চরিত্র ; অর্থাৎ যখন একটা জাতির অস্তিত্ব আক্রান্ত হয় ও প্রচণ্ড নিপীড়ন মানুষের কণ্ঠ রোধের চেষ্টা করে তখন আত্ম-রক্ষার জন্য যে কোনও পথ অবলম্বনই সঠিক ও সমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠে।" বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা তাঁর চোখে তখন "রাজনৈতিক লক্ষ্যের একটা অতি সীমিত অংশ মাত্র হয়ে উঠেছিল।" জাতির আত্মবিকাশের বিভিন্ন প্রচেষ্টা—যেমন স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষাও তাঁর কাছে গৌণ ঠেকেছিল। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, বিপিনচন্দ্র এবং তিলককেও বহু পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে শোণিত-সিক্ত কুরুক্ষেত্রের এক অবশ্যম্ভাবী পুনরানুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছিলেন।[২৮]

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে চরমপন্থীদের কাছে বয়কট কখনোই খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের রূপ নেয়নি। সন্দেহ নেই, 'ইন্দু-প্রকাশে' মুদ্রিত 'নিউ ল্যাম্পস ফর ওল্ড' শীর্ষক নিবন্ধমালায় অরবিন্দ যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের কথা উল্লেখ করেছিলেন, নিপীড়িতের বিদ্রোহ অনিবার্য—এমন ইঙ্গিতও ছিল তাঁর রচনায়। ফরাসী ঐতিহাসিক মিশ্‌লেকে অনুকরণ করে ভারতীয় 'ওল্ড রেজিমের' কথাও তিনি বলেছিলেন। স্বভাবতই শ্রেণী-বৈষম্য দূর করার জন্য রক্তাক্ত সংগ্রামের সম্ভাবনাও অনুক্ত ছিল না। কিন্তু ১৯০৬-৭ সাল থেকে তাঁকে আর এই সুরে কথা বলতে শোনা যায়নি। বোধহয়, এর অন্যতম কারণ অরবিন্দ কখনোই এ দেশের শহর বা গ্রামের সর্বহারাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে তোলেননি। এদের থেকে বরাবরই তিনি দূরে ছিলেন। জন্মসূত্রে, শিক্ষা-দীক্ষায় সমাজের যে স্তরে তিনি অবস্থান করতেন—তা-ই এটা অবধারিত করে দিয়েছিল। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে দেশবাসীর জন্য তাঁর আকুলতা ছিল আরোপিত, ইউরোপীয় ধ্যানধারণার দ্বারা অনুরঞ্জিত। দ্বিতীয়ত এটাও মনে রাখা দরকার যে চরমপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকরা বেশির ভাগই ছিলেন জমিদার, এবং এঁদের মধ্যে ছিলেন মৈমনসিং-এর সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী এবং গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মতো খুব বড় জমিদার। বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনার মধ্যে এঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসানের আশঙ্কা করছিলেন। পূর্ববঙ্গেই ছিল এঁদের জমিদারীর বৃহত্তর অংশ এবং পূর্ববঙ্গকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হলে শেষোক্ত প্রদেশে চালু অস্থায়ী-বন্দোবস্ত ও ৩০ বছর অন্তর খাজনা পুনর্নির্ধারণের ব্যবস্থা তাঁদের উপরেও বর্তাবে বলে, তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে কার্জন তাঁদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও তাঁদের অস্বস্তি দূর হয়নি। বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধীরা তাঁদের স্বার্থে ঘা দিলে তা সহ্য করতে তাঁরা আদপেই প্রস্তুত ছিলেন না। 'রাজা' সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক লক্ষ টাকা জাতীয়-শিক্ষা তহবিলে অকাতরে দান করতে রাজী থাকলেও, তাঁর কোনও অনুগ্রহ-ভাজনের মুখে 'ইউটোপিয়ান সোশ্যিয়ালিজম-এর বুলি শুনতে রাজী ছিলেন না। তৃতীয়ত, আদর্শবাদী অরবিন্দ তাঁর সমর্থক-পৃষ্ঠপোষকদের বৈষয়িক স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামাতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন। ১৮৯০-এর দশকে জড়বাদের উৎস ও লালন-ক্ষেত্র ইউরোপ থেকে সদ্যাগত অরবিন্দের উপর প্রতীচ্যের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। সমাজতন্ত্রী, নৈরাজ্যবাদী ও পপ্যুলিষ্টদের রণ-হুঙ্কারে

তাঁর হৃদয় তখনো অনুরণিত হচ্ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক বিবেকানন্দের ভারতবর্ষে অতিবাহিত করার পরই অভাবনীয় রূপান্তর ঘটলো অরবিন্দের। সুষম-বন্টনেই যে সুখ নেই, বিষয়-বিষের ঊর্ধ্বে ওঠাই যে জীবনের চরিতার্থতা—এ বোধটা তাঁর মনে ক্রমে বাসা বাঁধল। শ্রেণী-সংগ্রামকে জড়বাদী দর্শনের বিষাক্ততম প্রকাশ বলে মনে করলেন বলেই তিনি জমিদারের 'শোষণনীতির' প্রতিবাদী আরেকটি প্রবৃত্তি—প্রজা-বিদ্রোহ থেকে দেশবাসীকে নিবৃত্ত রাখতে চেয়েছিলেন। ঐ সময় মার্ক্সীয় দর্শন সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ও তার থেকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে তত্ত্ব প্রচার করছিল এবং সেই বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী একটা পর্ব হিসেবে প্রতি দেশে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পত্তনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছিল—অরবিন্দ তার থেকে মুখ ফিরিয়েছিলেন। ইউরোপে যে কুশ্রী ও নিষ্ঠুর পরিবেশে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাকে স্বদেশে আমন্ত্রণ করতে তিনি রাজী ছিলেন না। তাঁর মনে এই জিজ্ঞাসা উদিত হয়েছিল—ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে মহত্তর ও মানবিক কোনও সমাজের পত্তন করে ভারতবর্ষ কি নিখিল বিশ্বে অতুলনীয় এক দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হবে না ? প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পাতা থেকে আহরিত গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থার যে ছবি তাঁর চোখে ফুটে উঠেছিল তাকেই তিনি সমাজতন্ত্রের দেশীয় বিকল্প বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রাম্য জনপদগুলির সামাজিক চেতনা ও সুসংহতির মধ্যেই আদিম ও নিখাদ সমাজতন্ত্রবাদ নিহিত। ইংরেজ-বর্জিত ভারতবর্ষে সেই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার ঐতিহ্য ও মানসিকতার পুনরুজ্জীবনেই তাঁর সমস্ত আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বলে মনে হয়।

এই দিক থেকে বিচার করে অরবিন্দকে যদি 'স্পিরিচ্যুয়াল নারোদনিক' আখ্যা দেওয়া যায়, তবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সংশয়াতীত রূপে প্রগতিশীল বাস্তববাদী। ১৯০৭ সালে পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ভাষণে সমবায়িক ভিত্তিতে কৃষি, কৃষি ও দুগ্ধ উৎপাদনের শিল্পায়ন প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান পরিকল্পনার আভাস ছিল। 'মুখার্জি বনাম ব্যানার্জি' (১৮৯৮) এবং 'আলট্রা-কন্‌সারভেটিজম্‌' (১৮৯৮) প্রভৃতি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। বলা বাহুল্য, একজন সুখ্যাত জমিদারের আত্মসমালোচনা অন্যদের সমালোচনার থেকে অনেক বেশি মূল্যবান। স্বয়ং অব্‌লোমভ 'অবলোমভিজম'-এর নির্মমতম সমালোচক হতে পারেন। অরবিন্দ কিন্তু আমাদের ডস্‌টয়েভস্কির কথা স্মরণ করিয়ে দেন—আপন চিন্তার গহনে ধ্যানমগ্ন, কিছুটা অস্বাভাবিকভাবে সন্ন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট, প্রচণ্ড কারুণ্য রসসিক্ত এবং আত্মবিসর্জনের দুর্নিবার আকর্ষণে সাড়া দিতে সদা-উন্মুখ এক অসামান্য পুরুষ। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল তুর্গেনেভের ; কিছুটা বা প্রাক্‌-দীক্ষা পর্বের, মর্তের বাসিন্দা, টলস্টয়ের সঙ্গেও।

বাংলার চরমপন্থীরা উৎকণ্ঠিত আগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন তাঁদের কল্পলোকের জনগণের দিকে। গণ-অভ্যুত্থানের জন্য প্রতীক্ষা তাঁদের অধীর করে তুলেছিল। কিন্তু প্রত্যাশিত সেই বিপ্লব হয়নি। হতাশা তাই বহু চরমপন্থীকে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিয়েছিল। এঁরা ভেবেছিলেন, ভুল করেই ভেবেছিলেন, যে সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষের হৃদয়ে বিপ্লবের বাণী পৌঁছে দিতে পারবেন। ১৯০৮ সালে বিচারের সময় আদালত-কক্ষে বারীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন, 'রাজনৈতিক হত্যা যে জাতির মুক্তি আনবে না সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ ছিল না ; তবু আমরা সেই পথই বেছে নিয়েছি কারণ সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে তা-ই প্রত্যাশা করে'। দুর্ভাগ্য, এঁদের মনে এ সন্দেহটা একবারও

উঁকি দেয়নি যে সাধারণ মানুষ দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন ছাড়া আর কিছুই চায় না। 'বাবু'রা যে হঠাৎ তাদের নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাতে ভীষণ বিব্রত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল অনেকে। আরও স্মর্তব্য, বিপ্লবী-সমিতিগুলির গণ-সংযোগ ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিক্ষিপ্ত, ক্ষীণ। একমাত্র বরিশালেই স্বেচ্ছাসেবীদের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে দেখা গিয়েছিল। অশ্বিনীকুমার দত্তের 'স্বদেশ-বান্ধবে'র প্রভাব এমনই দূরবিস্তৃত এবং গভীর হয়ে উঠেছিল যে হিন্দু নেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ঐ অঞ্চলের মুসলমান চাষীদেরও মন জয় করতে পেরেছিলেন।[২৯] লিয়াকত্ হোসেনের স্বদেশী প্রচারে ভীত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হিউজেস বুলার ইব্রাহিম খাঁকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৃদ্ধির কাজে লাগান। লিয়াকতের তিন বছর কারাদণ্ড হওয়ায় বুলার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। তবুও এই 'স্বদেশ-বান্ধব' সমিতি ভদ্রলোকদের সংগঠন ছিল। কেন্দ্রীয় সমিতির ৭৩ জন সভ্যের মধ্যে ৭ জন ছিলেন জমিদার, ১৯ জন উকিল ও ১৫ জন শিক্ষক।[৩০] অল্পবয়সী ছাত্র ও উকিল এবং মধ্যসত্বাধিকারীরা ছিলেন দলের সাধারণ সভ্য।[৩১] ফরিদপুরের 'ব্রতী' সমিতিতেও ভদ্রলোক-প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অম্বিকাচরণ মজুমদার অবশ্য নমঃশূদ্রদের দলে টানবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু উচ্চজাতের হিন্দুদের তাতে সায় ছিল না।[৩২] মৈমনসিং-এর 'সুহৃদ সমিতি' কেদারনাথ চক্রবর্তী ও ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীর মতো ভদ্রলোক দ্বারা পরিচালিত ছিল এবং এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বড় বড় জমিদার। এর থেকে ভেঙে হয় 'সাধনা সমাজ'।[৩৩] তারও চরিত্র একই। পুলিন দাসের 'অনুশীলন সমিতি' অল্পকালের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। বি· সি· অ্যালেনের (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ তারিখের) রিপোর্ট ও এইচ· এল· সল্‌কেল্‌ডের (১০ই ডিসেম্বর, ১৯০৮) রিপোর্টে দেখা যায় 'অনুশীলন' জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কোনও চেষ্টা করছে না। বরং অল্প সময়ের মধ্যে তার কাজকর্মে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সুর ধরা পড়ে।[৩৪] মৈমনসিং এবং জামালপুরের দাঙ্গা (২১ এপ্রিল, ১৯০৭)কে[৩৫] ঢাকার নবাব এবং ব্রিটিশ আমলাদের গোপন ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবে বর্ণনা করেও অরবিন্দের পক্ষে মৈমনসিং-এর কৃষকদের উপর কোনও প্রভাব বিস্তারই সম্ভব হয়নি।[৩৬] তিনি এটা উপলব্ধি করেননি, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনে মোল্লাদের উস্‌কানি এবং আমলাদের কূটনীতি থাকলেও সাধারণ মানুষের মনে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ-বীজ বপন করা হয়েছিল বহু আগেই, এবং এর জন্য দায়ী ছিল বছরের পর বছর ধরে জমিদার-মহাজনের নির্মম শোষণ-নিপীড়ন। সমস্যার সমাধানের জন্য অরবিন্দ মৈমনসিং-বাসীদের কুমিল্লার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবিধানের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এটা যে স্থায়ী কোনও সমাধান হতে পারে না তা একবারও তাঁর মনে আসেনি। আত্মসমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে যা লিখেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য : "শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই…।"

বয়কটের মধ্যে যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ঘোষণা ছিল তা এই সময়ে অতি দ্রুত কারখানার শ্রমিক, কারিগর এবং কেরানিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[৩৭] বার্ন আয়রন ওয়ার্কস, আই· জি· ও বি· জি· প্রেস এবং বরিশালের সেটলমেন্ট বিভাগের কর্মচারীরা ১৯০৫-এর শেষের দিকে এবং ১৯০৬-এর গোড়ায় ধর্মঘট শুরু করেন। ১৯০৬-এর জুলাইতে ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ধর্মঘট এ তথ্য পরিষ্কার করে দেয় যে চরমপন্থীদের আবেদন নিম্নবিত্তের মানুষের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ নেই।[৩৮] পরের বছরই ধর্মঘট আরম্ভ হয় জামালপুরের রেলওয়ে

ওয়ার্কশপে এবং ক্লাইভ জুট মিল কোম্পানীতে।[৩৮] ১৯০৬ সালের প্রথমার্ধে বাউড়িয়ার ফোর্ট গ্লষ্টার জুটমিলের শ্রমিকরা উপর্যুপরি তিনবার ধর্মঘট করে। পাটকল শ্রমিকদের সমর্থনে সোচ্চার হয়ে ওঠে 'বন্দেমাতরম্' । পরের বছরেই ব্যাপকতর এক ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে যায় ইষ্টবেঙ্গল এবং অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলপথ। ১৯০৮ সালের এপ্রিলে কলকাতার টেলিগ্রাফ কর্মচারীরাও ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। কয়লার দুষ্প্রাপ্যতার জন্য এ সময়ে কলকাতার বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা এবং বন্দরগুলিতে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে জনৈক বিদেশী লিখেছিলেন, "মিল-শ্রমিক, সরকারী ছাপাখানার কর্মী এবং রেল কর্মচারীদের ধর্মঘট আজকের দিনে অতি স্বাভাবিক, প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে উঠেছে।"[৩৯] মালিকদের বিরুদ্ধে ধর্মঘটীদের অভিযোগ ছিল অসংখ্য ('বাবু' এবং জমিদারদেরও তারা ছেড়ে কথা কয়নি), কিন্তু তাদের প্রধান রাগটা গিয়ে পড়েছিল 'ফিরিঙ্গী'দের উপর।[৪০] মহারাষ্ট্রে চরমপন্থীরা রাজনীতির সঙ্গে জনসেবা এবং জাতপাতের বিষয়টা দক্ষভাবে ব্যবহার করে শ্রমিক আন্দোলনকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কাজে লাগিয়ে ছিলেন।[৪১] ধর্মীয় ও সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং শিবাজীর প্রগাঢ় প্রভাবও সেখানকার চরমপন্থীদের কাজ সহজতর করে দিয়েছিল। তিলকের বিচারের সময় সরকারী কর্তৃপক্ষ মহারাষ্ট্রে একটা সর্বাত্মক ধর্মঘটের আশঙ্কা করেছিলেন।[৪২] অতি দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার এই বিপদ থেকে রেহাই পেয়ে যান। গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভারতবর্ষের এই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ১৯০৫ সালের রুশ-বিপ্লবীদের কর্মধারার তুলনা অযৌক্তিক। আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ফোর্ট গ্লষ্টার বা গ্রীভস্ কটন অ্যান্ড কোম্পানীর সাহেব মিল-মালিকদের বেছে নেওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে চরমপন্থী কর্মসূচীর প্রকৃত চেহারাটা অনাবৃত হয়ে পড়ে। এই ধর্মঘটগুলি ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ, সর্বহারাদের শ্রেণী চেতনার উন্মীলন এদের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। 'বন্দেমাতরম' আবার এই শ্রমিক বিক্ষোভের মধ্যে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ খুঁজে পেয়েছিল।[৪৩]

"এ ভাবেই, পরস্পরের দ্বারা পুষ্ট হয়ে, স্বদেশী এবং বয়কট ক্রমশ দুটি সমান্তরাল পথে এগিয়ে যাবে ; ক্রমশ ব্যাপকতর এবং তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকবে যত দিন না ইংরেজরা লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে এ দেশে বিলেতি পণ্য আমদানী বন্ধ করে।"[৪৪] এই উদ্ধৃতি স্পষ্ট করে দেয় চরমন্থীরা বয়কটের উপর কী পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। স্বদেশী পণ্যের জন্য বাজার তৈরী সম্পর্কে এবং তা বিক্রয়-বাবদ অর্থ আরও স্বদেশী পণ্য উৎপাদনের জন্য মূলধন রূপে ব্যবহার বিষয়ে তাঁদের প্রায় কোনও সংশয়ই ছিল না। এই বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত আছে চরমপন্থীদের স্ব-নির্ভর শিল্প-বিকাশের অতি-সরল, কিছুটা অবাচীন অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা। ওঁদের মধ্যে কারো কারো চিন্তা ছিল আরও সুদূরপ্রসারী। ভারতীয় উদ্যোগে এ দেশে শিল্প-বিপ্লব সংঘটনের সম্ভাবনাও তাঁরা বাদ দেননি। স্বদেশী মিল ও উন্নততর তাঁত প্রতিষ্ঠা, স্বদেশী স্টীমার কোম্পানী চালু করার সঙ্গে সঙ্গে চীনে মাটি, চামড়া, দেশলাই এবং সাবান তৈরীর কারখানাও এখানে ওখানে গড়ে উঠতে থাকে।[৪৫] স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই জে· এন· টাটা ভারতবর্ষে প্রথম ইস্পাত উৎপাদন শুরু করেন। তাঁর টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল-এর ১৬,৩০,০০০ পাউন্ড মূলধনের প্রায় সমস্তটাই মাত্র তিন মাসের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছিল ৮০০০ ভারতীয় শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে।[৪৬] স্বদেশী-বিপণি থেকে এ দেশে তৈরী জিনিসপত্র তো বিক্রি হতোই, ছাত্রদেরও বহু ক্ষেত্রে বাড়িতে বাড়িতে স্বদেশী-জিনিস ফিরি করতে দেখা যেত। 'দ্য অ্যান্টি সারকুলার সোসাইটি' এবং 'দ্য ন্যাশানাল ভলান্টিয়ার অরগানাইজেসন' নামে দুটি

প্রতিষ্ঠান এই ব্রতে আত্মনিয়োগ করে সুখ্যাত হয়ে উঠেছিল, যদিও বাজারের হালচাল সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় তাদের চেষ্টা প্রায়ই হাস্যকর হয়ে উঠতো। 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্'-এব লেখক এল· এস· এস· ওম্যালে মন্তব্য করেছিলেন যে স্বদেশীর প্রেরণা না জাগলে বাংলার কুটির শিল্পের অবলুপ্তি সুনিশ্চিত ছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে স্বদেশী কি সত্যই এদেশে প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পেরেছিল? কৃৎ—কৌশলে শিক্ষাদানের প্রথম চেষ্টা করেন প্রমথনাথ বসু "টেকনিক্যাল এণ্ড সায়েন্টিফিক এডুকেশন ইন বেঙ্গল" পুস্তিকায় ১৮৮৬ সালের অক্টোবরে। ১৮৯১ সালে ইন্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। তার সেক্রেটারী ছিলেন প্রমথনাথ বসু। ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ 'দি অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভাঙ্গমেন্ট অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন অফ ইন্ডিয়ানস্' প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এগুলি ছিল নরমপন্থীদের প্রচেষ্টা। 'বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজের (প্রতিষ্ঠা ১৪ আগষ্ট ১৯০৬) পাঠ-নির্ঘণ্ট ছিল দ্বিমুখী। তাতে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর সঙ্গে অতীতের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল, আর অনাগত কালের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয় আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক চর্চার মধ্য দিয়ে। এই দুই বিদ্যার চর্চাই জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় হিন্দু পণ্ডিতদের অবিস্মরণীয় সাফল্যই একালে তাঁদের উত্তরসুরিদের সফলতার সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি বলে মনে করা হতো। প্রেরণা ও পথ নির্দেশের জন্য জাপানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো ছিলই। আপন প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখে জাপান যদি শিল্প-বিপ্লব আনতে পারে, ভারতই বা পারবে না কেন?

'দি ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন'-এর উক্ত পরিকল্পনার পেছনে ছিল স্যর জর্জ বার্ডউড-এর প্রেরণা। ভারতীয় শিল্প, বিশেষ করে কুটির শিল্প, সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে তিনি সুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৯৮ সালে তিনি 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে লেখেন, "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য আপনাদের আধুনিক কালের ইউরোপের উপর নির্ভর করতেই হবে। কিন্তু সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও অধ্যাত্ম-চিন্তা—সংক্ষেপে সংস্কৃতি— সম্পদে ভারতবর্ষ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। ৪০০০ বৎসর ব্যাপী আর্য-আধিপত্যের ফলে এই ঐশ্বর্য স্বাভাবিকভাবেই সংরক্ষিত হয়েছে। সে অমূল্য সম্পদ আপনারা কিছুতেই নষ্ট হতে দেবেন না।" 'ডন'-এর সম্পাদক এই বিদেশী ভারত-প্রেমিকের চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে তার একটা বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন। হিন্দু শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী ছাত্রদের মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশ মহত্তর একটা লক্ষ্য পূরণের উপায় বলে বিবেচিত হতো; সে লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতার উন্মীলন। সতীশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন এই শিক্ষা-পদ্ধতিই মানুষের অনুভূতি, আচার ও আচরণ বহুকাল ধরে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ কখনো শিক্ষাকে পার্থিব সুখভোগ বা প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কাজে লাগায় নি। কিন্তু এ দেশে ইংরেজরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন করেছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। ভারতবর্ষের তরুণ সম্প্রদায়ের সমস্ত উচ্চাশা তাই শাসক গোষ্ঠীর কৃপাধন্য হওয়ার, চাকরীতে উন্নতি করার, সঙ্কীর্ণ পথেই ধাবিত হচ্ছে। তা ছাড়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদগুলির আস্বাদন ও সাঙ্গীকরণ থেকেও শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে জীবন-বিমুখ, কৃত্রিম এই শিক্ষা পদ্ধতির বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে এর দ্বারা চিত্তবৃত্তির উন্মীলন হয় না; পশ্চিমী

ভাব-প্রবাহের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয়ের পথ রোধ করে দাঁড়ায় বিদেশী ব্যাকরণ আর নীরস অভিধান। আরও দুঃখের কথা, প্রকৃতি থেকে, জাতীয় ঐতিহ্য থেকে এবং অনায়াসে শেখার আনন্দ থেকে তা শিশুদের বঞ্চিত করে। পঠন ও মননের মধ্যে দুরতিক্রম্য এতটা ব্যবধান রচনাই এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। ফলে শিক্ষা-সৌধ নির্মাণের জন্য সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হলেও স্থাপত্য বিদ্যেটা আয়ত্ত হচ্ছে না। জ্ঞানের রাজ্যে ভারতীয়রা মজুর হয়েই থেকে যাচ্ছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে এমন সমস্ত গুরুভার ও অসংলগ্ন বিষয় ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করে সৃজনশীলতার কোনও স্বাক্ষর রাখার উপায় থাকে না। আমাদের জীবন এবং শিক্ষা তাই দুটি ভিন্ন পথে বয়ে চলে, একে অন্যের পরিপূরক হয়ে ওঠে না। শেষ পর্যন্ত অপূর্ণ শিক্ষা এবং অচরিতার্থ জীবন যেন একে অন্যকে ব্যঙ্গ করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় ছিলেন যে একমাত্র মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যই এই দুই-এর মিলন ঘটাতে পারে, পারে ভাবের সঙ্গে প্রাণের মধুর মৈত্রী ঘটাতে। এই পথেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পক্ষে কাছাকাছি আসা সম্ভব; ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যেও এই ভাবেই চিন্তার বিনিময় সহজ হয়ে উঠতে পারে। ১৯০১ সালে এই আদর্শের একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে গড়ে তুলেছিলেন শান্তিনিকেতন। নিঃসীম প্রান্তরের নির্জনতার মধ্যে, জীবনধারণের নূন্যতম উপকরণ নিয়ে অল্প কিছু সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক অবারিত প্রকৃতির বুকে এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যানুশীলন আরম্ভ করেন। এঁদের সকলের সামনে ছিল উপনিষদের সময়কার তপোবনের আদর্শ।

'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা (জুলাই, ১৯০২) এবং ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ প্রায় একই সঙ্গে ঘটে। ঐ সময়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব গলদ ছিল সেগুলো দূর করে তাকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্দীপিত করার জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হয়েছিল, 'ডন সোসাইটি'কে তারই প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করা যেতে পারে। ১৯০৪-এর 'ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট' পরোক্ষে এই অভিনব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন তরান্বিত করে, আর বঙ্গ-ভঙ্গ তাকে পূর্ণবিকশিত হবার সুযোগ দেয়। স্বদেশী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নেতারা সরকার-নিয়ন্ত্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (ব্রহ্মবান্ধবের ভাষায় 'গোলদীঘির গোলামখানা') বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন।[৪৯] ঠিক ঐ সময় 'কার্লাইল সার্কিউলর্'[৫০] অগ্নিতে ইন্ধন যোগায় আর জন্ম নেয় 'অ্যান্টি সার্কিউলর সোসাইটি' (৪ঠা নভেম্বর, ১৯০৫)। এটি হলো—ছাত্র সমাজের মর্যাদা-নাশের অপপ্রয়াসের প্রত্যুত্তর।[৫১] কৃষ্ণকুমার মিত্র (পরবর্তীকালে 'চরমপন্থী' হিসেবে নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত) ছিলেন এর সভাপতি। রবীন্দ্রনাথও সোসাইটির প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন, যদিও প্রয়োজন বোধে তার সমালোচনাতেও তিনি দ্বিধা করেননি। নরমপন্থীদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং আশুতোষ চৌধুরী, চরমপন্থী বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব ও মতিলাল ঘোষের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নেন। বহু বিত্তশালী জমিদার এবং আইনজীবীর বদান্যতায় পরিষদের তহবিল পূর্ণ হয়ে ওঠে। মুখ্যত 'ডন সোসাইটি'র সতীশচন্দ্র মুখার্জির আন্তরিক চেষ্টায় ১৪ই অগষ্ট, ১৯০৬ সালে স্থাপিত হয় 'দ্য বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ।' এর শিক্ষকরা অধিকাংশই ছিলেন সতীশচন্দ্রের অনুগামী, আর শুধুমাত্র বিদ্যার্জন নয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

তবে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ করলেও বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য এখানে

অনাদৃত হতো না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় শিক্ষার প্রসার ঘটলে জাতীয় সম্পদ যে বৃদ্ধি পাবে এবং দেশবাসীর অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে—এ বিশ্বাসও উদ্যোক্তাদের ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র উপযোগিতাবাদ নয়,প্রাচ্য বিদ্যার বৈজ্ঞানিক সত্যগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করিয়ে দিতে এঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভারতীয়ত্বের সাধনা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মুখ্য স্থান নেয়। বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায় 'আমরা এতোদিন উদ্ভিদ বিদ্যা চর্চার সময় ওক্, এলম এবং বীচ্ বৃক্ষ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছি, কিন্তু উপেক্ষা করেছি আম্রকুঞ্জকে। নীলনদ উপত্যকা বিষয়ে তথ্য আহরণ করতে গিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকা আমাদের ছাত্রদের কাছে অপরিচিত থেকে গেছে।[৫২] তাই এখন থেকে কলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে প্রাচ্যের জীবনাদর্শ ও ধ্যান-ধারণার নির্যাস, আর তার সঙ্গে যুক্ত হবে প্রতীচ্যের জ্ঞানভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ অংশ।' ইউরোপের ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে তিনটি পাঠ-নির্ঘণ্ট তৈরী হলেও নব-জাগ্রত এশীয় দেশগুলির ইতিহাস পঠন-পাঠনের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। সুযোগ ছিল হিন্দু দর্শনের বিকল্প হিসেবে ঐশ্লামিক দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নের। আর জাতীয় শিক্ষা যেন কোনও মতেই প্রাচীন হিন্দু ন্যায়শাস্ত্রের নির্বিচার পুনরুজ্জীবনে পর্যবসিত না হয় সে বিষয়ে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রণেতাদের সচেতনতার অভাব ঘটেনি। বার্কের রচনাবলীর বদলে লী ওয়ার্নার-এর 'বাইবেল'-কে পাঠ্য তালিকায় স্থান দিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ যে ধরনের স্থূল রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন তা এঁদের স্পর্শ করেনি। প্রচলিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ নয়, তার পাশে সম্পূর্ণ জাতীয় নিয়ন্ত্রণে সহাবস্থান ছিল এর লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ উদ্যোক্তাদের পরিষদে মতপার্থক্য দেখা দিতে দেরী হয়নি। তারকনাথ পালিতের নেতৃত্বে বেশ কিছু নরমপন্থী অচিরেই একটা স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করেন। 'সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন' নামে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ২৫শে জুলাই ১৯০৬ সালে স্থাপিত হয় 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট'। প্রধান এই দুটি শিক্ষানিকেতন ছাড়া দেশের বহু জায়গায় জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলায় উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব হয়নি, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঙ্গতির অভাবে এদের অকালমৃত্যু ঘটেছিল।

বিপিনচন্দ্র এবং অরবিন্দ কিন্তু বিশুদ্ধ বিদ্যার্জনকেই জাতীয় শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন না। 'জাতির ভাগ্য' গড়ে তোলাকেই এই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বিবেচনা করতেন বিপিনচন্দ্র। শিল্পায়নের জন্য অপরিহার্য প্রযুক্তিবিদ্যা-চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা সার্থক ঐতিহাসিক, দার্শনিক,শিল্পী এবং (জগদীশচন্দ্রের মতো) বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করুক—এই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা। আর, অরবিন্দ চেয়েছিলেন "এই শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষকে ফিরিয়ে দিক তার বিস্মৃত চিন্তার সম্পদ, তার আত্ম-উপলব্ধির তৃষ্ণা।" প্রকৃত মুক্তির উৎস যে মানুষের অন্তরেই নিহিত থাকে, আর অতীতের স্বরূপ উদ্ঘাটনের মধ্যেই যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সিদ্ধির উপায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব—জাতীয় শিক্ষা এই পরম সত্যের আবরণ উন্মোচন করুক—অরবিন্দের এই ইচ্ছা বহুভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এই শিক্ষার কি সুফল হবে—এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁর বক্তব্য ছিল—-নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য জগতের আপাত-আকর্ষণীয় কিন্তু আসলে অহিতকর বৈশিষ্ট্যগুলি (যেমন যন্ত্র সভ্যতা, বাণিজ্য-সর্বস্বতা ও সাম্রাজ্যবাদ) বর্জন করতে শিখবে। মানুষের সামনে মুক্তির শুদ্ধ রূপটি তুলে ধরাকেই তিনি জাতীয়তাবাদের প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করতেন। আর, তাঁর বিশ্বাস ছিল জাতীয় শিক্ষাই এই লক্ষ্যপূরণে সক্ষম, তা-ই তৈরী করে দেবে মানব-জমিন। ন্যাশানাল কলেজের অধ্যক্ষ-পদ থেকে বিদায় নেবার সময় ছাত্রদের তিনি বলেছিলেন,

'তোমাদের মধ্যে (বিশুদ্ধ) জ্ঞান বিতরণ করা অথবা জীবিকা অর্জনের জন্য তোমাদের উপযুক্ত করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য নয়। মাতৃভূমির সেবা এবং তার জন্য সব রকম দুঃখ বরণে প্রস্তুত সন্তান গড়ে তোলাই আমাদের আদর্শ।' জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে চরমপন্থীরা ভিন্নতর একটা মাত্রা সংযোগ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং সে জন্যই 'বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজে'র প্রথম অধ্যক্ষ অরবিন্দ কার্যনির্বাহিক সমিতির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেননি। কলেজ পরিচালক সমিতি ছাত্রদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রসন্ন মনে মেনে নেননি। শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অরবিন্দের মতান্তরেব তথ্য পাওয়া যায় ব্যারিষ্টার সি· আর দাশের কাছ থেকে—যিনি আলিপুর বোমার মামলায় তাঁর পক্ষের আইনজীবী হিসেবে সুখ্যাত হয়ে ওঠেন। বিপিনচন্দ্রও তাঁর ক্যারেকটার স্কেচেস গ্রন্থে অরবিন্দ সম্পর্কে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যে সার্কিউলর্ জারী করে তাতে আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অরবিন্দ তখন স্বরাজের পথে বহু দূর এগিয়ে গেছেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে অরবিন্দের মতান্তরের গভীরতর কারণ ছিল। আধ্যাত্মিকতা ও রাজনীতির মিশ্রণে গড়া চরমপন্থা আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে অস্বীকার করত। অরবিন্দের এ বিষয়ে কোনও সংশয় ছিল না যে এদেশে যন্ত্র-শিল্প-নির্ভর সমাজ গড়ে উঠলে তা অবধারিত ভাবেই পাশ্চাত্য সভ্যতার পথ অনুসরণ করবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষে যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি দেখতেন সেখানে পার্থিব সম্পদের থেকে, ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে প্রজ্ঞার মূল্য ছিল অনেক বেশি। সে সমাজের অবস্থান হবে কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থার বিপরীত মেরুতে। তাঁর কাছে স্বদেশীর একটি মাত্রই সংজ্ঞা ছিল, এবং তা—দেশীয় হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই লক্ষ্য পূর্ণ হলে সনাতন মূল্যবোধও রক্ষিত হবে। কারু শিল্পীদের দক্ষতা ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যেটুকু যন্ত্র বা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন তার বেশি তিনি প্রশ্রয় দিতে রাজী ছিলেন না।[৫৫] সুতা-কাটুনি, তাঁতী, কাঁসা-তামার কারিগর, কামার এবং কৃষক—এরা সবাই একটা সুসমঞ্জস কর্ম-ছন্দে বাঁধা। বৃহৎ যন্ত্রকে আবাহন করলে সে ছন্দ একেবারেই কেটে যাবে। একে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে হবে বিদেশী বণিকদের অসম প্রতিযোগিতা থেকে, আগলে রাখতে হবে স্বদেশী বৃহৎ শিল্পের আক্রমণ থেকে। মেফিস্টোফেলিস যেমন ফাউস্টকে প্রলোভিত করেছিলেন যন্ত্র-সভ্যতাও তেমনি বহু জাতীয়তাবাদীকে আকর্ষণ করেছিল। একমাত্র অরবিন্দ ছিলেন অনমনীয়, আপোষে অনিচ্ছুক। তিনি লিখেছিলেন, "লালসার বশে বিভিন্ন জাতি সম্পদের অন্বেষণ ও সঞ্চয়ে মত্ত হয়ে উঠেছে। একমাত্র ভারতবর্ষের মানুষই আত্মার সেবায় তৎপর। আমরা শিল্প-উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে তা হবে আত্মহত্যার সমতুল্য। কেবলমাত্র ভারতবর্ষ থেকেই প্রকৃত অর্থনৈতিক মুক্তির বাণী সমস্ত বিশ্বে প্রচারিত হবে। আর এই কারণেই আমাদের নিজেদের অর্থনৈতিক জীবনকে একটা মহত্তর ভিত্তির উপর গড়ে তোলা দরকার। দেশের সমস্ত ভোগেচ্ছাকে আত্মার বশীভূত করার দৃষ্টান্ত আমাদেরই স্থাপন করতে হবে।"[৫৬] ধ্রুপদী সংস্কৃতির সঙ্গে সুপরিচিত এই পণ্ডিতের পক্ষে রোমান সাম্রাজ্যের সকরুণ পরিণতি বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় জীবনযাত্রার অসামান্য মানোন্নয়ন সত্ত্বেও রোমক জাতির জীবনের শূন্যতা পূরণ হয়নি। তাই সঙ্কটের চরম মুহূর্তের সম্মুখীন হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের কেউই আত্ম-রক্ষায় সক্ষম হয়নি। আগে থেকেই অর্ধমৃত

হয়েছিল তারা, বাইরে থেকে সামান্য আঘাত আসতেই সকলে ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ দেশের যারা একদিন পেশোয়াদের নৌ এবং সেনাবিভাগে অত্যুজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছিল মহারাষ্ট্রের সেই সবল, সাহসী কৃষিজীবী সম্প্রদায় এবং কোঙ্কনের কঠোর পরিশ্রমী কৃষকদের অধঃপতন, তাদের কুলিমজুর ও বস্তিবাসীতে রূপান্তর অবিরত পীড়িত করতো তিলককে।[৫৫] পশ্চিমের দেশগুলির অনুকরণে অতি জটিল যন্ত্রশিল্পের যথেচ্ছ প্রসার বা বিপুলাকার কারখানা পত্তন রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না।[৫৬] জাপানের সরল যন্ত্রপাতি-নির্ভরতা, তার বিকেন্দ্রিত শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থাকেই এঁরা অনুকরণযোগ্য বলে মনে করতেন।

সামান্য কিছু মতপার্থক্য সত্ত্বেও সকল চরমপন্থীরই বিশ্বাস ছিল যে বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের এক এবং অদ্বিতীয় লক্ষ্য—স্বরাজ লাভ। স্বরাজের আদর্শই ছিল তাঁদের সমস্ত ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে, বাকি সব কিছুই প্রান্তিক। জাতীয় মুক্তি—মূল রাগিণী ; অন্যসব প্রয়াস শুধুই তার বিস্তার। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের পর 'কেশরী' পত্রিকায় তিলক লিখেছিলেন, "আমাদের জাতিকে একটা মহীরুহের সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তবে তার মূল কাণ্ডটির তুল্য বলে বিবেচিত হবে স্বরাজ, আর তার দুটি প্রসারিত বৃহৎ শাখা—স্বদেশী ও বয়কট। অথবা আমাদের জাতিকে যদি একটা মানবদেহ বলে কল্পনা করি তবে স্বরাজ্য উপমিত হবে শরীরের মূল অংশের সঙ্গে, বয়কট ও স্বদেশী হাত ও পায়ের সঙ্গে।"[৫৭] কিন্তু বয়কট ও স্বদেশী যখন ক্রমশ তাদের জন-সম্মোহিনী শক্তি হারিয়ে ফেলছিল, 'দোকানদারের জাত' বিব্রত হওয়ার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না, আর এখানে ওখানে গড়ে তোলা জাতীয় বিদ্যালয়গুলি সকলের অনুকম্পার পাত্র হয়ে কোনও রকমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করছিল, তখন আশাহত, বিড়ম্বিত চরমপন্থীরা আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনা নিয়ে শেষ সম্বল হিসেবে স্বরাজের আদর্শকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন।

কিন্তু 'স্বরাজে'র সংজ্ঞা নিয়েও চরমপন্থীদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। তিলকের কাছে 'স্বরাজে'র অর্থ ছিল প্রশাসন ব্যবস্থার উপর পূর্ণ ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন, ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ নয়।[৫৮] তিনি লিখেছিলেন, "ভবিষ্যতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনভোগী ভারতীয় প্রদেশগুলি নিয়ে একটি যুক্তরাজ্য স্থাপন করা হবে, আর সমগ্র (ব্রিটিশ) সাম্রাজ্যের স্বার্থ-জড়িত প্রশ্নগুলির মীমাংসার ভার থাকবে ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।" ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে ভাষা ও জাতির ভিত্তিতে সংগঠনের পক্ষপাতী ছিলেন তিলক। অবশ্য দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বেশ কঠোর ছিল। এ দেশে ঠিক কী ধরনের শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে—সে প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত বলেই তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। তবে তাঁর আশা ছিল আগামী তেরো-চোদ্দ বছরের মধ্যেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য ব্যাপারে তাঁর কিছু কিছু সংশয় থাকলেও এ সম্পর্কে তিনি স্থিরনিশ্চিত ছিলেন যে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার অর্থ ইংরেজ বিতাড়ন নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে চলে আসাও নয়।[৫৯] তিলককে এ কথা প্রায়ই বলতে শোনা যেত যে নরমপন্থীদের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর মতভেদ ততোটা ছিল না যতোটা ছিল আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে।[৬০]

একেবারেই আলাদা ছিল বিপিনচন্দ্রের মতবাদ। মাদ্রাজে যে ভাষণগুলি তিনি দিয়েছিলেন তাতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের অধীনে স্বরাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন যে অলীক তা পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি বলেছিলেন : "এই দুই তত্ত্ব বিপরীতধর্মী। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার

দৃষ্টান্ত তুলে ধরে কেউ যদি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে কাম্য বলে মনে করেন তো তাঁদের এই বাস্তব সত্যটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে ইংলণ্ডের মতো কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরাও শ্বেতকায়, আর আমরা কালো অথবা তামাটে রঙের।" অধ্যাপক ব্রাইস অক্সফোর্ডে এক বক্তৃতায় কি এ কথা স্পষ্ট করে বলেন নি যে অ্যাংলো-স্যাক্সনরা গায়ের রঙ সম্পর্কে অতি সচেতন এবং স্পর্শকাতর ? মর্লে (গোখ্‌লেকে) জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে রেখে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন দান অসম্ভব। বাস্তবের দিক থেকে তা যে সম্ভবপর নয় সেটা বিপিনচন্দ্র ভালভাবেই বুঝেছিলেন। "এর (ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন) দ্বারা আমরা (প্রকৃত) স্বায়ত্ত শাসনও লাভ করবো না, ব্রিটেনও তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে না। ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতি যদি সম্পূর্ণরূপে ইংলণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় তবে তার সামরিক বিভাগও ইংরেজদের হাতে থাকবে, আর এর ফলে দেশের অর্থনীতির পরিচালনার দায়িত্বও তারাই নিজেদের হাতে তুলে নেবে এবং স্বায়ত্ত শাসন পর্যবসিত হবে নিঃসার একটা শব্দ মাত্রে। অপর পক্ষে রাজস্ব ও অর্থ দপ্তরের উপর পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত স্বশাসিত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজির অবলুপ্তি ঘটতে দেরী হবে না। ইংলণ্ডই তখন ভারতীয় সাম্রাজ্যের একটা অংশমাত্রে পরিণত হবে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যিক এই প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষই হয়ে উঠবে প্রধান অংশীদার।" তাঁর বক্তব্য ছিল—"স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আইন পরিষদের সম্প্রসারণ অথবা সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণ নয়। একটি কোকিলের আকস্মিক কুহু রবে যেমন বসন্তের আগমন বার্তা ঘোষিত হয় না, তেমনি ইংরেজ সরকারের সিভিল সার্ভিসে এক, একশো বা এক হাজার ভারতীয় নিযুক্ত হলেই সে সরকার ভারতীয় হয়ে যাবে না। প্রতিটি সরকারেরই নিজস্ব কিছু ঐতিহ্য থাকে, থাকে বিশিষ্ট আইনকানুন এবং নীতি, আর প্রত্যেক সিভিলিয়ানকে—তিনি শ্বেতকায়, তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণকায়—যাই-ই হোন না কেন—সেগুলি মেনে চলতেই হয়। যতো দিন না এই সব বিধিবিধানগুলির আমূল পরিবর্তন এবং আদর্শগুলির রূপান্তর হচ্ছে ততো দিন ভারতীয়দের ইংরেজদের জায়গায় বসালেই স্বরাজ লাভ ঘটবে না।" ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত দেশেই স্বরাজ আসতে পারে। বলা বাহুল্য, সে স্বরাজ হবে শ্রেণী সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য। বিপিনচন্দ্র স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতবর্ষে একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাজ্য স্থাপনের, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে সাধারণতন্ত্রী রাজ্যগুলি (ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ) এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজ্য ক'টি (দেশীয় রাজ্য)। তবে এই ভারতবর্ষকে তিনি একটি স্বপ্ন-বিলাস, বা খুব বেশি হলে, একটা ঐতিহাসিক সম্ভাবনার বেশি কিছু ভাবতে চান নি।[৮১] বিপ্লবী ফ্রান্সের একটা পর্যায়ে যেমন একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ভবিষ্যতের ভারতবর্ষেও তিনি অনুরূপ একটা পরিস্থিতি কল্পনা করেছিলেন। স্বাধীনতা পাবার পর "ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে আমদানী-করা প্রতিটি বস্ত্রখণ্ডের উপর, লীডস্ থেকে আনা প্রতিটি ছুরির ফলার উপর তিনি গুরুভার আমদানী শুল্ক বসানোর পক্ষপাতী ছিলেন।" ভারতবর্ষে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের বিরোধী হলেও 'ক্রেডিট' সম্পর্কে গ্যারান্টি দিয়ে পৃথিবীর খোলা বাজারে বৈদেশিক ঋণের জন্য আবেদনে তাঁর আপত্তি ছিল না।[৮২]

অরবিন্দের সমস্ত সাধনার লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা।[৮৩] বল্কান অঞ্চলের খ্রীস্টান জাতিগুলির উপর তুরস্কের অথবা ইতালীবাসীর উপর অস্ট্রিয়ার স্বৈরাচারী শাসনের মতোই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যকে তিনি একটা দুঃসহ অমঙ্গল বলে মনে করতেন। এ দেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাকে ইংরেজরা কিভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে সে কথা তিনি কোনও দিনই ভোলেননি। তাঁর বক্তব্য

ছিল এই রকম : ইংরেজরা এ দেশের অভিজাত শ্রেণীর শক্তি খর্ব করেছে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত (অরবিন্দ এদের অভিন্ন জ্ঞান করতেন)দের প্রথমে কাজে লাগিয়ে,তারপর তাদেরই ধ্বংস সাধনে উদ্যত হয়েছে। এতে জাতীয় শক্তির শেষ অবলম্বনটুকুও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[৬৪] মুক্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের ভবিষ্যত সম্পর্ক বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন : "একটা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যরা যেমন সমমর্যাদাসম্পন্ন হয় ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষেরও তেমনি একটা সম্বন্ধ থাকতে পারে। প্রভু-ভৃত্য বা ঊর্ধ্বতন-অধঃস্তনের সম্পর্ক মেনে নেওয়ার মধ্যে হীনতার যে স্বীকৃতি আছে তা মনুষ্যত্বনাশী ; সে কারণে পূর্ণ স্বাধীনতার বদলে অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ আমাদের মহিমময় অতীত এবং অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎকে অপমান করা।"[৬৫]

অরবিন্দ মনে করতেন প্রতিটি জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানব সমাজের হিতের জন্যই অপরিহার্য। ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডীর স্বপ্ন ও সাধনার সমগোত্রীয় ছিল অরবিন্দের আদর্শ। অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতার কলুষ তাকে স্পর্শ করেনি। "আমরা যেমন নিজ জাতি এবং উত্তর পুরুষের মঙ্গলবিধানে সতত সচেষ্ট, তেমনি ইংলণ্ড সমেত পৃথিবীর সব দেশের হিতসাধনে তৎপর।" কিন্তু "একটা বিদেশী জাতি ও সভ্যতা দ্বারা রাহুগ্রস্ত" হয়ে থাকলে ভারত তার অভীষ্ট সাধন ও পুণ্যব্রত পালনে সক্ষম হবে না। অরবিন্দের ধ্যান-ধারণা ফুটে উঠেছে এই কথাগুলিতে : "আধুনিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের পূর্ণ বিকাশই স্বরাজ, তার মাধ্যমেই ফিরে আসবে জাতীয় মহত্ত্বের এক সত্যযুগ, গুরু ও কাণ্ডারীর যে ভূমিকা নিজগুণে একদিন ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছিল, তাও পুনরুজ্জীবিত হবে।" তা ছাড়া "রাজনীতির ক্ষেত্রে বেদান্তের শিক্ষার পূর্ণ চরিতার্থতার জন্য ভারতবর্ষের আত্মমুক্তি অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে" বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন অরবিন্দ।[৬৬] "রাজনৈতিক পরাক্রম প্রদর্শনের উদগ্র বাসনাতেই ইউরোপীয় দেশগুলি রাষ্ট্রীক স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করছে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ইউরোপের ইতিহাসের এই প্রধান ও সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কোনও মিল নেই ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের।" জাতীয় মুক্তি সাধনার মধ্যে তিনি বৈদান্তিক চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছিলেন। "বিশ্বমানবতার কাজে ভারতবর্ষের অপরিহার্যতাই তার মুক্তি সর্বজনকাঙ্ক্ষিত করে তুলেছে।" উপনিবেশগুলিতে ইংলণ্ড যে ধরনের গণতন্ত্র পত্তন করেছিল তার প্রতি কোনও মোহ ছিল না অরবিন্দের ; কেননা তার মধ্যে কোনও মহৎ আদর্শের চিহ্ন ছিল না। ভারতবর্ষের উপর পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে ইউরোপ কোন ভাবেই লাভবান হবে না। "ইউরোপের অসুখের যে চিকিৎসক হতে পারে সে নিজেই রোগের কবলে পড়লে তা চিকিৎসার বাইরে চলে যাবে। ফলে, প্রথমে সামাজিক অবক্ষয় তারপর বৈদেশিক আক্রমণের ধাক্কায় রোমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুপদী ইউরোপীয় সভ্যতার যেমন বিনাশ ঘটেছিল, তেমনি করেই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিরও অবলুপ্তি ঘটবে।"[৬৭] শাশ্বত মূল্যবোধ রক্ষার জন্যই ভারতের কর্তব্য ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও ইংরেজ প্রবর্তিত গণতন্ত্রের পরিহার। বিষয়-বিষে আকণ্ঠ নিমজ্জিত পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বর্জনের ব্যাপারে অরবিন্দ ছিলেন আপোষহীন ; স্পেঙ্গলারের মতোই তিনি তার অবধারিত ধ্বংস ঘোষণা করেছিলেন।

স্বরাজের জন্য চরমপন্থীদের আন্দোলনকে অরবিন্দ কখনো অর্থনীতি-কেন্দ্রিক করতে চান নি ; যদিও দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁর সদিচ্ছায় কোনও খাদ ছিল না। আর অন্যান্য চরমপন্থীরা পূর্ণ রাষ্ট্রীক মুক্তির দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠলেও তিনি এই

আন্দোলনকে বিশুদ্ধ রাজনীতির চৌহদ্দির মধ্যে রাখতেও রাজী হন নি। শুধুমাত্র স্বদেশের জন্য একটা সবল অর্থনীতি গড়ে তোলা বা পূর্ণরাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্যেই চরমপন্থী আন্দোলন সীমিত থাকতে পারে না। সঙ্ঘবদ্ধ এই মহৎ প্রয়াস ভারতবর্ষের সকল নরনারীর 'মুক্তি' (প্রকৃত অর্থে) অর্জনের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করতে পারে। আধ্যাত্মিকতাই এই আন্দোলনের ভিত্তিভূমি, এবং তার উন্মেষে এ দেশের শ্রেণীবৈষম্য ও বংশানুক্রমিক, অগণতান্ত্রিক বর্ণবিদ্বেষ অবলুপ্ত হয়ে একটা পরম নমনীয়, সমন্বয়-ক্ষম, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে। এই লক্ষ্যপূরণ যে সমাজতন্ত্রবাদেরও অন্বিষ্ট—তাও তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা যে বারবার অরবিন্দের চিন্তা ও কর্ম আচ্ছন্ন করে দিতো—তা তাঁর এই লেখাটিতেই প্রমাণিত হয় : "যে রাজাকে আজ আমরা সামনে রেখে রণক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করেছি তিনিই তো আমাদের পবিত্র, অবিনশ্বর দেশমাতৃকা। প্রগতির পথে আমাদের এই অভিযানে সর্বশক্তিমান ঈশ্বব আমাদের দিশারী। লাজপৎ রায়, তিলক, বিপিনচন্দ্র—এঁরা কেউ কিছু নন। যে ঐশী শক্তি আমাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করছে এঁরা তাঁরই হাতের যন্ত্রমাত্র। আজ যদি এঁদের প্রয়াণ ঘটে তবে বিধাতার ইচ্ছাপূরণের জন্য যোগ্য মানুষ খুঁজে পেতে বিলম্ব হবে না।"[৮৮] অরবিন্দের এই প্রত্যয়ী ঘোষণার মধ্যে প্রাচীন হিব্রু জাতির প্রফেটদের বাণীই যেন অনুরণিত হয়ে উঠেছে। হিব্রু 'বুক অফ সাম্‌স্' থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে অরবিন্দ যেভাবে তাঁর বক্তব্যের উপসংহার করেছিলেন তা অতি প্রাসঙ্গিক :

The Lord is my rock and my fortress,
and my deliverer;
And God, my strong rock, in Him
will I trust.

[আমার প্রভু, সেই শৈল, সেই দুর্গ,
আমার পরিত্রাতা ;
আমার ঈশ্বর,
আমার শক্ত শৈল, তাঁতেই আমি
বিশ্বাস করব। —বুক অফ সাম্‌স্, ১৮ : ২]

সামগায়কদের ভাষায় স্পেঙ্গলারের দর্শন শুনে নেভিন্‌সন লিখছেন, "সেই সব স্বপ্ন-দ্রষ্টাদের সব লক্ষণই অরবিন্দের মধ্যে ছিল যাঁরা পথ নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে স্বপ্নগুলিকে সত্য করে তোলার কাজেই আত্মনিয়োগ করেন।" এই বিদেশী পর্যবেক্ষকের চোখেও পুনার চরমপন্থী নেতাদের কূটকৌশলী রাজনীতির পাশে অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর ঋজুতা ও সারল্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।[৮৯] এই মন্তব্যের যাথার্থ্য অস্বীকার না করেও বলা যায় এটা অরবিন্দের আদর্শের একটা অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি কয়েকটি উপায়ের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং চাইতেন এগুলির কোনও কোনওটা পর্যায়ক্রমে, আবার কতকগুলি একই সঙ্গে, অনুসৃত হোক। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য ছিল স্পষ্ট এবং পরবর্তী কার্যক্রম অনুসারে তাঁদের উভয়েই কংগ্রেস দখল করে তাকে একটা বৈপ্লবিক সংগঠনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের প্রতি বিপিনচন্দ্রের অনীহা থাকলেও, প্রয়োজনবোধে, সে পথ গ্রহণের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন অরবিন্দ।[৯০] ১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বিপিনচন্দ্র এবং অরবিন্দ—উভয়েই বরিশাল সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং পুলিশ এই সম্মেলন ভেঙে দিলে তাঁরা, সরকারী

কর্তৃপক্ষের নিষেধ সত্ত্বেও, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় সম্ভবত এই সময়ে।[১১] কলকাতার শিবাজী-উৎসব সংক্রান্ত বিষয়ে তিলকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় (৪—১২ই জুন, ১৯০৬) তাঁরা আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে তিলককে সভাপতি করতে মনস্থ করেন। নরমপন্থীরা কিন্তু সভাপতি পদের জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় দাদাভাই নৌরজীর নাম প্রস্তাব করে তাঁদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন।[১২] খাপার্ডে লাজপৎ রায়কে সভাপতি মনোনয়ন করতে চাইলে লাজপৎ তা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু বরিশালের ঘটনাবলীর তীব্র নিন্দা এবং স্বদেশী ও বয়কটের জয়গান করে তিনি খোলাখুলি লিখেছিলেন যে তিলকের প্রতি প্রবীণ নেতৃবর্গের এই অবিশ্বাসের কোনও কারণ তিনি খুঁজে পান না। তবে এই সঙ্গে তিনি এ কথাও লিখেছিলেন যে "এই 'নতুন পার্টি' (যাকে বাংলার 'চরমপন্থী দল' বলা হয়) পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতির পদ—কে অলঙ্কৃত করবেন—এ জাতীয় তুচ্ছ বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পক্ষে ক্ষতিকর, উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা বলে প্রকৃত প্রয়োজনটাকেই অবহেলা করছেন। যদি প্রবীণ নেতারা সময়ের তালে তাল মেলাতে না পারেন তা হলে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁদের নেতৃত্বে ভাঙন ধরবে। কাজ করতে যাঁরা প্রকৃতই ইচ্ছুক তাঁরা নিন্দা বা স্তুতি—কিছুরই ধার ধারেন না। আমাদের সকলেরই লক্ষ্য তো এক এবং অভিন্ন, আর তা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া আব কিছু নয়। তবে পথ নিয়ে মতপার্থক্য থাকবেই। সে জন্য ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য ; আমাদের উচিত নয় ক্রোধবশে মতবিরোধকে অভীষ্ট পূরণের অন্তরায় করা।"[১৩] সন্দেহ নেই, লাজপৎ সমকালীন দলীয় সংঘাতের ঊর্ধ্বে থাকতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন পরিস্থিতির গুণাগুণ বিচার করে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করতে। দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতির পদে বরণ করাতে তাই তিনি সন্তোষপ্রকাশ করেছিলেন, কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল একমাত্র এই সিদ্ধান্তই ঐ সময়কার নিন্দনীয় সংঘর্ষ এড়াতে পারবে।[১৪]

কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সময়েই (১৯০৬) 'দ্য নিউ পার্টি' বা চরমপন্থী দলের আবির্ভাব। তিলককে জাতীয় নেতা রূপে বাংলার চরমপন্থীরা মেনে নিয়েছিলেন এবং এর জন্য অরবিন্দের অবদানই ছিল বেশি।[১৫] অবশ্য, নরম ও চরমপন্থীদের বিভেদ তখনও অনতিক্রম্য হয়ে ওঠেনি এবং দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদে কংগ্রেসের প্রাক্-অধিবেশন পর্বের আলাপ-আলোচনায় তাঁরা নিজেদের মতপার্থক্য দূর করার একটা চেষ্টাও করেছিলেন।[১৬] লাজপৎ স্বয়ং শান্তিদূতের ভূমিকা নিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকেও সখেদে স্বীকার করতে হয়েছিল যে তাঁর সুপরামর্শগুলি 'বাঙালী চরমপন্থীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।'[১৭] লাজপতের পঞ্জাবী সহকর্মী অজিত সিং শেষোক্তদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, আর বিপিনচন্দ্র তাঁর অনুগামীদের নিয়ে প্রকাশ্য সম্মেলন বর্জন করেছিলেন। তবে দাদাভাই-এর চতুর পরিচালনার গুণে কলকাতা কংগ্রেস সুরাটের মহড়া হয়নি।

চরমপন্থী নেতাদের এই নতুন বিন্যাসে দেখা গেল লাজপৎ রয়েছেন নতুন দলের চরম দক্ষিণে। স্বদেশী-ডাকাতি এবং সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্ম্য[১৮] নিয়ে অরবিন্দ-সমর্থকদের সঙ্গে বিবাদের পর বিপিনচন্দ্র মধ্যবর্তীস্থান বেছে নিয়েছেন। তিনি এ সময়েই দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে "ভারতবর্ষের এই সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য এ জাতীয় অবৈধ ও হিংসাত্মক পথ অবলম্বনের চিন্তা বা তার সমর্থন বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কেউই করবে না।" এই পরিস্থিতিতে তিলক পড়েছিলেন দোটানায়। তাঁকে কখনো 'সিন্‌ফিন্' পদ্ধতি নেওয়ার কথা বলতে শোনা যেতো, কখনো বা অহিংস

বিপ্লবের সমর্থনে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠতেন।[৭৯] আর, অরবিন্দ সুনিশ্চিতভাবেই ছিলেন চরমপন্থীদের বামতম প্রান্তে। তিনি শুধু বিপিনচন্দ্রের হাত থেকে 'বন্দেমাতরমের' পরিচালনভারই গ্রহণ করেননি, 'যুগান্তরে'র সঙ্গেও ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। শেষোক্ত পত্রিকাটি যে বাংলার বিপ্লবীদের মুখপত্র তা কারোরই অজানা ছিল না। 'যুগান্তরে'র আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০৬-এর মার্চে এবং অরবিন্দ-সহোদর বারীন্দ্রকুমার ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা। হেমচন্দ্র কানুনগোর মতে প্রথম থেকেই যুগান্তরের কর্মসূচীর সঙ্গে (যেমন ব্যামফিল্ড ফুলারের হত্যার ষড়যন্ত্র, স্বদেশী ডাকাতি, এবং সন্ত্রাসবাদ প্রচার) অরবিন্দের যোগাযোগ ছিল সুনিবিড়।[৮০]

১৯০৭-এর মে মাসে পঞ্জাবে বিক্ষোভ সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে লাজপৎ রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়।[৮১] এব প্রতিবাদে 'কেশরী' পত্রিকায় (২১শে মে, ১৯০৭) তিলক লিখলেন, "সরকার যদি এ জাতীয় জার-সুলভ পন্থা অবলম্বন করতে শুরু করেন তা হলে তাদের ভারতীয় প্রজারাও রুশ প্রজাদের পথ অনুসরণ করতে ইতঃস্তত করবে না।" ঐ বছরের জুন মাসেই 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় দেখা গেল অরবিন্দ-রচিত বিদ্যুৎ-গর্ভ, দৃপ্ত একটি কবিতা—'বিদুলা'। কবিতাটিতে পরাভূত, ত্রস্ত এক রাজপুত্রের মাতা এই বলে সন্তানকে উদ্দীপিত করছেন :

Blaze out like a fireband even if for a moment
    burning high,
Not like the poor fire of husks that smoulders long,
    afraid to die.
Better is the swift and glorious flame that mounting
    dies of power,
Not to smoke in squalid blackness, hour on wretched
    futile hour.
Sunjoy, Sunjoy, Waste not thou thy flame in
    smoke! Impetuous dire,
Leap upon thy foes for havoc as a famished lion leaps
    Storming through thy vanquished victims till thou
fall on slaughtered heaps.

[নিঃশেষ-দাহনভীত তুষাগ্নির মতো অনন্তকাল জ্বলার থেকে
মুহূর্তের জন্য হলেও, জ্বলে ওঠো অগ্নিপিণ্ডের মতো,
পরিণত হও লেলিহান অগ্নি-শিখায়।
অতিদ্রুত যে গৌরবময় শিখা
ক্রমে বেড়ে আপন শক্তিতে শেষ হয়ে যায়, সে অনেক ভালো
প্রহরের পর নিষ্ফল প্রহর,
কুশ্রী আর কালো ধোঁয়া উদ্গীরণের থেকে।
সঞ্জয়, সঞ্জয়, তোমার অন্তরের অগ্নিশিখাটিকে
ধোঁয়ার মধ্যে নির্বাপিত হতে দিয়ো না।
ভীষণ, প্রমত্ত বেগে, ক্ষুধার্ত সিংহের মতো, মূর্তিমান সর্বনাশ হয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়ো তোমার শত্রুর বুকে।
বিজিতদের বিক্ষিপ্ত শবদেহগুলি দুপায়ে দলিত করে
ছুটে যাও সামনের দিকে।]

১৯০৭ সালে এমনি এক ভয়াল, আক্রমণোদ্যত নেতার ভূমিকায় অরবিন্দকে দেখা গিয়েছিল। প্রথমে আক্রান্ত হন নরমপন্থীরা। ১৯০৭-এর মার্চে বড়লাট মিন্টোর হৃদয়ে পুলকের সঞ্চার করে সুরেন্দ্রনাথ এসেছিলেন ভাইসরয়-প্রাসাদে। উদ্দেশ্য বিপিনচন্দ্রের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানানো। মধ্যযুগের সম্রাট চতুর্থ হেনরীর 'ক্যানোসা'তে পোপের কাছে অনুতাপে মাথা হেঁট করে যাওয়ার মতো এই আচরণে চরমপন্থীরা সুরেন্দ্রনাথের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মেদিনীপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনে ক্ষুব্ধ চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দেন অরবিন্দ। এই সম্মেলনটিকেই ১৯০৭-এর সুরাট কংগ্রেসের মহলা হিসেবে ধরা যেতে পারে। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ অরবিন্দের বিরুদ্ধে শুধু বাংলার কংগ্রেসে অনৈক্য সৃষ্টির অভিযোগই আনেন নি, স্যর অ্যানড্রু ফ্রেজারের জীবননাশের ষড়যন্ত্রের সঙ্গেও তাঁকে জড়িত করেন।[৮২] উল্টে অরবিন্দ তাঁর বিরুদ্ধে জেলা পুলিশের সহায়তায় চরমপন্থীদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ আনেন।

অবশ্য আরও নাটকীয় ঘটনার অনুষ্ঠান তখনও বাকি ছিল। নরমপন্থীরা অভিসন্ধি করে সভাপতি রূপে রাসবিহারী ঘোষকে মনোনয়ন দেন ও কংগ্রেস অধিবেশন-স্থল নাগপুর থেকে সুরাটে সরিয়ে নিয়ে যান এবং সে অনুষ্ঠান অরবিন্দের দল পণ্ড করে দেয়। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার প্রকৃত সম্পাদক কে, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বিপিনচন্দ্র তখনো কারারুদ্ধ। তাই চরমপন্থীরা প্রথমে ঠিক করেন মান্দালয় জেল থেকে সদ্য-মুক্ত, জাতীয় বীর ও শহীদ রূপে বন্দিত লাজপৎ রায়কেই কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনে সভাপতি করবেন। এই পরিস্থিতিতে বিব্রত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ গোখ্‌লেকে পত্র মারফৎ অনুরোধ জানান তিনি যেন লাজপৎকে সরে দাঁড়াতে অনুরোধ করেন।[৮৩] যে মানুষটি তাঁর কারা-মুক্তির জন্য বড়লাটের (মিন্টো) সঙ্গে বাদ-বিসংবাদ করতেও পিছপা হননি, তাঁর অনুরোধ এবং যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে তাঁর সঙ্গীন অবস্থা, লাজপৎকে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ঘোষণা করেন যে "প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তিনি কিছুতেই নিজেকে জাতীয় শিবিরে ফাটল ধরানোর কারণ হতে দেবেন না।"[৮৪] চরমপন্থীদের প্রার্থী হতে অস্বীকার করা লাজপতের পক্ষে একটা 'মস্ত বড় ভুল' হলো বলে অরবিন্দ মত প্রকাশ করেছিলেন।[৮৫] এরপর থেকে চরমপন্থীরাও তিলককে সভাপতি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

ওয়াচা তিলকের সভাপতিত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৮৬] তাছাড়া কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব মেহতার দল মেনে নিতে রাজী ছিল না। বোম্বাই ও নাগপুর-বেরারের প্রাদেশিক সভায় এ মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নাগপুরে অধিবেশন বসলে চরমপন্থীরা কর্তৃত্ব পেয়ে যাবে সে রকম সম্ভাবনা ছিল। মিন্টোর সচিব ডানলপ স্মিথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর অ্যালফ্রেড নন্দী ও ওয়াচাকে অধিবেশন-স্থান সরাবার উপদেশ দেন।[৮৭] মাদ্রাজ অধিবেশনের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করল।[৮৮] শেষে ওয়াচা গোখ্‌লেকে জানিয়ে দেন যে সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশন বসবে এবং রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্ব প্রায় পাকা।[৮৯]

তিলক এবং খাপার্ডে কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবগুলি অপরিবর্তিত রাখা হবে এই শর্তে নরমপন্থী-প্রার্থী রাসবিহারী ঘোষের কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচনের পথে কোনও বাধা না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কার্যক্ষেত্রে নরমপন্থীরা কিন্তু অসাধুতা অবলম্বন করেন। তাঁরা শুধু কংগ্রেস-অধিবেশনের স্থান পরিবর্তন করলেন তা-ই নয়, কলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলো প্রায় সবই জোলো করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করানোর চেষ্টা করলেন। ঐ সময়কার রুশ

কনসাল-জেনারেলের একটা লেখা থেকে জানা যায় যে বাঙালী নেতারা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। স্বতন্ত্র এক কংগ্রেস গড়ে তুললে তা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্বমূলক হবে না বলে তাঁরা কলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে একটা আপোষ-মীমাংসায় আসতে চেয়েছিলেন।[৮] নরমপন্থীরা কিন্তু তাঁদের এই শান্তি ও মৈত্রীর প্রয়াস কিছুটা রূঢ় ভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[৯] ১৯০৭-এর ২৭শে ডিসেম্বর মেহতা, গোখ্লে এবং মাল্‌ভির আচরণ প্রতিকূলতর হয়ে উঠলে তিলক সভাপতি নির্বাচন বিষয়ে একটা সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ইতিমধ্যে নরমপন্থীরা অরবিন্দের বিরুদ্ধে কিছু কটু-কাটব্য করেন। চরমপন্থীরাও তার বদ্‌লা নেবার জন্য অধীর হলেন। তিলক যখন তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব পাঠ করছিলেন (এ বিষয়ে পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি তিনি আগেই দিয়েছিলেন) এবং একই সময়ে রাসবিহারী ঘোষ তাঁর ভাষণ পাঠে ব্যস্ত, তখন কোনও সভ্য একটা চেয়ার ছোঁড়বার জন্য ওঠালেন। প্রত্যুত্তরে কেউ মঞ্চের দিকে ছুঁড়ে মারলেন মারাঠী জুতো। এর পর সভায় যে লজ্জাজনক খণ্ডযুদ্ধ শুরু হলো তার মধ্যে নেভিনসন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শোচনীয় বিলুপ্তি লক্ষ্য করেছিলেন।[১০] তাণ্ডব-স্রষ্টাদের অন্যতম অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার স্বয়ং সেদিনের ঘটনার একটা বিবরণ দিয়েছেন : "সবারই কাঁধে দক্ষ-যজ্ঞনাশী পিনাকীর এক একটা দানা সওয়ার হইয়াছে, সবাই পুরাতনের কালাপাহাড়, নূতনের নেশাখোর নবাস্বাদিত শক্তিসুরার মাতাল।"[১১]

লাজপৎ রায় কিছুকাল আগে থেকেই অনুগামীদের এই অনুরোধ জানাচ্ছিলেন যে তাঁরা যেন দলে থেকেই প্রবীণদের ধীরে চলার নীতি মেনে নেন, প্রাজ্ঞজনের বাস্তব বুদ্ধি-বিবেচনার মূল্য দেন।[১২] তিলক চরমপন্থীদের পরামর্শ দেন যে নরমপন্থীরা যে মতবাদ প্রচার করছেন[১৩] বাইরে তা মেনে নিয়ে ভিতর থেকে কংগ্রেস দখলের চেষ্টা করতে। এই পদ্ধতিটা অবশ্যই মারাঠাদের চিরাচরিত কূটনৈতিক খেলার একটা উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়। অরবিন্দ কিন্তু এই সব ছল-চাতুরী, আপোষ বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। সুরাটে কংগ্রেসের ভেঙে টুক্‌রো হয়ে যাওয়ার মধ্যে তিনি 'ঈশ্বরের বিধান'ই দেখতে পেয়েছিলেন। তিলক যখন সুবিধাবাদী সহযোগিতার কথা ভাবছিলেন[১৪] অরবিন্দ তখন প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের মতো একটা বিপ্লবী সংস্থা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বাসনা ছিল এই প্রতিষ্ঠান নিত্য-নতুন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাত্রা বৃদ্ধি করবে, সরকারও বাধ্য হবে নিপীড়ন ও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে। আর এর অনিবার্য পরিণাম হবে আইন অমান্যের মধ্য দিয়ে গণ বিক্ষোভের আত্মপ্রকাশ। এই বিক্ষোভ সশস্ত্র-বিদ্রোহে রূপান্তরিত হতেও দেরী হবে না। তখন স্বেচ্ছাসেবীরা হবে এর সৈনিক আর 'যুগান্তর' দল তার অগ্রদূত। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সঙ্গে-সঙ্গে রুশ-আদলে সশস্ত্র প্রতিরোধের চিন্তা ভিন্নমতাবলম্বী অরবিন্দ কোনও সময়েই ছাড়তে পারেননি।

এই সময় থেকেই তিলকের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য প্রকট হতে থাকে। স্ত্রীকে লেখা তাঁর একটা চিঠি (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭) থেকে জানা যায় যে তিনি ক্রমশ নিজেকে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র বলে মনে করছিলেন। কর্মের স্বাধীনতা আর তাঁর নেই। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় (১৫ই জুলাই, ১৯০৭) একটা প্রবন্ধে ('বয়কট অ্যাণ্ড আফটার') তিনি লিখেছিলেন কিভাবে ঐশী বিধান ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ করছে। সুরাটের ভাঙনের পর প্রায়ই তাঁকে এই সুরে কথা তুলতে শোনা যেতো। বোম্বাইতে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, "আপনারা যদি নিজেদের জাতীয়তাবাদী রূপে পরিচয় দিতে চান, যদি জাতীয়তাবাদের ধর্মে আপনারা দীক্ষিত হতে ইচ্ছা করেন তা হলে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আপনাদের তা

করতে হবে। আপনারা সকলেই যে ঈশ্বরের হাতের পুতুলমাত্র—এ তথ্য বিস্মৃত হওয়া চলবে না।" তাঁর মনের গহনে ঈশ্বরের নির্দেশ যেন অবিরাম গুঞ্জরিত হতে থাকে।[১৭] ক্রমশ শিথিলতর হয়ে যায় যুক্তিতর্কে তাঁর বিশ্বাস, তিরোহিত হয় বয়কট, স্বদেশীর উপর তাঁর সমস্ত আস্থা। এই প্রত্যয় তাঁর মনে দৃঢ়তর হতে থাকে যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনও কার্যসূচী দ্বারা এ দেশের মুক্তি আসতে পারে না।

জাতির মধ্যে এক অবতারের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব তিনি যেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অনুগামীদের এই আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে স্বাধীনতা-সমরে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁদের সহায় হবেন। তিনি লিখেছিলেন, "সেই স্বর্গীয় শক্তির অমোঘ নির্দেশ পালন ছাড়া ওদের কিছু করার নেই, তিনি যে দিকে পরিচালিত করবেন, অন্তরে অন্তহীন সাহস ও বিশ্বাস নিয়ে সে দিকেই ওদের যেতে হবে।" সহকর্মীদের কানে তিনি এই অভয়-মন্ত্র দিয়েছিলেন : "ভয় পাবার কি আছে যখন তোমরা এবিষয়ে সচেতন যে তোমাদের মধ্যেই তিনি বিরাজমান ? শ্রীকৃষ্ণ, যিনি নিজেকে এখন গোকুলে লুকিয়ে রেখেছেন, দীনহীনদের মধ্যে, বৃন্দাবনের রাখাল বালকদের মধ্যে মিশে আছেন, তিনিই স্বপ্রকাশ হবেন একদিন এবং তখনই ঐশ্বরিক এক শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে সমস্ত জাতির অভ্যুদয় ঘটবে ; তাকে বাধা দেওয়ার শক্তি কারোরই থাকবে না।"[১৮]

> O my son, believe me, he whose victory brings the common gain—
> And a nation conquers with him, cannot fail; his goal is plain.
> And his feet divinely guided, for his steps to Fate belong." (Vidula)

[বৎস, এই বিশ্বাস আমার উপর রেখো যে যার জয়ে সম্ভব হবে সকলের হিতসাধন, যার জয়ে জাতির বিজয়, সে ব্যর্থ হতে পারে না, কেননা তার অভীষ্ট স্থির এবং স্পষ্ট, তাকে চালনা করছে স্বর্গীয় এক শক্তি, তার প্রতিটি পদক্ষেপ বিধাতা-নিয়ন্ত্রিত।]

দৃষ্টিভঙ্গীর এই আমূল পরিবর্তন সত্ত্বেও এ সময়ে নরমপন্থীদের সঙ্গে মীমাংসার যে চেষ্টা বিপিনচন্দ্র করেছিলেন তাকে অরবিন্দ সরাসরি বাতিল করে দেননি। (পান্তির মাঠের বক্তৃতা, ১০ই এপ্রিল, ১৯০৮)। সুরেন্দ্রনাথ বোম্বাই ও উত্তরপ্রদেশের প্রতিনিধিদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নরমপন্থী সংস্কারকামী কনভেনশনের কার্যকলাপ, বিশেষত লক্ষ্য বদল, তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি চরমপন্থীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে চলতে চেয়েছিলেন; তবে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নরমপন্থীদের অতি নির্জীব প্রচেষ্টায় অরবিন্দের আর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তিনি লিখেছিলেন, "একটা জাতি অনুক্ষণ ভাগ্যের সঙ্গে দর কষাকষি করতে পারে না ; বাজারে সবচেয়ে সস্তা দরে কিছু খরিদ করার মতো বিধাতার কাছ থেকে স্বাধীনতা কেনাও অসম্ভব। আজ বলিদানের এক মহাযজ্ঞের (যার তুলনায় প্রাচীন কালের সুপ্রসিদ্ধ যাগযজ্ঞগুলিও তুচ্ছ বলে মনে হবে)—অনুষ্ঠান ছাড়া এ লক্ষ্য পূরণ হতে পারে না। যে দেবতার সমীপে আত্মবলিদান সম্পন্ন হবে, শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তমের আত্মনিবেদন ছাড়া তাঁর সন্তুষ্টি বিধান সম্ভব নয়।" তাঁর মনে হয়েছিল পুরোনো কংগ্রেসের বিদায় গ্রহণের সঙ্গে জাতির প্রস্তুতিপর্বও শেষ হয়েছে, আরম্ভ হয়ে গেছে দুই বিরুদ্ধ শক্তির এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ এবং এই সংঘাতের প্রাথমিক অভিঘাতে দিক্‌বিদিক বিক্ষুব্ধ

হয়ে উঠবে।[৯৯] "এই ভয়ঙ্কর আবর্তে নৈতিকতার প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যাবে কেন না যুদ্ধের নিয়ম ও শান্তির নিয়ম তো ভিন্ন হবেই।" আবেগ-মথিত হৃদয়ে তিনি লিখেছিলেন : "দেশমাতার কৃপাণের জন্য আজ প্রয়োজন খাঁটি ইস্পাতের, তাঁর রথের চক্রনেমির জন্য কঠিন ধাতুর···যুদ্ধ সমাসন্ন, রণভেরীর নিনাদও আর ক্ষীণ নেই।"[১০০]

When the tyrant sees his conquered foemen careless grown of death,
Bent of desperate battle, he will tremble, he will hold his breath
... he will parley, give and take for peace. (Vidula)

[পরাভূত বিজিতরা যে দিন মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে/জীবন-পণ রণে মত্ত হয়ে ওঠে, /অত্যাচারী কেঁপে উঠবে ভয়ে, স্তব্ধ হবে তার নিঃশ্বাস,/মুখে তার ধ্বনিত হবে মীমাংসার প্রস্তাব/ শান্তির জন্য আদান-প্রদানের কথা।]

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ যে ইংরেজদের বিবেক জাগাতে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে—এই অপ্রিয় সত্যটা আর ঢাকা দেওয়া যাচ্ছিল না। তাই সন্ত্রাসবাদের মধ্যেই অরবিন্দ সাফল্যের হাতছানি দেখতে পাচ্ছিলেন। এই নতুন মতবাদের শক্তিতে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তর হতে থাকে, এবং মজঃফরপুরে বোমা-বিস্ফোরণের আগের দিন 'বন্দেমাতরম'-এ তিনি লিখেছিলেন, "ঘটনাপ্রবাহ ভিন্ন পথ নিলে আমরা সকলে সুখী হতাম, কিন্তু বিধির বিধান কে অমান্য করতে পারে ?" ১লা মে তিনি ঐ হত্যাকাণ্ডের খবর পান, এবং পরদিনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মানিকতলার বাগান বাড়িতে পুলিশী-তল্লাশীর ফলে জানা যায় যে সেখানে 'যুগান্তর' দল তার গুপ্ত কেন্দ্র তৈরী করেছিল। সেখানেই গড়ে উঠেছিল একটা গোপন অস্ত্রাগার।[১০১] অবশ্য সেটিকে অস্ত্রাগার বললে অত্যুক্তি করা হবে, কেন না মানিকতলায় পাওয়া গিয়েছিল মাত্র ১১টি পিস্তল, ৪টে রাইফেল এবং ১টা বন্দুক। আরও কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং বোমা-বারুদ পার্টির অন্যান্য কেন্দ্র থেকেও পুলিশের হস্তগত হয়েছিল। কিন্তু সব মিলিয়েও আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা ভীতি উৎপাদনের মতো ছিল না।[১০২] দলের সদস্যরা যথোপযুক্ত গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন যে হেলায় তুচ্ছ করেছিলেন তা সন্দেহাতীত। হয়তো তাঁরা দেশপ্রেমের, আত্মবিসর্জনের উন্মাদনায় উন্মত্ত অধীর হয়েছিলেন বলেই এ রকম ঘটেছিল। তাঁদের গতিবিধির উপর পুলিশের খর দৃষ্টি থাকলেও তাঁরা কেউই তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটদের সামনে ধৃতদের আবেগ-মথিত স্বীকারোক্তির মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল অকৃত্রিম দেশভক্তির সঙ্গে নিখাদ ভাবপ্রবণতা।[১০৩] এই ঘনঘটার মধ্যেও অরবিন্দের প্রশান্তি নষ্ট হয়নি। হেমচন্দ্র কানুনগোও ছিলেন নিরুত্তর।

এই সব ঘটনা ব্রিটিশ সরকারের উপর একটা রূঢ় আঘাত হেনেছিল।[১০৪] আর সারা দেশ হয়েছিল চকিত। বেশ কিছু সংখ্যক নিরপরাধ মানুষকে এই 'রাজদ্রোহে'র সঙ্গে জড়িয়ে ফেলায় তিলক খুবই ব্যথিত হন। অবশ্য তিনি এ কথা বলতেও দ্বিধা করেননি যে "যতদিন পর্যন্ত এ জাতীয় ঘটনার হেতুগুলিকে জীইয়ে রাখা হবে ততদিন এদের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে না। বোমা ব্যবহারের শিক্ষালাভ ভারতীয়দের হাতে এক মারাত্মক অস্ত্র হয়ে উঠেছে, আর সরকারী নিপীড়ন-নির্যাতন যদি ক্রমাগত চলতেই থাকে তবে দেশের অন্যান্য জায়গাতেও এই অস্ত্র প্রয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।" তিলকের সিদ্ধান্ত : "একমাত্র স্বরাজই বোমাতঙ্ক থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে পারে।"[১০৫] এই সমস্ত কথা লেখার জন্য বড়লাট মিন্টোর আদেশে তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ

আনা হয় এবং তিনি ছ' বছরের জন্য মান্দালয়ে দ্বীপান্তরিত হন। এ দিকে ১৯শে মে, ১৯০৮ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আলিপুর বোমার মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। উদীয়মান ব্যারিষ্টার সি· আর· দাশ (কিছুকালের জন্য 'নিউ পার্টির' সদস্য) তাঁর মক্কেলের (অরবিন্দ) জন্য ওজস্বিনী ভাষায় এক স্মরণীয় সওয়াল করেন। দাশ সাহেবের প্রধান যুক্তি ছিল—আলিপুরের বৈপ্লবিক তৎপরতা বা মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অরবিন্দের ক্ষীণতম যোগও ছিল না। সেসন্‌স্ জজ অরবিন্দকে বেকসুর খালাস দেন। ৬ই মে, ১৯০৯ সালে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন অরবিন্দ। বাংলা সরকারের মুখ্যসচিব এডয়ার্ড গেইট তাঁর নির্বাসন দণ্ড চাইলেন। স্বয়ং লেঃ গভর্নর বেকার তাঁকে সমস্ত আন্দোলনের চালক বলে মনে করতেন : "not a mere blind, unreasoning tool, but an active generator of revolutionary sentiment." ১৯০৮-এর মে মাসে তিনি টেলিগ্রামে বড়লাটকে জানালেন : "To release Aurobindo is to ensure recrudescence at any time of further spread of evil." ১৯১০ সাল পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য মিন্টো মর্লের কাছে ব্যর্থ আবেদন জানাচ্ছিলেন।[১০৬]

বিবাদী পক্ষের ব্যারিস্টার একজন জাতীয় বীরকে ফাঁসি কাঠ থেকে বাঁচাবার জন্য যে সওয়ালটি করেছিলেন তার প্রতি ঐতিহাসিকের অভিনিবেশ প্রয়োগ দরকার। ঐ সময়ে অরবিন্দের রহস্যপূর্ণ আচরণ, আত্মপক্ষ সমর্থনে অনীহা, দুর্ভেদ্য নীরবতা পালন আজ পর্যন্ত সকলের কাছেই বিস্ময়কর। মানিকতলার বাগান বাড়িতে কী ঘটেছিল তা কি তাঁর অজানা ছিল ? বৈপ্লবিক সংবাদপত্রগুলির উপর যথেচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারী করার জন্য এবং কিশোর সুশীল সেনকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাতের আদেশ দেওয়ার জন্য (রুশ ত্রেপভ্-এর জীবন কাহিনীর সঙ্গে এই ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়)[১০৭] সন্ত্রাসবাদীদের বিচারে কিঙস্‌ফোর্ড দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে হত্যার জন্য অরবিন্দই কি ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকীকে নিযুক্ত করেন নি ? কনিষ্ঠভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর পরিচালনাধীন 'যুগান্তর' দলের সঙ্গেই বা তাঁর কী সম্পর্ক ছিল ? বারীন্দ্রকুমার অরবিন্দকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে ঘোষণা করে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়েছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র কানুনগো এবং উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি অরবিন্দকেই তাঁদের নেতা বলে স্বীকার করতেন। অরবিন্দ অবশ্য বরাবরই অন্তরালে থেকে সমস্ত নির্দেশ দিতেন এবং নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করতেন, 'কালী' নামে। তা ছাড়া 'যুগান্তরে' প্রকাশিত 'সিডিশস' প্রবন্ধের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ নিয়মিত ভাবে ছাপা হতো 'বন্দেমাতরমে' এবং এ জন্য 'বন্দেমাতরম'ই প্রথম অভিযুক্ত হয়। বিগত কয়েকবছর ধরে, বিশেষ করে, ২৩শে এবং ২৯শে এপ্রিল, ১৯০৮-এ তিনি যে সব প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলেন সেগুলি কি বিশেষ অর্থবহ নয় ? শ্যামসুন্দর ঘোষ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় অবশ্য অরবিন্দের সহকারী হিসেবে মাঝে-মাঝেই 'বন্দেমাতরমে' সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন এবং শ্যামসুন্দর ঘোষের লেখার উপর অরবিন্দের রচনা-শৈলীর বিশেষ প্রভাবও ছিল। কিন্তু 'বন্দেমাতরম' থেকে উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি অরবিন্দের রচনা বলেই ধার্য করেছেন স্বয়ং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তাছাড়া প্রমাণাভাবে উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি রচনার দায়িত্ব থেকে অরবিন্দকে মুক্তি দেওয়া গেলেও শতসহস্র সম্পাদকীয় থেকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর 'বিদুলা' কবিতাটি সম্পর্কেই বা কী বলা যায় ? অ্যানড্রু ফ্রেজার ও পরে এডওয়ার্ড বেকার এ বিষয়ে যে সব দলিল-পত্র সংগ্রহ করেছিলেন তার থেকে প্রমাণিত হয় যে অরবিন্দই ছিলেন বাঙলার বিপ্লবীদের অবিসংবাদিত নেতা। মিন্টোকে ফ্রেজারের পরবর্তী ছোটলাট বেকার লিখেছিলেন, "তিনি (অরবিন্দ) নিষ্ক্রিয় এবং আজ্ঞাবহ যন্ত্রমাত্র নন,

তিনিই বিপ্লবী মতাদর্শের প্রচণ্ড এক উৎস।" অরবিন্দ অন হিমসেলফ্ অ্যাণ্ড অন দ্য মাদার নামক পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থটিতে অরবিন্দ স্বীকার করেছেন যে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ হলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি হিসেবে বিপ্লবী কর্মতৎপরতা গড়ে তোলার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন।

তা ছাড়া সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোথাও কোনও অস্বচ্ছতা ছিল না। সুনিশ্চিত ভাবেই তিনি অহিংসা মন্ত্রের উদ্গাতা মহাত্মা গান্ধীর পূর্বসূরী নন। এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্র এবং তিলকের সঙ্গেও তাঁর গভীর মতপার্থক্য ছিল। গোড়া থেকেই আইরিশ বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতি তাঁকে আকৃষ্ট করে এবং ১৮৯১ সালে পারনেল-এর দেহাবসানে মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখা তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা যেতে পারে।

"Deliverer lately hailed since by our lords
Most feared, most hated, hated
because feared."

[মুক্তিদাতা হে বীর তুমি বন্দিত হয়েছো অতি সম্প্রতি/ কেন না এতোদিন আমাদের প্রভুরা তোমাকেই সব থেকে বেশি ভয় করেছে/ ঘৃণা করেছে/ ঘৃণা করেছে কারণ তারা ভয় করেছে।]

ভারতবর্ষে 'সিন্‌ফিন্' পদ্ধতি অবলম্বনের চিন্তা তিনিই প্রথম করেন। ঠাকুর সাহেবের প্রভাব ও সংগঠনী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা তিনিই করেছিলেন। নিবেদিতা-বিরচিত 'কালী দ্য মাদার' সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে হিংসার মতাদর্শকে বিচার করতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এরপর থেকেই হিংসাকে শক্তির এক লীলা হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। মা—যিনি একাধারে প্রসব ও সংহার করেন—জীবন ও মৃত্যু তো নিখিলব্রহ্মাণ্ড জোড়া তাঁর নৃত্যের এক একটি পদক্ষেপ। "তুমি কি জানো না যে অশনি তাঁর হাতের একটি খেলনা...তাঁর আঙুলের একটি ইঙ্গিতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে সকল ভুবন ?" বৈদান্তিক ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হওয়ার পর থেকে অরবিন্দের কাছে প্রেম ও ঘৃণা, হিত ও অহিত—তাদের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল বিপরীতধর্মী এই সমস্ত অনুভূতি আত্ম-জ্ঞানের বিরোধী মায়া ছাড়া আর কিছু নয়। পরবর্তীকালে গীতা পাঠের ফলে এই উপলব্ধি প্রবল হয়ে ওঠে যে মধ্যবিত্ত মানুষের নীতিবোধ দ্বারা ঐশী শক্তির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম।"
(গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চাশৎ শ্লোক)

ঈশ্বর এক নতুন রূপে প্রতিভাত হলেন তাঁর চোখে।

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।" (গীতা, একাদশ অধ্যায়, দ্বাত্রিংশৎ শ্লোক)

ঈশ্বরই 'মহাকাল' তিনিই নিয়ত সৃষ্টি ও ধ্বংসের কাজে নিযুক্ত। সময়-নির্বিশেষ হওয়ায় একমাত্র তিনিই জানেন ঘটনাস্রোত কী রূপ নেবে। বহুকাল ধরে 'কারণ'গুলি পরিস্ফুটতর হয়ে উঠেছে এবং দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে তাদের স্বাভাবিক পরিণামের দিকে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির অবলুপ্তি এবং তারই সঙ্গে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার প্রাণ-নাশ—মহাকাল-নির্দিষ্ট পরিণাম। লোভের বশবর্তী হয়ে, স্বেচ্ছায় ইংরেজরা এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, এর ফল ভোগ তাদের করতেই হবে। এটাই নির্বিশেষ একটা মহাজাগতিক প্রয়োজন যাকে গ্রীকরা বলতেন moira। এর সামনে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সমস্ত চেষ্টা (অর্জুন যেমন করেছিলেন) ব্যর্থ

হতে বাধ্য। ইংরেজদের ধ্বংস ঈশ্বরাদেশে অনিবার্য এবং তিনি নিজে এই নির্দেশ পালনে অস্বীকৃত হলেও ঈশ্বর তাঁর এই ভয়ঙ্কর বিধান কার্যকর করবেন। নিজের ক্ষুদ্র, ভ্রান্ত বিচার-বুদ্ধি অনুসারে কর্ম-রত না হয়ে তিনি, অরবিন্দ, 'নিমিত্তমাত্র' হতে চান। ঈশ্বরের হাতের ক্রীড়নক তিনি, এখন তাঁর কর্তব্য শুধু ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনা সম্যক রূপে বোঝা এবং নির্দ্বিধায় তার বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা। বিষয়টিকে আরও বিস্তারিত করার জন্য তিনি লিখেছিলেন, "আমরা নিজেদের পূর্ব-পোষিত নৈতিক বিশ্বাস অনুযায়ী কেবল এক করুণাময়, সুবিচারী ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিই সৃষ্টি করবো কেন ? কেন দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মধ্যে করালিনী কালীকেও দেখি না ?" কুরুক্ষেত্রের অনিবার্যতা কে অস্বীকার করতে পারে ? অমৃতলাভের পথ সন্ধান করতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভের তত্ত্ব স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। অর্জুনের মতো ত্রাস-বিহ্বল দৃষ্টিতে নয়, নির্বিকার হয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হবে মহাকালের সেই রূপ, বিরত থাকতে হবে তাকে অস্বীকার, অবজ্ঞা করা থেকে, প্রতিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে। এই 'inner askesis"-কেই অরবিন্দ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—সমস্ত মায়া-বন্ধন ত্যাগ করে আপনাকে পবিত্র করতে হবে, ঈশ্বর-মনোনীত ব্যক্তিরূপে প্রতীক্ষা করতে হবে নিয়তির প্রত্যাদেশের জন্য, তাতে সাড়া দিয়ে আসুরিক শক্তি বিনাশ করে সে শুভশক্তির জয়-যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক করতে হবে।[১০৮]

অরবিন্দের এই সময়কার চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে : ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আসুরিক শক্তির মূর্ত রূপ, মানব জাতির ভবিষ্যৎ ভারতের মুক্তির মধ্যে নিহিত, এবং সে মুক্তি অর্জনের জন্য তিনি ঈশ্বরাদিষ্ট। তিনি অনুভব করতেন দিব্য স্পর্শে যাঁরা ধন্য হয়েছেন সেইসব মানুষের সহিংস আচরণ প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের কাছে আত্ম-নিবেদনেরই একটা প্রকাশ। সমাজে নৈতিক সামঞ্জস্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য যীশুর আত্মোৎসর্গের সঙ্গেই এর তুলনা চলে। এর পর আমাদের বোঝা সহজ হয় কেন গীতা ছিল বিপ্লবীদের নিত্য-সহচর এবং তাঁদের হস্ত-ধৃত গীতা বোমার চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী। গীতাই হত্যার ব্যাপারে বিপ্লবীদের মনোবল ইস্পাত-কঠিন করে তুলতো, (দেশ প্রেমের সমার্থক) ভগবৎ-সেবায় মৃত্যু বরণের মধ্য দিয়ে অমৃতলোকের সন্ধান দিতো। পিউরিট্যানদের বাইবেলের মতো তাই ছিল নিঃসঙ্গ বিপ্লবীর পথের সাথী, পথের দিশারী। গোয়েন্দা বিভাগ প্রায় প্রত্যেক বিপ্লবী আখড়ায় 'আনন্দমঠের' সঙ্গে পেত 'গীতা' এবং 'বর্তমান ভারত'।

অরবিন্দের এই দৃষ্টিভঙ্গী আগেও কারো কারো মধ্যে আভাসিত হয়েছিল। শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁর হত্যা সমর্থনের জন্য ১৮৯৭ সালে তিলকও অনুরূপ যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সাধারণ নৈতিক বিধিনিষেধের মানদণ্ডে অসাধারণ মানুষের আচার-আচরণ বিচার করা যায় না। আত্মীয়-স্বজন, এমন কি গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগের স্বপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি বিধৃত আছে গীতায়। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কোনও কর্মে মালিন্য স্পর্শ করে না। কূপ-মণ্ডুকের মতো তোমার দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে তুলো না, দণ্ড-বিধির বেড়া অতিক্রম করে শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতার জ্যোতির্ময় অলৌকিকতার স্তরে উত্তীর্ণ হও, তারপর অসামান্য পুরুষদের কর্মের গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হও।"[১০৯] তিলক অবশ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আজন্ম রোমান্টিক এবং দিব্যাবেশে আবিষ্ট অরবিন্দ ক্রমশই শক্তিমন্ত্রে অধিকতর বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন। তবে একটা অতি প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা তাঁর মনে কখনো জাগেনি। সহিংস নীতি প্রয়োগের জন্য যে অত্যাবশ্যক পূর্বসর্ত গীতায় উল্লিখিত হয়েছিল—সেই আত্মিক উদ্বর্তন কি তাঁর মনোনীত সহযোদ্ধাদের জীবনেও

ঘটেছিল ? তাঁরাও কি দৈবাদেশ পালনের উপযুক্ত আধার হতে পেরেছিলেন ? তিনি নিজেই কি বলেন নি—এই ঐশ্বরিক দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আপন চিত্তবৃত্তি, বুদ্ধি, হৃদয়, বাসনা—সর্বস্ব ঈশ্বরে সমর্পণ ? আত্মোপলব্ধি, ঈশ্বরানুরাগ, সৃষ্টিতত্ত্বে জ্ঞান, সুগভীর ও অচঞ্চল অনুরক্তি এবং নিঃশর্ত আত্ম-নিবেদন ছাড়া তো ঐ পথের পথিক হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর অতি কাছের মানুষ—বারীন, উপেন, উল্লাসকরের জীবনেও কি এই আত্মিক উত্তরণ ঘটেছিল ? তিনি স্বয়ং কি এই সাধনায় চরম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের তুল্য আধ্যাত্মিক নির্লিপ্তি অর্জিত হলেই ভয়ঙ্কর ঘটনাকে নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ সম্ভব হয় ; একমাত্র তখনই ক্ষীণতম বিবেকদংশন ছাড়াই হিংসাকে মেনে নেওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক এই সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অরবিন্দের চিন্তাধারার কিছু মৌলিক অসংগতি ধরা পড়ে। আসলে তিনি রুশ পপুলিষ্ট, তথা আইরিশ বিপ্লবী কর্মপন্থাকে গীতার দর্শনের মোড়কে ঢাকতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ সংশয় তাঁর মনে কখনো দেখা দেয়নি যে এই দুই তত্ত্বের সমন্বয় সম্ভব্ নয়। এই অস্বাভাবিকতাকে আঁকড়ে থাকলে আবর্ত-সঙ্কুল এই পৃথিবীতে বড়ো জোর কয়েকজন বিভ্রান্ত অর্জুনের দেখা পাওয়া যেতে পারে। রাজনীতির জগৎ থেকে অরবিন্দের নিঃশব্দ বিদায় গ্রহণ হয়তো এই অসংগতিরই পরিণাম। এ জাতীয় ভ্রান্তি বিষয়ে সতর্কতা বাণী উচ্চারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'দেশ-হিত' নামে একটি লেখায়।[১১০]

আলিপুর কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন 'রূপান্তরিত' এক অরবিন্দ। ১৯০৯ এর অগষ্টে এক গোপন পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে "তিনি নিজেকে বাসুদেবের অবতার" বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য লোকচক্ষে তাঁকে হাস্যাস্পদ করার জন্যও এ ধরনের প্রতিবেদনের সম্ভাবনাটাও অস্বীকার করা যায় না। আবার, যে অতি সূক্ষ্ম এবং দুর্জ্ঞেয় প্রক্রিয়া বা যোগাভ্যাস দ্বারা তাঁর আত্মিক পরিবর্তন ঘটছিল সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাও এর কারণ হতে পারে। তাঁর 'কারা-কাহিনী' থেকে জানা যায় যে তিনি এ সময়ে সর্বত্র, সকলের মধ্যেই, নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করছিলেন, কারাগারের লোহার গরাদ সহ সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুভব করছিলেন তাঁরই পবিত্র অস্তিত্ব। জাতীয়তাবাদকে তিনি যে আর 'ধর্ম' বলে মনে করেন না সে কথা স্বীকার করলেন উত্তরপাড়ায় প্রদত্ত এক ভাষণে। এখন থেকে সনাতন ধর্মই হয়ে উঠেছিল তাঁর জাতীয়তাবাদ। অসীম করুণাভরে ঈশ্বরই তাঁর সংশয় তিমির দূর করেছেন, মুক্ত করেছেন পাশ্চাত্যের মোহজাল থেকে, তাঁকে দান করেছেন যোগের এই মহামন্ত্র : "তুমি যাত্রা করো, সমস্ত জাতির কাছে প্রচার করো এই বাণী যে সনাতন ধর্মের জন্যই তাদের উত্থান দরকার, কেবল নিজের জন্য নয়, বিশ্বমানবতার জন্যই এই জাগরণ আবশ্যক।" শুধু ধর্মের জন্য এবং ধর্মের দ্বারাই ভারতবর্ষ তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে বহু যুগ ধরে। এমন কি তিনি এ কথাও বলেন, যে ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষের এই মহাজাগরণের প্রতিবন্ধকতা করেছে, প্রকারান্তরে তারাও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যই সাধন করে চলেছে। তিনি শ্রোতাদের শুনিয়েছিলেন তাঁর শোনা দৈববাণী : "তুমি কোন পথ পানে ধাবিত হচ্ছ তা তোমার অজ্ঞাত থাকলেও তোমার প্রতিটি আচরণই সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তোমায়। তুমি যা চিন্তা করো তা-ই কর্মে রূপান্তরিত হয় না। যে লক্ষ্যভেদের জন্য তুমি অধীর হয়ে ওঠো, তোমার প্রয়াস সম্পূর্ণ পৃথক, এমন কি বিপরীত আদর্শের রূপায়নে তোমাকে নিয়োগ করে।" 'কর্মযোগিন্'-এ (২৭শে নভেম্বর, ১৯০৯) অরবিন্দ অস্বীকার করলেন সন্ত্রাসবাদকে ; 'ধর্ম' নামক একটি পত্রিকায়(১২ই পৌষ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) জ্যাকসন হত্যার তীব্র সমালোচনা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হলেন না। এই নতুন

ভূমিকায় তাঁকে এক দিকে নরমপন্থার অতিমন্থরতা ও নির্জীবতার বিরোধিতা করতে দেখা গেল, অপর দিকে বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসেরও নিন্দা করতে। চরমপন্থীরা যে তাঁর এই বিস্ময়কর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তা পুলিশ রিপোর্ট থেকেই জানা যায়। এই পরিবর্তিত পরিবেশে সুরেন্দ্রনাথ বোম্বাই-এর নরমপন্থীদের কবল থেকে কংগ্রেস দখলের জন্য তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন। মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রস্তাব অবশ্য অরবিন্দকে একটা সুনির্দিষ্ট অভিমত ঘোষণায় বাধ্য করেছিল এবং তিনি তা করেও ছিলেন। সরকারী প্রস্তাবগুলিকে 'সংস্কার' আখ্যার অযোগ্য এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলে তাদের বর্জন করার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান। আর, নরমপন্থীদের 'বিভীষণ' আখ্যায় ভূষিত করতেও তিনি ইতঃস্তত করেননি। যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁকে সব রকম সরকারী নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে দেখা যায়। কিন্তু ১৯০৯ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় 'অ্যান ওপন্ লেটার টু মাই কান্ট্রিমেন' নামে যে লেখাটি তিনি প্রকাশ করেন তাতে বৈধ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সমর্থন করেই তিনি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কথা বলেন। পরে অবশ্য তাঁর এই স্ববিরোধী আচরণকে কারাদণ্ড এড়াবার (নিবেদিতার কাছে তিনি সে সম্ভাবনার কথা শুনেছিলেন) একটা কৌশল হিসেবেই গণ্য করা হয়। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর নবজীবন সূচনার দ্যোতক হতে পারে, চরমপন্থার রাজনীতি যে একটি নিঃশেষিত শক্তি, কিংবা এই আন্দোলনের উপর তাঁর আর কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই—এমন উপলব্ধিরও প্রকাশ হতে পারে, আবার অসম সংগ্রামে সাময়িক পশ্চাদপসরণও হতে পারে। ১৯০৯-এর ২৫শে ডিসেম্বর দ্বিতীয় যে খোলা চিঠিটি তিনি লেখেন তার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর শেষ প্রচারিত মনোভাব। চিঠিতে তিনি মর্লে-মিন্টো-জাতীয় সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন ও মুক্তি সংগ্রামের পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন। এ সবকিছুই ছিল নিবে যাওয়ার আগে দীপশিখার অন্তিম উচ্ছ্বাস। চিঠিটি তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনার কথা তিনি শোনেন এবং সহসা "ঊর্ধ্বলোক থেকে তিনি আদেশ পান" চন্দননগর এবং সেখান থেকে পণ্ডিচেরী যাবার জন্য। অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের এই নিস্তেজ অবসানের মধ্যে ফুটে উঠেছিল ধর্ম ও রাজনীতির বিষম ও অস্বাভাবিক মিলনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। এক নতুন জীবনের সিংহদ্বারে এসে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন—যাকে পরে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন—'দিব্য জীবন'।

রণহুংকারের মধ্যে চরমপন্থী আন্দোলন শুরু হলেও তার অবসান হয়েছিল ব্যর্থতার গুমরানিতে। সরকারের দমননীতি এই অসাফল্যের একমাত্র কারণ ছিল না। স্বেচ্ছাসেবীদের উপর পুলিশের নির্যাতন, সভা-সমাবেশ-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, মিথ্যে মামলার বিস্ময়কর আধিক্য এবং লঘু পাপে গুরু দণ্ড নিশ্চয়ই দেশের এই প্রথম উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর এমন একটা সময়ে প্রবল আঘাত হেনেছিল যখন তা স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক হয়ে ওঠার মতো প্রয়োজনীয় রণকৌশল আয়ত্ত করার সুযোগ পায়নি। তবে সরকারী নিপীড়নকেও অতিরঞ্জিত করা বাঞ্ছনীয় নয়।[১১১] ১৯০৯-এর পার্লামেন্টারী রিপোর্টে বাংলায় ১০টি, পূর্ববাংলা ও আসামে ১০৫টি রাজদ্রোহের অপরাধের জন্য বিচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। এই মামলাগুলির মধ্যে প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং অভিযুক্তরাও স্বল্পমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন বলে জানা যায়। কেবল আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত ও রাজসাক্ষী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত অপরাধীদের কারো কারো কঠোর সাজা হয়েছিল।

বিদেশী বর্জনে সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইংলণ্ড থেকে আমদানী পণ্যের বয়কটের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া অতিরঞ্জিত। বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্কে বার্ষিক রিপোর্ট থেকে কলকাতা বন্দরে বয়কটের আওতায় আনা পণ্য সম্ভারের নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে :

মূল্য (কোটি টাকার হিসেবে)

আমদানী দ্রব্য	১৯০৩-০৪	১৯০৪-০৫	১৯০৫-০৬	১৯০৬-০৭	১৯০৭-০৮	১৯০৮-০৯
তুলাজাত পণ্য	১৫·৫৯	১৮·৬৬	২১·৪৪	১৮·৬২	২৩·৭৩	১৬·২০
লবণ	০·৫২	০·৫৫	০·৫৩	০·৫২	০·৬২	০·৬৭
চিনি	১·৮৩	২·০৯	২·৫৩	৩·৩৪	৩·৭৮	৪·৬১

আমদানীকৃত পণ্যের পরিমাণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ হয়তো আরও নির্ভরযোগ্য হতো। লভ্যতথ্যের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে চিনির আমদানী উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছিল, লবণের আমদানী হ্রাস ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং ১৯০৭-৮ সালে তা স্বাভাবিক আমদানী ছাপিয়ে যায়। ১৯০৬-০৭ সালে আমদানীকৃত সূতী বস্ত্রের মোট মূল্য হ্রাস মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়, কেন না তার পরিমাণ প্রায় ১৯০৪-০৫ সালের মতোই ছিল এবং ১৯০৭-০৮-এ, সন্ত্রাসবাদের প্রচণ্ড তৎপরতার অধ্যায়ে, তা হঠাৎ বেড়ে যায়। ১৯০৮-০৯ সালে তা বেশ কমলেও ১৯০৯-১০ সালে আবার ১৯০৫-০৬-এর কাছাকাছি হয়েছিল অর্থাৎ ২০·২০ কোটি টাকা। পণ্য আমদানীর এই হ্রাসপ্রাপ্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক কারণে কতোটা হয়েছিল, কতোটা বা বয়কটের মতো অস্বাভাবিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়—তাও বলা কঠিন। ফ্রেডারিক নোয়েল প্যাটন (Frederick Nöel-Paton) তাঁর 'রিভিয়্যু অফ ট্রেড ইন ইন্ডিয়া ইন নাইটিন এইট অ্যাণ্ড নাইন' গ্রন্থে এই আমদানী হ্রাসের জন্য পূর্ববর্তী অর্ধদশককে অতি-উৎপাদন, অতি-বাণিজ্য এবং ১৯০৮ সালের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক মন্দাকে দায়ী করেছেন। এর জন্য বিলেতী পণ্যোৎপাদক ও মাড়োয়ারী পাইকারী আমদানীকারকদের মধ্যে কলহকে কিছুটা দায়ী করা যেতে পারে।[১১২] কলহ মিটে গেলে তিলক ও খাপার্ডের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে মাড়োয়ারীরা আবার আমদানী শুরু করে।[১১৩] তা ছাড়া বাংলার বাইরে যদি সমান উৎসাহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে বিলেতী দ্রব্য বয়কট করা হতো তা হলে এই 'রণ-নীতির' সাফল্য নিশ্চয়ই আরও বহুগুণ বেশী উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতো। কিন্তু ভালোভাবে কেবলমাত্র মহারাষ্ট্রেই এবং পঞ্জাবে কিছু কমমাত্রায় বয়কট অবলম্বিত হয়েছিল। কংগ্রেস-গৃহীত বয়কট প্রস্তাবের মর্যাদা অন্যান্য প্রদেশে যেটুকু রক্ষিত হয়েছিল তা ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নির্ভর। এইসব অঞ্চলে (যেমন উত্তর প্রদেশে) নরমপন্থীদের প্রাধান্য সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না এবং নরমপন্থীরা যে মুক্তি-যুদ্ধের এই হাতিয়ার সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তা সকলেরই জানা। উপরন্তু স্বদেশী পণ্যের অপ্রতুলতা, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে তা 'কালোবাজারে' লুকিয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষের উৎসাহ স্বল্পকালে স্তিমিত হয়ে যায়। বয়কট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। অন্যান্য বহু বিশিষ্ট নেতাও বয়কট সম্পর্কে নীতিগত ভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তা ছাড়া

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর বয়কটের অশুভ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে কবির সতর্ক-বাণী সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। এ সময়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল তার মূলে স্থানীয় আমলা ও রাজভক্ত কর্মচারীদের হাত থাকলেও এ জন্য চরমপন্থীদের বাড়াবাড়িও কম দায়ী ছিল না। হিন্দু জমিদারের নায়েব কর্তৃক অবাধ্য মুসলমান প্রজাদের শায়েস্তা করার উপায় হিসেবে তাদের বিলেতী পণ্য বয়কটে বাধ্য করার ঘটনাও ঘটেছিল।[১১৪]

শিক্ষা ক্ষেত্রে কার্লাইল, লিওন রিজলে ও অন্যান্য সার্কিউলার মারফৎ দমননীতির ফলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষত বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু সারা দেশে মাত্র ২৫টি মাধ্যমিক এবং ৩০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'গোলামখানা' হলেও বিশ্বের বাজারে তার ডিগ্রীর দাম চাকরী-অন্ত-প্রাণ বাঙালীর পক্ষে উপেক্ষা করার উপায় ছিল না।

চরমপন্থার লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থতার কারণ নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছেন এ· এল লেভ্কোভস্কি এবং ঈ· এন· কোমারভ-এর মতো রুশ ঐতিহাসিকরা।[১১৫] বিগত শতকের শেষার্ধে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের শক্তিবৃদ্ধি এবং ঔপনিবেশিক শোষণের মধ্যে এঁরা চরমপন্থার বিকাশের বিষয়গত (objective) উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। এই ঐতিহাসিকদ্বয় নরমপন্থীদের অভিন্ন জ্ঞান করেছেন সেই সব বুর্জোয়াদের সঙ্গে, যাদের গাঁটছড়া বাঁধা ছিল ব্রিটিশ মূলধন ও স্বদেশের সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের সঙ্গে। স্বদেশী মূলধনের বিস্তার ও উদ্যোগের ব্যাপারেও উৎসাহ ছিল এঁদের। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে এই দুই রুশ পণ্ডিত, নরমপন্থীদের সমীকরণ করেছেন : (১) সেই সমস্ত সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীদের সঙ্গে যাঁরা ক্রমবর্ধমান পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন এবং কৃষি উৎপাদন-জাত লভ্যাংশ তেজারতীতে খাটিয়ে তার থেকে পাওয়া সুদ আবার জমিতে বিনিয়োগ করেছিলেন। খাতকদের জমি বিক্রীতে বাধ্য করে কখনো কখনো তাঁরা আবার সেইসব জমি নিজেরাই কিনে নিতেন, (২) সেই অভিজাতবর্গ যাঁরা প্রথম দিকে বণিক ছিলেন ও পরে বাণিজ্য-প্রসূত উদ্বৃত্ত জমিতে বিনিয়োগ করেছিলেন, (৩) বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল ১ নং ও ২ নং শ্রেণী থেকে এবং যাঁদের বেশির ভাগই আইন ব্যবসায় ও সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন, (৪) শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত বুর্জোয়া। এঁদের কাছে স্বদেশীর তাৎপর্য ছিল সীমাবদ্ধ এবং সেটা অর্থনৈতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বেশি কিছু নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে ইংরেজদের প্রধান অংশীদার হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাদের সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে সহযোগিতাতে এঁদের বিশেষ আপত্তি ছিল না। অন্যদিকে শ্রেণীগত ভাবে চরমপন্থীদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এঁরা ছিলেন : (১) পাঁচমিশালী পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যাঁরা প্রধানত উদ্ভূত হয়েছিলেন ছোটোখাটো ভূসম্পত্তির মালিক শ্রেণী থেকে (জমিদারের দেয় রাজস্ব বাড়ানোর চেষ্টায় যাঁদের আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়তে হয়েছিল), গ্রামীণ সমাজের মোটামুটি লেখাপড়া জানা মানুষ (পুরোহিত সম্প্রদায়), (২) ছোটোখাটো ব্যবসায় নিযুক্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—ভারতবর্ষে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের ফলে যাঁদের অস্তিত্ব লোপের উপক্রম ঘটেছিল, (৩) অল্প মাইনের কেরানী, শিক্ষক ও অধ্যাপক—দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি যাঁদের অসহ্য হয়ে উঠেছিল, (৪) কারিগর ও হস্তশিল্পী সম্প্রদায়—সরকারের বিভিন্ন নীতি ও ব্যবস্থা যাদের জমি ও জীবিকা চ্যুত করে দিয়েছিল, এবং (৫) ছাত্রসমাজ—কার্জন যাদের লেখাপড়ার খরচ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অথচ প্রয়োজনের তুলনায় যাদের জীবিকার কোনও সংস্থান ছিল না, এমন কি ভদ্রভাবে জীবনযাপনেরও কোনও সুযোগ ছিল না।

কোমারভ্ এবং লেভ্‌কোভ্‌স্কি এ কথাও বলেছেন যে চরমপন্থায় আকৃষ্ট বুদ্ধিজীবীরা প্রেরণা পেয়েছিলেন ১৮৭০-এর দশকে দক্ষিণ ভারত ও পাবনায় কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর বিদ্রোহ্ এবং ১৮৯২-৯৩-এ শ্রমিক ধর্মঘটের মতো ঘটনা থেকে। এই প্রেরণা তাঁদের শ্রেণীগত বিক্ষোভের মধ্যে লালিত হতে থাকে এবং ক্রমশ দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং কার্জনের উগ্র সাম্রাজ্যবাদ তাকে অগ্নিশিখায় পরিণত করে। বয়কটের ডাকে জনসাধারণের কাছ থেকে মোটামুটি ভাল সাড়া পাওয়ায় চরমপন্থীদের আরও সংগঠিত হবার সুযোগ আসে এবং তাঁরা সুরাটে নরমপন্থীদের সঙ্গে শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবার সাহসও পান। এই আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলা দেশে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের ঘটনাগুলি, রুশ ঐতিহাসিকদের বিচারে, ছিল 'নিতান্তই ভ্রান্ত, পেটি বুর্জোয়াসুলভ সংগ্রাম', এবং এগুলি গণ-আন্দোলনের পথে শুধু অন্তরায় সৃষ্টিই করেছিল। সন্ত্রাসবাদীরা বৃথাই ভেবেছিলেন যে 'তাঁদের আত্মত্যাগ এবং সন্ত্রাস ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের পথ করে দেবে।' এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীতে আচ্ছন্ন হওয়ায় বহু খাঁটি দেশব্রতী গণসংগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ হারান, গণ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পেটি বুর্জোয়াসুলভ ভাবালুতা এবং জনতা সম্পর্কে সহজাত নিস্পৃহতা থেকে মুক্ত হতে পারলে চরমপন্থীদের আন্দোলন যে কী রূপ পরিগ্রহ করতে পারতো, রুশ ঐতিহাসিকরা বোম্বাই-এর সাধারণ ধর্মঘট সম্পর্কে লেনিনের মন্তব্য উদ্ধৃত করে তার ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন।

নরমপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে টনি-থিসিস এবং চরমপন্থী সম্পর্কে ট্রেভর-রোপার-থিসিস—দুই-ই আভাসিত হয়েছে কোমারভ্ ও লেভ্‌কোভ্‌স্কির বক্তব্যের মধ্যে। কিন্তু এঁদের অভিমতের পরিধির বাইরেও কিছু থেকে যায়। চরমপন্থী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকদের তালিকায় উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের বেশ কয়েকজন বড়ো জমিদারের অন্তর্ভুক্তি রুশ ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না। বরিশাল 'স্বদেশ-বান্ধব সমিতি'র উপর ন্যাথানের প্রতিবেদনে দেখি বাসান্দার উপেন্দ্রনাথ সেন, বাঁশবুনিয়ার দাশরা, জলাবাড়ির বৈকুণ্ঠ ও প্রমথ বিশ্বাস, কলসকাঠির বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরী ও ব্রজকান্ত রায় জমিদার হয়েও চরমপন্থীদের সাহায্য করতেন। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবীদের উপর প্রতিবেদনে ষ্টিভেনসন মুর লিখেছেন পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রায় ৮৫০০ স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে ঢাকা ও বাখরগঞ্জ থেকে এসেছিল ২৫০০ করে।[১১৬] স্বরূপকাঠির স্বেচ্ছাসেবীদের প্রায় অর্ধেক ছিল তালুকদার। তালুকদারের আয় কমে যাচ্ছিল এবং বিলাসব্যসন সঙ্কুলান হচ্ছিল না বলেই কি তারা বিপ্লবী দলে যোগ দেয়? তা ছাড়া গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, নাড়াজোলের নরেন্দ্রলাল খান, উত্তরপাড়ার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কাঁথির দিগম্বর নন্দের নামও করা যায়। কার্জন-প্রস্তাবিত বঙ্গ-ভঙ্গ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রদ-বদল ঘটাতে পারে—শুধুমাত্র এই আশঙ্কাতেই কি জমিদাররা চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করেছিলেন?

লালা লাজপৎ রায়ের অটোবায়োগ্রাফিক্যাল রাইটিংস থেকে এ তথ্যও পাওয়া গেছে যে 'ক্যানাল-কলোনীজ বিল' জমিদারদের স্বার্থে ঘা দিয়েছিল বলেই তাঁরা পঞ্জাবের আন্দোলনে আর্থিক সহায়তা ছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিলেন। উনবিংশ শতকের শেষে এদের বন্ধকী জমির পরিমাণ বেড়েছিল ২০০%।[১১৭] যে দুজন নেতা লালার কাছে শলা-পরামর্শের জন্য গিয়েছিলেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে 'জমিদার' সম্পাদক মিয়া সরাজউদ্দীন এবং চৌধুরী সাহাবুদ্দিন। চৌধুরী সাহেব জমিনদার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। উগ্র চরমপন্থী হিসেবে পরিচিত অজিত সিং-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামভজ দত্তচৌধুরী—যাঁর ভূসম্পত্তি ছিল রীতিমতো উল্লেখযোগ্য।

পঞ্জাবে হাঙ্গামার আগে যাঁরা রাওয়ালপিণ্ডির জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন উকিল ও সম্ভ্রান্তকুলজাত অর্থাৎ এমন বেশ কিছু মানুষ যাঁরা জীবিকার সূত্রে জড়িত ছিলেন। কার্জনের 'পঞ্জাব ল্যাণ্ড অ্যালিয়েনেশন অ্যাক্ট' বণিক শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করেছিল, এদের অনেকেই ছিল আর্যসমাজী। 'ইনসল্‌ভেন্সি অ্যাক্ট' আবার মহাজনদের ক্ষেপিয়ে দেয়।

সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডের বিপ্লব প্রসঙ্গে নিজ উদ্ভাবিত তত্ত্বের ক্ষেত্রে এ জাতীয় স্ববিরোধিতা এড়াবার জন্য ট্রেভর-রোপারকে রাজতন্ত্র বিরোধী পিউরিটানদের দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হয়েছিল—পিম এবং হেসিলরীজ-এর মতো ধনী হুইগ এবং ক্রমওয়েলের মতো স্বল্প-বিত্ত ইনডেপেণ্ডেন্টস্। ভারতবর্ষে চরমপন্থীদের মধ্যে এ ধরনের বিষম শ্রেণী/গোষ্ঠীর সহাবস্থান এবং সে-কারণে তাঁদের আন্দোলনের দুর্বলতার কথা কি রুশ ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন? চরমপন্থীদের সংগ্রাম অতি প্রবল হয়ে ওঠার জন্যই কি সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী সম্প্রদায় তার থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন? পাল্টা চাল হিসেবে সরকার কি প্রজাদের জমিদারদের বিরুদ্ধে উস্‌কে দিচ্ছিল?[১১৮] মৈমনসিং-এর মহারাজা কি উৎসাহ হারিয়েছিলেন যখন বহু বাকী খাজনার নালিশ ব্রিটিশ আদালত খারিজ করে দেয়? প্রজাদের সামনে তাঁরা কি সরকার বিরোধী ভূমিকা নিতে চান নি?

দ্বিতীয়তঃ, জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্য মধ্যসত্ত্বাধিকারীদের আয় ১৮৮৫-র বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইনের ফলে সত্যি কি কমে গিয়েছিল? দখলিদার-সত্ত্ব যাদের ছিল তারা দখলদারীহীন চাষীদের উপর অবাধে খাজনা বাড়াতে পারতো। বৃত্তিজীবী বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই দখলিদার-সত্ত্বের জমি কিনেছিলেন ও তা আবার ঠিকায় বিলি করেছিলেন। তাঁদের উপর খাজনার ভার চাপালে তাঁরা নিম্নতর বর্গের উপর তা চাপিয়ে দিতেন। হয়তো মামলা-মোকর্দমার খরচ বেড়েছিল, হয়তো যে পরিমাণ খাজনা পাওয়ার কথা ছিল তা কোনও দিন আদায় হতো না। এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান ও প্রাপ্ত তথ্যের সঠিক মূল্যায়ন ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো অযৌক্তিক। যাঁরা নিজেদের জমিতে চাষ-আবাদ করতেন, জনমজুরের রোজ বৃদ্ধির ফলে তাঁদেরও যথেষ্ট অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি কি পরিমাণে উৎপাদন-ব্যয়-বৃদ্ধি-জাত অসুবিধে দূর করতে সক্ষম হয়েছিল—তা-ও সুনিশ্চিত ভাবে বলা কঠিন। বাংলাদেশের মাঝারি শ্রেণীর জোতদারদের অর্থনৈতিক অসন্তোষ সম্পর্কে পূর্ববাংলা ও আসাম সরকারের চীফ সেক্রেটারী ল'মেসুরিয়েরের স্মারকলিপি পূর্ণাঙ্গ বা যথেষ্ট নয়।

তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বাখরগঞ্জের (চরমপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি) মতো কিছু এলাকায় তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। পূর্ববাংলার বিক্রমপুর এবং পশ্চিমবাংলার হরিনাভির (এই সব জায়গাতেও চরমপন্থী আন্দোলন ভালোভাবেই দানা বেঁধেছিল) মতো সম্ভ্রান্ত শ্রেণী-অধ্যুষিত অঞ্চলে চাষাবাদযোগ্য জমি প্রয়োজনের তুলনায় কমই ছিল, আর জীবিকানির্বাহের সুযোগও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। মানুষের অভাব-অনটন চরমপন্থীদের দলভারী হওয়ার একমাত্র কারণ বা প্রধান কারণ না হলেও ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ জেলায় তা-ই তাদের জনপ্রিয়তার হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে এই তথ্য স্মর্তব্য যে এদেশে ভদ্রলোক সম্প্রদায় বা কৃষিজীবীরা কখনো সর্বত্র সম-চরিত্র বিশিষ্ট ও সুবদ্ধ একটা শ্রেণী হয়ে ওঠেনি। এই সমস্ত বিসদৃশ স্বভাবের গোষ্ঠীর—যাঁদের উপর মূল্যবৃদ্ধি এবং সাধারণ অর্থনৈতিক দুর্গতির প্রতিক্রিয়া ছিল আলাদা আলাদা—বিভিন্ন উপাংশে যথাবিহিতভাবে বিভক্ত করার জন্য হয়তো লেফেভ্‌র (Lefebvre)-এর মতো সুযোগ্য

ঐতিহাসিকের সহায়তা দরকার। সব শেষে এ প্রশ্নটাও তোলা যায় যে দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকলে ছোট ব্যবসায়ী বা দালালদের আয় কি কমে যায় ? সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা অন্তত সে সাক্ষ্য দেয় না।

গত শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় অল্প মাইনের কেরানি, স্কুল-শিক্ষক-জাতীয় মানুষের অনটন-অসন্তোষের ছবিটা অবশ্য পরিষ্কার। এঁরা যা বেতন পেতেন, কুড়ি-তিরিশ বছর আগেও তাতে ক্লেশে চলতো। মূল্য-স্ফীতির সঙ্গে তা আদৌ তাল রাখতে পারছিল না। একজন চাপরাশীর মাস-মাইনে যেখানে ছ' কি সাত টাকা ছিল সেখানে 'কনিষ্ঠ' একজন কেরানি পেতেন পনেরো, আর তাঁর 'বাজেটে'র ন'টাকাই চলে যেতো খাদ্যদ্রব্যের সংস্থানে (প্রত্যহ ৬ পাউণ্ড খাদ্যশস্যের হিসেবে)। শহরাঞ্চলে বাড়ি ভাড়াও বেড়ে গিয়ে কোথাও দ্বিগুণ, কোথাও বা চারগুণ হয়ে গিয়েছিল।[১১৯] চিরল লিখেছেন যে বাংলাদেশে ৩,০৫৪ জন স্কুল-মাষ্টারের মধ্যে ২১০০ জন মাসে তিরিশ টাকারও কম মাইনে পেতেন।[১২০] মাইনেপত্র ঐ সময়ের মধ্যে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ বাড়লেও সংসার খরচ বেড়ে গিয়েছিল শতকরা ১৫০ ভাগ।[১২১] মাথা-পিছু গড় আয়ের যে হিসেব ডিগ্‌বী দিয়েছেন (মূলত লর্ড ডাফ্‌রিনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করে) পক্ষপাতিত্বের অপবাদে তাকে বাতিল করলেও ভি· কে· আর· ভি· রাও-এর যুক্তি ও তথ্য-নির্ভর বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে ১৮৬৮ এবং ১৮৯৫-এর মধ্যে এই আয় মাথা-পিছু সাত থেকে আট টাকার বেশি বাড়েনি। ওয়াদিয়া এবং যোশীর হিসেব অনুযায়ী ১৯১৩-১৪-তে এ দেশে মাথাপিছু গড় আয় দাঁড়িয়েছিল ৪৪ টাকায়। ১৮৭৩ সালকে ভিত্তি বছর হিসেবে গণ্য করে, ১০০টি পণ্যের মূল্যসূচীর গতিপ্রকৃতির একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা সম্ভব। ১৯০৯ সালের পর থেকে মোটামুটি ভাবে আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। পরিশিষ্ট 'খ' তে দেওয়া পরিসংখ্যান-সারণী থেকে বোঝা যাবে ১৯০৫-এর পর খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সব চেয়ে কষ্ট বেড়েছিল বাংলার বাখরগঞ্জে, কলকাতা, ঢাকা, মেদিনীপুর এবং রঙপুরে, পঞ্জাবের অমৃতসর ও রাওয়ালপিণ্ডিতে, পশ্চিমভারতে বোম্বাই এবং আহমদ্‌নগরে এবং মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে—অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে চরমপন্থী আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

চিরল আরও লিখছেন যে ডাফ্‌রিনের শাসনকালে (১৮৮৬-৮৭) পাবলিক সার্ভিস কমিশন শিক্ষা বিভাগে অযথা শ্বেতাঙ্গদের থেকে ভারতীয়দের আলাদা করে দেওয়ায় শিক্ষিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। নতুন এ ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হয় তা যে মিথ্যে আশ্বাস তা বুঝতেও কারো অসুবিধে হয়নি।[১২২] পাবলিক সার্ভিসের অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছিল। বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের অবস্থা ছিল আরও সঙ্গীন। ডি· পি· আই· স্পষ্টই বলেছিলেন, "সাধারণ ভাবে বলা যায় যে মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং বেতন যে কোনও যুক্তিসঙ্গত এবং স্বাভাবিক মানের থেকে নীচু এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাচ্ছে যে বাংলা ও পূর্ববাংলায় শিক্ষার হালচাল বেশ শোচনীয়।" ১৯০৯ সালে মিশনারীদের এক সম্মেলনে ডঃ গারফিল্ড উইলিয়ামস্ কলকাতায় ছাত্র-জীবনের যে হতাশাব্যঞ্জক এবং মর্মস্পর্শী ছবি তুলে ধরেছিলেন তা অতিরঞ্জিত বলে মনে হলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে একজন কারিগর, এমন কি একজন মুটে-মজুরও দিনে বারো আনা থেকে এক টাকা রোজগার করতে সক্ষম হলেও একজন শিক্ষিত তরুণের পক্ষে (উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য যে নিজে এবং তার

পরিবারের অন্যান্য সকলে দীর্ঘদিন দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে) তিরিশ, এমন কি, কুড়ি টাকা, মাস-মাইনের একটা চাকরী যোগাড় করাও ছিল প্রাণান্তকর ব্যাপার। এ সময়ে বাংলায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা গিয়ে পৌঁছেছিল ৪০,০০০-এ।[১২২] সন্দেহ নেই, চরমপন্থীদের দল ভারী করেছিল সেই সমস্ত কেরানি, শিক্ষক, ছাত্র এবং মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারের বেকার ছেলেরা যাদের জমি-জায়গা বলতে কিছুই ছিল না।

কিন্তু এদের দিয়ে তো বিপ্লব হয় না। কলকাতা এবং বোম্বাই-এর শ্রমিকরা এবং বরিশাল ও পঞ্জাবের কৃষকরা নিঃসন্দেহে চরমপন্থী আন্দোলনকে জোরদার করেছিল, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে দেশের কৃষক ও শ্রমিকরা এর থেকে দূরে সরে ছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবমুখী করে তোলায় চরমপন্থীদের অক্ষমতার মধ্যেই তাঁদের গোটা আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল নিহিত ছিল। 'জনগণের কাছে আবেদন' সম্পর্কে অনেক ভারী ভারী কথা বললেও তাদের প্রভাবিত করায় এঁদের অসাফল্য প্রকট হয়ে উঠেছিল। এইসব মানুষকে দেওয়ার মতো চরমপন্থীদের কিছুই ছিল না। তিলক এবং অরবিন্দ ছাত্রদের উপরই অত্যধিক নির্ভর করেছিলেন, আর নির্ভর করেছিলেন 'হিন্দু ধর্মের ইন্দ্রজালের' উপর। ছাত্ররা চিরকাল তারুণ্য, তেজ, আদর্শ জগৎ গড়ার স্বপ্ন, ও আত্মত্যাগের প্রতীক হলেও তাদের অধৈর্য, উগ্রতা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক শিকড়ের অভাব দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতিকূল ছিল। দলবদ্ধ সংহত কর্ম ছাত্র সমাজের ধর্ম নয়। আর বলা বাহুল্য, 'হিন্দুত্বের বড়াই' এ দেশের সব থেকে প্রভাবশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে চরমপন্থীদের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। স্বাধীনতা লাভের জন্য এতোদিন লডাইটা করছিল দুটি দলে, এখন সমরাঙ্গনে হাজির হলো তৃতীয় পক্ষ—মুসলমান, আর নবাগতকে স্বপক্ষে ও স্ববশে রাখার জন্য কূটকৌশলী ইংরেজ চেষ্টার কোনও কসুর করেনি।

ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আদর্শবাদ ও ধর্মীয় উপাদনগুলিকে তুচ্ছ করে রুশ ঐতিহাসিকরা স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় দেননি। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে পিউরিট্যানিজম-এর ভূমিকা সম্পর্কে অনুরূপ ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছিলেন ক্রিস্টোফার হিল। তিনি অবশ্য পরবর্তীকালে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন। তিলক, বিপিনচন্দ্র এবং অরবিন্দকে, সীমিত অর্থে হলেও, বুর্জোয়া শিবিরে দাঁড় করিয়ে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকরা ঠিক করেননি। ঔপনিবেশিক শোষণের বিরোধী হলেও ঐ নেতারা সদ্য-আবির্ভূত ন্যাশানাল বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখপাত্র ছিলেন না, ধনতন্ত্রের দ্রুত এবং ব্যাপক প্রসারেও আগ্রহী ছিলেন না। প্রোটেস্টান্টিজ্‌ম-এর অন্তর্নিহিত নৈতিকতার বিশদ, ব্যাখ্যা যেমন ধনতন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না, তেমনি চরমপন্থী মতবাদের অন্তঃস্থ আদর্শবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ দ্বারা ব্যাখ্যাত হতে পারে না। চরমপন্থীরা আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার সঙ্গে আপোষ করতে রাজী ছিলেন না ; নৈরাজ্যবাদী উইলিয়ম মরিসের মতো অরবিন্দ (কিছুটা তিলকও) আকুল হয়ে উঠেছিলেন সুবর্ণময় সেই সূর্যালোকের জন্য, কাল যখন স্তম্ভিত, নিথর হয়ে থাকে অনন্তের কিনারায়। ক্রোপোট্‌কিন যে 'স্বর্গীয় সুখানুভূতি'র কথা বলেছেন, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রশান্তির যে বন্দনাগান শুনিয়েছেন, প্রুধোঁ যে মালিন্যহীন দারিদ্র্যের জয়গাথা রচনা করেছেন, সম্পদের অবিরাম বৃদ্ধি নয়, আত্মার অবিরত রূপান্তরের কথা বলেছেন, সেই উপলব্ধি এবং অনুভূতিগুলিই তো প্রতিফলিত হয়েছিল চরমপন্থার ধ্যান-ধারণায়। জনগণ-সম্পর্কহীন এই পপ্যুলিজম, যন্ত্রবিবর্জিত এই সোস্যালিজম সোনার পাথরবাটির মতো।

মহিমময় এক অতীত এবং উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মত দোদুল্যমান চরমপন্থী মতবাদকে "আধ্যাত্মিক নারোদনিজম্‌" আখ্যা দেওয়া যায়। প্লেটোর রচনায় দেখা

যায় গ্লকন সক্রেটিশ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন যে তিনি এমন এক অবাস্তব নগর-নির্মাণে-রত, পৃথিবীতে কোথাও যার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অ্যাথেন্স-এর 'জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ' এর উত্তরে বলেন যে "হয়তো দৃষ্টান্ত হিসেবে এমনি এক নগর স্বর্গরাজ্যে অবস্থান করছে। একমাত্র 'তৃষিত চোখ'ই তাকে দেখতে পায়, আর দেখা পেলে নিজেকে সেই স্বপ্ন-রাজ্যের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। আর, তার অস্তিত্ব আছে কিনা, কোনও দিন থাকবে কি থাকবে না—এসব প্রশ্নেই বা কী আসে যায় ? এই 'দর্শন' যার ভাগ্যে ঘটেছে, অন্য কোনও নগরের আকর্ষণ তাকে প্রলোভিত করতে পারবে না।"[৮] ধ্রুপদী সাহিত্যে অগ্রগণ্য অরবিন্দের বাণীতে সক্রেটিশ-এর এই প্রত্যয়ই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

মার্ক্সবাদীরা অবশ্য বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনতে পারেন যে তাঁরা ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের জয়গান করেছেন, এ দেশে ধনতন্ত্রবাদ যে প্রায়-প্রতিষ্ঠিত—সে বিষয়ে ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা বা নির্লিপ্ততার পরিচয় দিয়েছেন। চরমপন্থীদের স্বপ্নের সমবায়-ভিত্তিক গ্রাম বহু শতাব্দী আগেই নিঃশেষে মুছে গেছে। পেটি বুর্জোয়া কৃষকদের মৌল সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে প্রগতির অন্য কোনও পথের ব্যর্থ সন্ধানে তাঁরা শক্তির অপচয় ঘটিয়েছেন। এই সমস্ত অভিযোগের উত্তরে চরমপন্থীরা বলতে পারেন যে মার্ক্সবাদীরাই ভারতবর্ষকে ধনতন্ত্রবাদের নির্মম বিধানের সম্মুখীন করে দিয়েছেন, যে ধনতন্ত্রবাদ প্রতীচ্যের দেশগুলিতে কৃষকদের পরিণত করেছে 'সর্বহারায়', ধ্বংস করে দিয়েছে সহজ সরল গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাকে। চরমপন্থীরা এ বিষয়ে প্রায় নিঃসংশয় ছিলেন যে, পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদই এগিয়ে আনবে সেই সর্বনাশা দিনগুলি যখন তৈরী হবে আলডুস হাক্সলির 'বলিষ্ঠ নতুন সমাজ'। সেখানে বাস করবে মানুষ নামধারী মেষের পাল যারা ঈশ্বরের বদলে বস্তু-সর্বস্বতার দেবতা 'মোলক' (Moloch)-এর আরাধনা করবে। ধনতন্ত্রবাদের মতো সমাজতন্ত্রবাদেরও আমদানী হয়েছে পশ্চিম থেকে : একটা অহিত জন্ম দিয়েছে আরেকটার। চরমপন্থীরা তাই চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য জগতের এই দুটি অপ-সৃষ্টির উপরে অভিশাপ বর্ষণ করে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক চেতনা-মণ্ডিত সত্যযুগে ফিরে যাবে। এ ধরনের চিন্তাধারার মধ্যে বাস্তব-বিমুখতা বা পলায়নী-মনোবৃত্তির অভ্রান্ত প্রমাণ অনেকে খুঁজে পাবেন, কিন্তু চরমপন্থীরা নিশ্চিত ছিলেন যে প্রতীচ্য-অনুসৃত পথের পরিণাম—মহতী বিনষ্টি।

নারোদনিকদের ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের নীতিকে লেনিন বর্জন করার পর থেকে মার্ক্সবাদীরা তার বিকাশ ও মূল্যায়নের ব্যাপারে নিরাবেগের পরিচয় দিতে অক্ষম হয়েছেন। কিন্তু রাশিয়াতে সন্ত্রাসবাদেরও যে একটা ভূমিকা এবং প্রয়োজন ছিল তা স্বয়ং মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্ও স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের থেকে রাশিয়ার ভূমি সমস্যা সম্পর্কে যাঁরা অনেক বেশি অবহিত ছিলেন সেই নারোদনিকির বিপ্লবী শাখাটির উপর আক্রমণের জন্য প্লেখানভ এঙ্গেলস্-এর বিরাগভাজন হন। স্বয়ং লেনিনকে ১৯০৭-এর লণ্ডন কংগ্রেসের আগে 'সুবিধাবাদী'র ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদের নীতিগত সমালোচনাকে তিনি পুঁথিগত বিদ্যার জাঁক বলে মনে করতেন। এদেশে রবীন্দ্রনাথ-কৃত চরমপন্থার সমালোচনা ছিল অনেক বেশি যুক্তিসিদ্ধ, কেননা তিনি এর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল : চরমপন্থীদের বিভ্রান্তির বীজ ছিল তাঁদেরই অবচেতন মনে। আসলে তাঁরা পশ্চিমের জঙ্গী জাতীয়তাবাদকেই দিশি পোষাক পরাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'গোরা'কে এজন্যই তিনি জন্মসূত্রে আইরিশ করেছিলেন। ভারতীয়

সংস্কৃতির প্রতি বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভালবাসা নিয়ে, হিন্দুধর্মের গৌরবে আবিষ্ট হয়েও সাধারণ দীনহীন মানুষের সঙ্গে গোরা কোনও দিনই আত্মিক সংযোগ গড়ে তুলতে পারেনি। তার জীবনের এই ব্যর্থতা এবং চরমপন্থীদের অসাফল্যের হেতুটা অভিন্ন। সাধারণ মানুষের জীবনে তাঁরা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারেননি, তাঁদের অস্তিত্বের শিকড় জন-মানসের গভীরে পৌঁছতে পারেনি। আর সন্ত্রাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে 'ঘরে বাইরে'তে। পশ্চিম থেকে ধার-করে-আনা নীট্‌শে-বর্ণিত জীবন-দর্শনের মেকি ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত সন্দীপ, আর সেই মিথ্যে আভায় বিমুগ্ধ বিমলা। ভেসে যেতে দেরী হয়নি তার। কিন্তু রূঢ়, নগ্ন সত্যটা হঠাৎই অনাবৃত হয়ে পড়ে। অতিমানবের জৌলুষ নিঃশেষে মুছে যায়, খসে যায় আদর্শবাদের সমস্ত বাহারী-পালক, বেরিয়ে আসে নীচ, লোভী, কপট, স্বেচ্ছাচারী সন্দীপ। উপন্যাসটি কিন্তু বিমলার মোহভঙ্গের বিষাদের মধ্যেই শেষ হয়নি। দিগন্ত প্রসারিত, শস্যশূন্য প্রান্তরের দিকে শূন্য-চোখে-চেয়ে-থাকা, মূর্তিমতী শোকের মতো বিমলার কাছে তার স্বামী নিখিলেশের রক্তাক্ত, মুমূর্ষু দেহটা নিয়ে আসা হয় (সন্দীপের মোহে এই স্বামীকেই প্রতারণা করতে উদ্যত হয়েছিল বিমলা!) সন্দীপ যখন নীট্‌শের ঢং-এ সংগ্রাম বিষয়ে শূন্যগর্ভ কথার ফুলঝুরি ছড়াতো, বিনয়ী, মিতবাক্, স্বপ্নদর্শী নিখিলেশ তখন নিজের জীবন বিপন্ন করেছে এই বিশ্বাসে যে সত্যের জয় হবেই, মানুষে মানুষে হানাহানি পাপ, আর নিছক পার্থিব স্বাধীনতার জন্যে মানবাত্মার শাশ্বত মুক্তিকে বিকিয়ে দেওয়া ভয়ঙ্কর অন্যায়। সংগ্রামের লক্ষ্য যদি মহৎ হয় তবে তার সিদ্ধির পথটাকেও মহৎ হতে হবে। পশ্চিমের সঙ্গে সংঘাত নয়, পশ্চিমের সঙ্গে সহযোগিতা, মেলা ও মেলানো—ভারতবর্ষের পুণ্যব্রত। তা সার্থক হলে সর্বত্র মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়ে যাবে"।

চরমপন্থীরা পথভ্রান্ত ছিলেন। কিন্তু আইরিশ ইষ্টার অভ্যুত্থানকারীদের উদ্দেশে ইয়েটস্ যা লিখেছিলেন তা কি ওঁদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য নয়?

"And what if excess of love
Bewildered them till they died?"
[প্রেমের আতিশয্য যদি তাদের বিমূঢ় করে থাকে
মৃত্যু পর্যন্ত—
তাতেই বা কি আসে যায়?]

আর সত্যই কি এই আত্ম-বিসর্জন একেবারেই অকারণ? নিরর্থক? বীরের এই রক্তস্রোত শুধু ধরার ধূলায় হারিয়ে যাবার জন্য তো নয়। শত শত শহীদের আত্মাহুতির কথা গুঞ্জরিত হয়েছে দেশবাসীর স্মৃতিতে, ক্ষুদিরামের ফাঁসির বেদনা-বিদ্ধ কাহিনী নিঃসঙ্গ বাউলের কণ্ঠে গান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পথে প্রান্তরে, সাধারণ মানুষের অক্ষম-রোষতপ্ত অশ্রুজল ঝরেছে বহুকাল। সত্যেন আর কানাই যে ফাঁসির দড়িটাকে বরমাল্যের মতোই গলায় পরেছিলেন—সে কথা কে-ই বা ভুলতে পেরেছে? তাঁদের আত্মোৎসর্গে দেশবাসীর শতশতাব্দীর তন্দ্রা ভেঙে গেছে। শক্তিমান আশায় বুক বেঁধেছে; বীরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দুঃসাহস যাদের ছিল না, সেই সব দুর্বল মানুষকেও হতাশায় ভেঙে পড়তে দেয়নি অখ্যাত, অবজ্ঞাত চাষীমজুর, কেরানি, শিক্ষক, ছাত্র আর উকিলের দুঃখ বরণের অবিশ্বাস্য কাহিনী। তাই গান্ধীজী যখন ডাক দিলেন আরও কঠিন সংগ্রামের জন্য—আরও কঠিন, কেন না তা অহিংসানীতির কঠোর নিয়মাবদ্ধ—তখন দেখা গেল ভারতবর্ষ মনেপ্রাণে প্রস্তুত। গ্রামেগঞ্জে, ছোটোবড়ো শহরের ধুলোমাটি থেকে উঠে দাঁড়াল লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী। মৃত্যুভয় আর তাদের কাউকে কাতর করতে পারেনি, কেন না ইতিমধ্যে, ১৯০৫-১০ এই

বছরগুলিতে, অমৃত-পথ-যাত্রীদের কাছ থেকে জীবনমৃত্যুর গোপন রহস্যটা তারা শিখে নিয়েছিল।

"তোমরা—যারা এই দ্বার প্রান্তে উত্তীর্ণ হয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে চাও—জানো তোমাদের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে ?"

মেয়েটির শান্ত, অবিচলিত উত্তর, "আমি তা জানি।"

"দুঃসহ হিম, ক্ষিধের অসহ্য জ্বালা, সমস্ত পৃথিবীর ঘৃণা, বিদ্রূপ, বিদ্বেষ, ধিক্কার, কারাগার, রোগের দুর্বিষহ যন্ত্রণা আর পরিশেষে মৃত্যু।"

"আমি তা জানি, সব জেনেই আমি প্রস্তুত, সব আঘাতই আমি সইবো।"

"আঘাত শুধু তোমার শত্রুরাই হানবে না, তোমার অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকেও তা আসবে।"

"জানি, তারাও আমায় রেহাই দেবে না···।"

"তুমি কি তোমার আদর্শের জন্য যে কোনও অপরাধ করতে প্রস্তুত ?"

"আমি তার জন্যও তৈরী।"

"তুমি কি জানো—যে আদর্শ আজ তুমি আঁকড়ে ধরলে তার বেলাতেও একদিন মোহভঙ্গ হতে পারে তোমার, বিস্ময়-বেদনার সঙ্গে একদিন তোমার এ রূঢ় উপলব্ধি ঘটতে পারে যে তুমি পথ-ভ্রান্ত হয়েছো, অকারণেই তুমি নষ্ট করেছো তোমার সমস্ত জীবন ?"

"তা-ও আমার অজানা নেই।"

"তা হলে এসো।"

দ্বার অতিক্রম করলো মেয়েটি। তার সামনের দরজাটা খুলে গেল, ভারী পর্দাটা আস্তে আস্তে নেমে এল পিছনে।

দাঁতে দাঁত পিষে ক্ষিপ্তের মতো কেউ চেঁচিয়ে উঠলো—'নির্বোধ'!

শান্ত স্বরে কেউ যেন বললো—'না, দেবদূত।'[১২৫]

চতুর্থ অধ্যায়
টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১। দাদাভাই নৌবজি সম্পর্কে বি· এন গাঙ্গুলীর দাদাভাই নৌরজি. অ্যাণ্ড দ্য ড্রেন থিয়োরী (এশিয়া, ১,৯৬৫) ; বিপান চন্দ্রের দ্য রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ অফ ইকনমিক ন্যাশানালিজম ইন ইণ্ডিয়া (পিপলস পাবলিশিং, নিউদিল্লী, ১৯৬৬) দ্রষ্টব্য। দেশেব কথা-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র একমত হতে পারেননি। ১৩১১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

২। অরবিন্দ, বঙ্কিম-তিলক-দয়ানন্দ (২য় সংস্করণ, ১৯৪৭) পৃঃ ৬৭, প্রথম প্রকাশ, কর্মযোগিন্ (৪ঠা ডিসেঃ, ১৯০৯)

৩। রানাডে ছিলেন ক্যাপিটালিষ্ট ফার্মিং এর পক্ষে (এসেজ অন ইণ্ডিয়ান ইকনমিকস, পৃঃ ২৮৭), আর সুরেন্দ্রনাথ-রায়তদের ('বেঙ্গলী,' ১৫ই জানুয়ারী ও ২রা এপ্রিল, ১৮৮১, ২২শে ডিসেঃ, ১৮৮৪; স্পীচেস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭)

৪। বিপিন চন্দ্র, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৭৪৪-৪৫

৫। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৯২, গোখলের বক্তৃতা, ৯ ফেব্রু, ১৯০৭

৬। লাজপৎ রায়, 'দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট', ইণ্ডিয়ান রিভিয়ু, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩-৩৬। "আমার মতে সরকারের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের পক্ষে এটাই (বয়কট) সবচেয়ে কার্যকর উপায়, আর ইংলণ্ডেও এর প্রতিক্রিয়া হবে গভীর"। 'আওয়ার স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম : হাউ টু ক্যারি ইট অন', হিন্দুস্তান রিভিয়ু অ্যাণ্ড কায়স্থ সমাচার', ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬।

৭। রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃঃ ২২৭, এবং একাল আর সেকাল, (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৪) ; শিবনাথ শাস্ত্রী, মেন আই হ্যাভ সীন, (কলকাতা, ১৯১৯), পৃঃ ১৯৯-২০০। রাজনারায়ণ ছিলেন অরবিন্দের মাতামহ।

৮। 'মুখার্জিজ ম্যাগাজিন,' ২য়-৫ম খণ্ড, উদ্ধৃতি—৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২

৯। ভবতোষ দত্ত, দ্য এভল্যুশন অফ ইকনমিক থিঙ্কিং ইন ইণ্ডিয়া, (১৯৬২), পৃঃ ১৩-১৮

১০। আয়ার্ল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্ আন্দোলনের সঙ্গে এর আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য বোঝা যাবে, আর্থার গ্রিফিথ-এর 'দ্য সিনফিন পলিসি', পৃঃ ৭, ২০ পড়লে।

১১। হোম পাব্(এ) প্রোসিডিংস, জুন, ১৯০৬, নং ১৭৭ ; ঐ অক্টো, ১৯০৭, নং ৫০-৬০

১২। বিপিনচন্দ্র পাল, 'বয়কট', স্বদেশী অ্যাণ্ড স্বরাজ, পৃঃ ২১৯

১৩। ঐ, পৃঃ ২৩৪-৩৫

১৪। ঐ পৃঃ ২৩৬-৭৭, রবীন্দ্রনাথ 'রাজকুটুম্বদ : 'এখন ম্যাঞ্চেষ্টার রাজা, বার্মিংহাম রাজা, নীলকর রাজা, চা-কর রাজা, চেম্বার অফ কমার্স রাজা' বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

১৫। বিপিনচন্দ্র পাল, স্বদেশী অ্যাণ্ড স্বরাজ, পৃঃ ২৪১

১৬। রবীন্দ্রনাথ, 'স্বদেশী সমাজ' (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১১)

১৭। ঐ, 'সমস্যা' (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৫), 'সদুপায়' (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৫)

১৮। ঐ, 'পথ ও পাথেয়' (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫), 'সদুপায়' (পৃঃ উঃ) ঘরে বাইরে (সবুজপত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত, ১৩২২)

১৯। ঐ, 'সমস্যা' (পৃঃ উঃ), 'ব্যাধি ও তাহাব প্রতিকার' (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৪)

২০। ঐ, 'অপমানের প্রতিকার' (সাধনা, ভাদ্র, ১৩০১

২১। ঐ, 'পথ ও পাথেয়' (পৃঃ উঃ)

২২। তদেব

২৩। অরবিন্দ, 'বন্দেমাতরম' ৩০শে জুলাই, ১৯০৭। রবীন্দ্রনাথের আত্মসমীক্ষা ও বিশ্বমানবতাবাদের সমালোচনা করেছিলেন বিপিনচন্দ্র, বঙ্গ দর্শনে (চৈত্র, ১৩২২ ও আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩১৩) এবং

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রবাসীতে (আশ্বিন, ১৩১৪)। 'স্বদেশী' নিয়ে বাড়াবাড়ির জন্য অরবিন্দ আবার উদারনৈতিক মতাবলম্বীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলেন।

২৪। অরবিন্দ, 'বন্দেমাতরম', ৬ই অগষ্ট, ১৯০৭

২৫। ঐ, ঐ, ১৮ই সেপ্টে, ১৯০৭

২৬। ঐ, ঐ, ৭ই অগষ্ট, ১৯০৭

২৭। 'রাজনীতির ক্ষেত্রে সন্তসুলভ সহিষ্ণুতা জোর করে প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়াব অর্থ 'বর্ণ সঙ্কর'কে প্রশ্রয়দান (দায়িত্বপালনে বিশৃঙ্খলা)'। ১৯০৫-এর ৩০শে অগষ্ট অরবিন্দ ব্রহ্মতেজের গুণগান করেছিলেন, তারপর থেকে তাঁর কথার সুর যথেষ্ট পরিমাণে পাল্টে যায়।

২৮। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বিষয়ে অরবিন্দের যে বচনাগুলি 'বন্দেমাতরমে' প্রকাশিত হয় (১১-২৩শে এপ্রিল, ১৯০৭) সেগুলিই পরে গ্রন্থাকারে দ্য ডক্‌ট্রিন অফ প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স নামে প্রকাশ করা হয়েছিল (১৯৪৮)। এ সম্পর্কে সরকারী প্রতিক্রিয়ার খবর পাওয়া যাবে ভারত সরকার, হোম (পল, ডিপোজিট) প্রোসিডিংস, জুলাই. ১৯০৭, নং ৩

২৯। আব· ন্যাথান, নোট অন স্বদেশবান্ধব সমিতি, হোম· পল প্রোসিডিংস ডিপোজিট, এপ্রিল, ১৯০৯, নং ২, ২৬ ; হিউজেস বুলার, মেমো অন অশ্বিনীকুমাব দত্ত, ২০শে জুন, ১৯০৭, তদেব, এনক্লোজার II.

৩০। সাপ্লিমেন্টারী রিপোর্ট অন সমিতিজ ইন দ্য বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট, পৃঃ ১২-১৩ হোম পল প্রোসিডিংস ডিপোজিট, জুলাই, ১৯০৯, নং ১৩

৩১। মেমো অন ন্যাশানাল ভলান্টিয়ার মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম, ১১ই সেপ্টে, ১৯০৭, হোম পল প্রোসিডিংস ডিপোজিট, অক্টো, ১৯০৭, নং ১৯, অ্যাপেনডিক্স বি।

৩২। আর· ন্যাথান, নোট অন দ্য ব্রতী সমিতি, ১৪ই ডিসেঃ, ১৯০৮, রিপোর্ট অন দ্য সমিতিজ ইন দ্য ঢাকা ডিভিসন, পার্ট IV, পৃঃ ১২৯-৩১, হোম পল প্রোসিডিংস ডিপোজিট, এপ্রিল, ১৯০৯, নং ২

৩৩। আর· ন্যাথান ; নোট অন সুহৃদ সমিতি অ্যাণ্ড সাধনা সমাজ, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯০৮, তদেব, পার্ট III

৩৪। বি· সি· অ্যালেন, রিপোর্ট অন দ্য অনুশীলন সমিতি, ২১শে সেপ্টে, ১৯০৭, হোম পল, ফেব্রু, ১৯০৮, নং ৭০-৭১এ ; এইচ· এল· সল্‌কেল্‌ড,ঐ, ১০ই ডিসেঃ, ১৯০৮, হোম পল, অগষ্ট, ১৯০৯, ২১ নং ডিপোজিট।

৩৫। বিভাগীয় কমিশনার ন্যাথানের রিপোর্ট, ২১শে এপ্রিল, ১৯০৭, এবং তার উপর রিজলের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। "If the volunteers did get hammered, they have themselves to thank." হোম মেম্বার অ্যাডামসন অবশ্যই খুশী হননি ; তাঁর মন্তব্য, "The usual story from E B Nothing is done to prevent rioting, but there is a police investigation afterwards which ends in smoke."

৩৬। এই প্রসঙ্গে সুমিত সরকার, দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৩-১৯০৮ (দিল্লী, ১৯৭২) দ্রষ্টব্য

৩৭। 'দ্য টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' ২৮শে সেপ্টে, ১৯০৬ , দ্য ইণ্ডিয়া জুটমিলস, শ্রীরামপুর ঐ মাসেই ধর্মঘট আরম্ভ করে।

৩৮। তদেব, ১লা সেপ্টে, ১৯০৬

৩৯। রীজনার ও গোল্ডবার্গ (সম্পাদিত), তিলক অ্যাণ্ড দ্য স্ট্রাগল ফর ইন্ডিয়ান ফ্রীডম গ্রন্থে উল্লিখিত, (পিপ্‌লস্ পাবঃ হাঃ, ১৯৬৬), পৃঃ ২৭৯

৪০। 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭

৪১। ভি· চিরল, ইণ্ডিয়ান আনরেষ্ট, পৃঃ ৫৩

৪২। এ· আই· চিচেরভ (A. I. Chicherov), 'তিলকস্ ট্রায়াল অ্যাণ্ড দ্য বম্বে পলিটিক্যাল স্ট্রাইক অফ নাইন্টিন হান্ড্রেড এইট', রীজনার অ্যাণ্ড গোল্ডবার্গ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৫৪৫-৬২৬

৪৩। অরবিন্দ, 'হোয়াই দিস ক্রাই ফর ফ্রীডম', বন্দেমাতরম, ৭ই সেপ্টে, ১৯০৭

৪৪। ঐ, 'গ্রাডুয়েটেড বয়কট', বন্দেমাতরম, ২৬শে এপ্রিল, ১৯০৭

৪৫। সুরেন্দ্রনাথ, পৃঃ উঃ, একাদশ অধ্যায়। এ জাতীয় ঘটনার বিশদ বিবরণের জন্য ১৩১৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যার প্রবাসী দ্রষ্টব্য। বোম্বাইতে ৬০টি কাপড়ের মিল রেজিস্ট্রীকৃত হয়েছিল, বাংলায় দু'টি (বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল এবং মোহিনী মিলস)। কয়েকজন ধনী জমিদার বস্ত্র-বয়ণ শিক্ষাদানের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটা ফাণ্ড গড়ে তোলেন। বাংলায় যদিও আরও বেশী সংখ্যায় কটন মিল প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হয়নি, ব্যাঙ্কিং-এর প্রতি কিছু জমিদার ও ব্যবসায়ী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ৫০ লক্ষ টাকা (অনুমোদিত) মূলধন নিয়ে দ্য বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ও ২ কোটি টাকা নিয়ে দ্য কোঅপরারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। একই সূত্র থেকে কোঅপারেটিভ স্টীম

নেভিগেশন লিঃ, দ্য ইস্টার্ন বেঙ্গল্ মহাজন ফ্লোটিলা কোঃ লিঃ, দ্য ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোঃ লিঃ এবং হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইনস্যুরেন্স—এর মূলধন সংগৃহীত হয়েছিল। এই সংস্থাগুলির পরিচালকদের মধ্যে মৈমনসিং-এর মহারাজা সূর্যকান্ত, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, উত্তরপাড়ার রাজা পিয়ারীচরণ মুখার্জি এবং ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়ের অন্তর্ভুক্তি কৌতুহল-উদ্দীপক। সেই তুলনায় এই আন্দোলনের হোতা সুরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আবদুল রসুল এবং আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন স্বল্প বিজ্ঞাপিত। দ্রষ্টব্য . 'বেঙ্গলী', ২, ১৯, ২০শে জানুয়ারী, ১৯০৬; ৩রা, ৪ঠা জানুয়ারী, ১১, ১৪, ২৮শে অক্টো, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯০৮। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন দ্য বেঙ্গল কেমিক্যাল সংগঠনের মূলে। নীলরতন সরকারের আর্থানুকূল্যেই গড়ে ওঠে এ দেশের প্রথম ক্রোম ট্যানারী এবং রাসবিহারী ঘোষ প্রতিষ্ঠা করেন দ্য বন্দেমাতরম ম্যাচ ফ্যাক্টরী। জে· জি· কামিং-এর রিভিউ অফ দ্য ইনডাস্ট্রিয়াল পোজিসন অ্যাণ্ড প্রস্পেক্টস ইন বেঙ্গল ইন ১৯০৮ (১৯০৮) দ্রষ্টব্য

৪৬। এফ· আর· হ্যারিস, জে· এন· টাটা (১৯৫৮) পৃঃ ১৯০

৪৭। 'দ্য ডন', সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, পৃঃ ২০৭-১৩; সেপ্টে ১৮৯৯, পৃঃ ৩৩-৩৬; জানু, ১৯০০, পৃঃ ১৮৮। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসের জন্য হরিদাস ও উমা মুখার্জির দ্য অরিজিনস অফ দ্য ন্যাশানাল এডুকেশন মুভমেন্ট (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭) দ্রষ্টব্য।

৪৮। রবীন্দ্রনাথ, 'শিক্ষার হেরফের', সাধনা, পৌষ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ। 'প্রসঙ্গ কথা', তদেব, চৈত্র, ১২৯৯। ফরাসী ভাষার আধিপত্য হটিয়ে জার্মান ভাষার প্রতিষ্ঠালাভের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ জার্মান জাতীয়তাবাদের উৎস খুঁজেছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বিষয়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত জানা যাবে উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জি (সম্পাদিত) রেমিনিসেন্সেস, স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অফ স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি (কলকাতা, ১৯২৭), ২য় পর্ব, পৃঃ ৮২, ৯১, ৯২, ১১৮। জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে ভিন্ন ধ্যান-ধারণার জন্য, তদেব, পৃঃ ২০৬, ২১০, ২৩২ ও ১ম পর্ব, পৃঃ ২৪৯ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান ও কর্ম (১৯১০) দ্রষ্টব্য।

৪৯। ঐ দিনগুলির বিবরণ উজ্জ্বল হয়ে আছে বিনয় কুমার সরকারের বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ)-এ

৫০। (ক) বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী (অস্থায়ী) আর· ডবল্যু· কার্লাইল-এর সারক্যুলার নং ১৬৭৯, ১০ই অক্টো, ১৯০৫। এর উপর ভিত্তি করে কয়েকটা 'এক্স্ট্রা অর্ডিনারী সার্ক্যুলার' জেলা শাসকেরা মফঃস্বলেব স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এতে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররা অংশ নিলে শাস্তি হিসেবে স্কুল বা কলেজের সরকারী সাহায্য, এমনকি শিক্ষা বিভাগের স্বীকৃতি বাতিল করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯০৫-এর ২১শে অক্টোবরের টি-২৯২ নং চিঠির মাধ্যমে ডি· পি· আই. আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার এই বিজ্ঞপ্তি জারী করেন যে যে সব কলেজের ছাত্র ১৯০৫-এর ৩রা অক্টোবরের বয়কট সংক্রান্ত হাঙ্গামায় জড়িত ছিল তাদের সকলকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। কার্লাইল্ সারক্যুলার-এর প্রথম শিকার হয়েছিল রঙপুর জেলা স্কুলের ছাত্ররা। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় বিধান পরিষদের কার্যাবলী, ১৮ই নভেম্বর, ১৯০৫, পৃঃ ১৯৪-৯৫ দ্রষ্টব্য।

(খ) ১৯০৫-এর ৮ই নভেম্বর, পি· সি· লিয়ন (সদ্যোসৃষ্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী) একটা শিক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এবং 'বন্দেমাতরম বিজ্ঞপ্তি' জারী করেন। প্রথমটা ছিল কার্লাইল সারক্যুলারের সমগোত্রীয়, আর দ্বিতীয়টা ঢাকা ডিভিসনের সর্বত্র প্রকাশ্যে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। দ্রষ্টব্য : স্টেটস্‌ম্যান, ২২শে অক্টো, ১৯০৫ এবং সঞ্জীবনী, ১৬ই নভেম্বর, ১৯০৫। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ, 'শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা', ভাণ্ডার, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, বিশেষ সংস্করণ; রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৫২৩।

(গ) রিজলে সারক্যুলার বেরোয় ৬ই মে, ১৯০৭। এটা ছিল উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত ; উদ্দেশ্য একই।

৫১। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কলেজটিকে (রিপন কলেজ) কখনোই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে নিয়ে যাননি। এ জন্য বিপিনচন্দ্র পাল 'ফিল্ড অ্যাণ্ড একাডেমী ক্লাব'-এ এক বক্তৃতায় তাঁর সমালোচনা করেন। অরবিন্দও 'বন্দেমাতরমে' (২৮শে মে, ১৯০৭) এর নিন্দা করেছিলেন।

৫২। বিপিনচন্দ্র পাল, স্বদেশী অ্যাণ্ড স্বরাজ, পৃঃ ২৬৩·

৫৩। অরবিন্দ, 'বন্দেমাতরম' (সাপ্তাহিক), ১২ই এপ্রিল, ১৯০৮

৫৪। ঐ, 'দ্য বেড-রক অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম,—১', 'বন্দেমাতরম' (সাপ্তাহিক), ১৪ই জুন, ১৯০৮

৫৫। 'মারাঠা,' ৩০শে মে, ১৯০৭
৫৬। রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ
৫৭। 'কেশরী,' ২৭ সংখ্যা, ১লা জানুয়ারী, ১৯০৭
৫৮। তিলক, 'দ্য টেনেটস্ অফ দ্য নিউ পার্টি', কলকাতা ভাষণ, ২রা জানু, ১৯০৭, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ১০১০ ; 'কেশরী,' ২২শে জানু, ১৯০৭
৫৯। ঐ, 'আওয়ার প্রেজেন্ট সিচুয়েশন', এলাহাবাদ-বক্তৃতা, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯০৭, পূঃ উঃ ট্র্যাক্ট ১০১০
৬০। হেনরী নেভিনসন, দ্য নিউ স্পিরিট ইন ইণ্ডিয়া (লণ্ডন, ১৯০৮), পৃঃ ৭২-৭৫
৬১। বিপিনচন্দ্র পাল 'দ্য নিউ মুভমেন্ট', 'দ্য গস্‌পেল অফ স্বরাজ', 'স্বরাজ : ইট্‌স ওয়েজ অ্যাণ্ড মীনস', (মাদ্রাজ বক্তৃতা), স্বদেশী অ্যাণ্ড স্বরাজ, পৃঃ ১১৭-২১৮
৬২। ভি· চিরল-এর উদ্ধৃতি, ইণ্ডিয়ান আনরেষ্ট, পৃঃ ১৩
৬৩। অরবিন্দ, দ্য ডকট্রিন অফ প্যাসিভ্ রেজিসট্যান্স, (১৯৫২ সংস্করণ), পৃঃ ১৭
৬৪। ঐ, বন্দেমাতরম; ৩০শে এপ্রিল; ও ২রা মে, ১৯০৭
৬৫। ঐ, দ্য ডকট্রিন অফ প্যাসিভ রেজিসট্যান্স, পূঃ উঃ, পৃঃ ৬৯-৭০
৬৬। ঐ, 'আইডিয়াল্‌স ফেস টু ফেস,' বন্দেমাতরম (সাপ্তাহিক), ৩রা মে, ১৯০৮
৬৭। ঐ, 'ইণ্ডিয়ান রিসারজেন্স অ্যাণ্ড ইউরোপ,' বন্দেমাতরম, ১৪ই এপ্রিল, ১৯০৮। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং জঙ্গী-জাতীয়তাবাদ বর্জনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দের বক্তব্যের জন্য এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। বিপিনচন্দ্র পাল, ন্যাশানালিটি অ্যাণ্ড এম্পায়ার, ২য় অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা', বঙ্গদর্শন, ১৩০৮-৯ বঙ্গাব্দ এবং Nationalism
৬৮। অরবিন্দ, 'বন্দেমাতরম,' ১১ই মে, ১৯০৭
৬৯। নেভিনসন, পূঃ উঃ,পৃঃ ২২৬। চিরলের বিচারে তিলকই ছিলেন সব নষ্টের গোড়া, অরবিন্দ সুবাধ্য ও সুদক্ষ চেলামাত্র।
৭০। 'সোনার বাংলা' নামক পুস্তিকা (রচনা : সত্যেন বসু ও ক্ষুদিরাম বসু) নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ তাঁদের গভীর মতানৈক্যই সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিল। বিপিনচন্দ্র, 'দ্য গোল্ডেন বেঙ্গল স্কেয়ার' নামক প্রবন্ধে (বন্দেমাতরম, ৩রা অক্টো, ১৯০৬) সন্ত্রাসের নীতির নিন্দা করে বন্দেমাতরমের সম্পাদকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেন।
৭১। শ্রীঅরবিন্দ অন হিমসেলফ অ্যাণ্ড অন দ্য মাদার, পৃঃ ৭৮
৭২। ওয়াচা ও গোখলে ছিলেন এর পিছনে। "টুডে লাজপৎ রায়, টু মরো তিলক ! হোয়্যার উইল দ্য কংগ্রেস বি ?" গোখলেকে ওয়াচা, ২১শে জুলাই, ১৯০৬, গোখলে পেপারস, এন· এ· আই। এই প্রচেষ্টা নিন্দিত হয়েছিল 'বন্দেমাতরমে', ১২ই ও ১৪ই সেপ্টে, ১৯০৬
৭৩। লাজপৎ রায়, পঞ্জাব পলিটিক্যাল কনফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণ, 'দ্য পঞ্জাবী'তে পুনঃপ্রকাশিত, ১০ই ও ১৩ই অক্টোবর, ১৯০৬
৭৪। গোখলেকে লাজপৎ রায়, ৪ঠা অক্টো, ১৯০৬, গোখলে পেপারস, পূঃ উঃ
৭৫। শ্রীঅরবিন্দ অন হিমসেলফ্ অ্যাণ্ড অন দ্য মাদার, পৃঃ ৭৬
৭৬। ডানলপ স্মিথের নোট, ১লা জানুয়ারী, ১৯০৭, Eur. Mss D 573, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪-৫। এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায় (ষষ্ঠ) দ্রষ্টব্য
৭৭। যোশী (সম্পাদিত), লাজপৎ রায়, অটোবায়োগ্রাফিক্যাল রাইটিংস পূঃ উঃ, পৃঃ ১১২ ও পরবর্তী
৭৮। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরানী-র সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। এর সঙ্গে রাশিয়াতে লেনিন বুর্জোয়াদের সম্পত্তিচ্যুত করার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং মারটভ ও মেনশেভিকরা যার তীব্র নিন্দা করেন—তার সাদৃশ্য বিস্ময়কর। যে সব বিত্তশালী উদারনৈতিক ও জমিদারকুলের সেরা রত্নগুলি অরবিন্দ-গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁদের কি অর্থকৃচ্ছ্রতা দেখা দিয়েছিল ? এঁদের বিপ্লব-প্রীতি কি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল ? অথবা তাঁরা সরকারের ভয়ে বা জবরদস্তিতেই কি আর্থিক সাহায্য দান বন্ধ করেছিলেন ? মারটভের মতো বিপিনচন্দ্রও স্বদেশী ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতিকে অনৈতিক কর্ম, এবং একটা আদর্শবাদী আন্দোলনের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে মনে করতেন। তাঁর এই বিশ্বাস তিনি প্রকাশ করতে দ্বিধান্বিত হননি যে এই ধরনের কাজকর্মের ফলে দেশের উদারনৈতিক ও গণতন্ত্রপ্রেমিক মানুষ বিরক্ত ও বিরূপ হয়ে উঠবেন।
৭৯। 'কেশরী', ২৬ খণ্ড, ৫, পৃঃ ৪
৮০। হেমচন্দ্র কানুনগো, বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা (১৯২৮), পৃঃ ১১৮-৪৮, ১৫৬-৫৯। ভূপাল বসুকে

(অরবিন্দের শ্বশুর) অরবিন্দের চিঠি, ৮ই জুন, ১৯০৬। 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত বহু রাজদ্রোহমূলক রচনা অনুবাদ করে 'বন্দেমাতরম'-এ ছাপা হতো। যুগান্তরে প্রকাশিত এই ধরনের কিছু রচনার নমুনা চিরল-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে ; চিরল, পূঃ উঃ, পৃঃ ৯১-৯৬। 'দ্য রিপোর্ট অফ দ্য সিডিশন কমিটি', পৃঃ ১৬-১৭। উমা ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান (কলকাতা, ১৯৭২)

৮১। যোশী (সম্পাঃ) লাজপৎ রায়, অটোবায়োগ্রাফিক্যাল রাইটিংস, পূঃ উঃ,পৃঃ ১২৩-৬২। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮২। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূঃ উঃ, পৃঃ ২৩৫।

৮৩। গোখ্লেকে সুরেন্দ্রনাথ, ১২ই ডিসেঃ, ১৯০৭,

৮৪। গোখ্লেকে লাজপৎ রায়, নং ২৯৬, ২২, ঐ

৮৫। 'বন্দেমাতরম', ২০শে ডিসেঃ, ১৯০৭

৮৬। গোখ্লেকে ওয়াচা, ২৭শে সেপ্টেঃ, ১৯০৭, গোখ্লে পেপার্স, পূঃ উঃ

৮৭। ওয়াচাকে অ্যালফ্রেড নন্দী, ১১ই অক্টো, ১৯০৭, ঐ

৮৮। গোখলেকে ওয়াচা, ৯ই অক্টো, ১৯০৭, ঐ

৮৯। ঐ, ১৪ই নভেম্বর, ১৯০৭, ঐ

৯০। তিলক দেখেছিলেন তাঁর দলের প্রতিনিধি সংখ্যা ৬০০-র মতো। কৃষ্ণ বর্মাকে তিলক, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮। শ্রীঅরবিন্দ অন হিমসেলফ অ্যাণ্ড অন দ্য মাদার, পৃঃ ৮১। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী ('ধরপাকড়ের যুগ') ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়। অরবিন্দ নিজেই লিখেছেন ঐ অধিবেশনে নরমপন্থী প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল ১৩০০ এবং চরমপন্থীরা সংখ্যায় ছিলেন ১১০০। সুতরাং ভোটাভুটি হলে চরমপন্থীদের সুবিধে হতো না। তাঁর মতে নরমপন্থীরা ছলেবলে কৌশলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন এবং সেজন্য তাঁদেরও পূর্ণ অধিকার ছিল ন্যায়-অন্যায় যে কোনও উপায়ে তার প্রতিবিধান করার। পান্তির মাঠে অরবিন্দের ভাষণ, ১০ই এপ্রিল, ১৯০৮।

৯১। রীজনার অ্যাণ্ড গোল্ডবার্গ, পূঃ উঃ পৃঃ ২৯৫-৯৬। প্রস্তাবগুলির মধ্যে কিছু শব্দের অদলবদল হলেই তিলক সন্তুষ্ট হতেন। গোখ্লে যখন সংশোধিত প্রস্তাবগুলি তাঁর হাতে দেন তখন আর আলাপ আলোচনার সময় ছিল না।

৯২। নেভিনসন, দ্য নিউ স্পিরিট ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ২৪৭-৫৮ ; সুরাট কংগ্রেস সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : এম· আর· জয়াকর, দ্য স্টোরী অফ মাই লাইফ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮-৮৪ ; ইঃ অঃ লাইঃ ট্র্যাক্ট ১০৪২ ; পান্তির মাঠে অরবিন্দের বক্তৃতা, ১০ই এপ্রিল, ১৯০৮ ; অম্বিকাচরণ মজুমদার, ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল এভল্যুশন, (নটেশান, ১৯১৯) পৃঃ ১০৪-১৩-। গোখ্লের উত্তরের জন্য সংবাদপত্র সম্পাদকের প্রতি গোখ্লে, ৮ই জানুয়ারী, ১৯০৮, গোখ্লে পেপার্স, দ্রষ্টব্য।

৯৩। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, পূঃ উঃ, পৃঃ ২২। সুরাটের ঘটনার জন্য দায়ী উভয় পক্ষই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিলেন তাঁর 'যজ্ঞ-ভঙ্গ' নামক রচনায়। "মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী—এই উভয় দলই কংগ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইঁহারা যদি নিজেদের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্র মনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন…এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে, দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কংগ্রেস সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না, কংগ্রেসে হার হইলেও দেশের মধ্যে হার হয় না…।"

৯৪। অল ইণ্ডিয়া স্বদেশী কনফারেন্স-এর সভাপতিরূপে লাজপৎ রায়ের ভাষণ, ডিসেঃ, ১৯০৭, 'সুরাট কংগ্রেস অ্যাণ্ড কনফারেন্স' থেকে পুনর্মুদ্রিত, ১৯০৭।

৯৫। নরমপন্থীদের কংগ্রেস কনভেনশন কমিটি লক্ষ্যরূপে 'স্বরাজ' শব্দটি বর্জন করেন, জোর দেন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের উপর। অশ্বিনীকুমার দত্ত এই অঙ্গীকার মেনে নিয়েছিলেন। 'বেঙ্গলী', ১৮ই জানুয়ারী, ১৯০৮

৯৬। খাপার্ডে এক সার্ক্যুলারে চেয়েছিলেন "সকলের পক্ষে সমান সম্মানজনক এক বোঝাপড়া।"

৯৭। বারীন্দ্রের মতে অরবিন্দের যোগগুরু লেলে এধরনের বাণীবিষয়ে তাঁকে সতর্ক করে দেন, সন্ত্রাস থেকে বিরত হবারও উপদেশ দেন, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, পূঃ উঃ, পৃঃ ৩৮-৪৩ ; উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বাসিতের আত্মকথা, পৃঃ ২৮-৩০ ; হেমচন্দ্র কানুনগো, পূঃ উঃ, পৃঃ ২৪৭ ও পরবর্তী।

৯৮। অরবিন্দ, 'দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন', বোম্বাই-এ ভাষণ, ১৯শে জানু, ১৯০৮ ; শ্রীঅরবিন্দ অন

হিমসেলফ্ ইত্যাদি ও দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১০৮

৯৯। অরবিন্দ, 'নিউ কনডিশনস', বন্দেমাতরম, ২৯শে এপ্রিল, ১৯০৮ (মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের আগের দিন)

১০০। তদেব, ২৩শে এপ্রিল, ১৯০৮

১০১। জে· সি· কে-র মেমোরেণ্ডাম, হোম পল (এ) প্রোসিডিংস, মে, ১৯০৮, নং ১১২-১৫০।

১০২। এই আধা-প্রহসনের বিবরণ আছে বারীন্দ্রকুমারের গ্রন্থে, পৃঃ উঃ, নবম ও একাদশ অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের মতামত জানা যায় নির্ঝরিণী সরকারকে লেখা তাঁর চিঠিতে, ২৩শে বৈশাখ ও ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, এবং 'পথ ও পাথেয়'তে, পৃঃ উঃ

১০৩। অ্যাপেণ্ডিক্স এ· হোম··পল (এ) প্রোসিডিংস, মে, ১৯০৮, নং ১১২-১৫০

১০৪। মর্লেকে মিন্টোর চিঠি, ৬ই মে, ১৯০৮, Eur.MSS D 573, ১৪ খণ্ড, পৃঃ ৪৫ ; এ· ফ্রেজারের গোপন রিপোর্ট, ১৯শে মে, ১৯০৮

১০৫। 'কেশরী', ১২ই মে ও ৯ জুন, ১৯০৮

১০৬। মিন্টোকে বেকার, ১৯শে এপ্রিল, ১৯১০ ; মিন্টোকে মর্লে, ৫ই মে, ১৯১০ ; মর্লেকে মিন্টো ; ২৬শে মে, ১৯১০

১০৭। সেন্ট পিটারস্‌বার্গের গভর্নর জেনারেল ত্রেপভ্ ভেরা জাসুলিচ-এর এক সহপাঠীকে বেত্রাঘাতের দণ্ড দিয়েছিলেন। এই অপরাধে ভেরা ত্রেপভ্‌কে গুলি করেন। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ঘটনার সঙ্গে উল্লিখিত ভারতীয় ঘটনাটির সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

১০৮। অরবিন্দ, *এসেজ অন দ্য গীতা* প্রবন্ধমালার ১ম অংশ, পৃঃ ৪৬ ও পরবর্তী। ১৯০৮-১০-এর পরে রচিত এই প্রবন্ধগুলিতে ঐ সময়কার কিছু ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ, এমন কি সমর্থনেরও আভাস পাওয়া যায়।

১০৯। 'কেশরী', ১৫ই জুন, ১৮৯৭।

১১০। পরিশিষ্ট, রাজাপ্রজা। সন্ত্রাসবাদকে বাববার নিন্দা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মানুষের সৃজনশীলতা এবং চারিত্রিক সংহতির উপর এধবনের কার্যাবলীর অশুভ প্রভাব তাঁকে শঙ্কিত করেছিল। ঘরে বাইরে এবং চার অধ্যায়—উপন্যাস দুটিতে এ সম্পর্কে কবির বিরূপতা অতি স্পষ্ট। রাশিয়াতে অনুরূপ পরিস্থিতিতে টলষ্টয়ও সন্ত্রাসবাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ডস্টয়েভস্কি নেচায়েভকে নিন্দা করেছিলেন The Possessed উপন্যাসে। পক্ষান্তরে মার্কস্ অথবা এঙ্গেলস্—কেউই নারোদনিক-সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার নিন্দা করেননি এবং মেনশেভিকদের বিরূপতা সত্ত্বেও লেনিন সন্ত্রাসবাদকে পুরোপুরি বর্জনযোগ্য বলে ঘোষণা কবতে রাজী হননি। স্বয়ং স্টালিন একজন সন্ত্রাসবাদী নেতারূপে পরিচিত ছিলেন এবং 'কোবা' এই ছদ্মনামে তাঁকে এক সময স‌ক্রিয় হয়ে উঠতেও দেখা গিয়েছিল।

১১১। নিম্নে প্রদত্ত সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের পরিসংখ্যান তুলনীয় :

বছর	বোমা নিক্ষেপ	হত্যা	ডাকাতি	অন্যান্য ঘটনা
১৯০৭	—	১	৩	৩ ট্রেন ধ্বংস
১৯০৮	৬	৯	৮	—
১৯০৯	১	২	১০	১ অস্ত্রশস্ত্র লুঠ
১৯১০	—	১	৭	১

রমেশচন্দ্র মজুমদার, হিস্ট্রী অফ ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, ২য় খণ্ড (১৯৬৩) পৃঃ ৪৯ ; 'দ্য সিডিশন কমিটি রিপোর্ট,' ১৯১৮। নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট 'গ' দ্রষ্টব্য।

১১২। হোম পাব্ প্রোসিডিংস, ডিপোজিট, ডিসেঃ, ১৯০৬, নং ৩৮ দ্রষ্টব্য।

১১৩। জি· এস· খাপার্ডের ডায়েরী, পৃঃ উঃ, ১২ই জুন, ও ২৩শে ডিসেঃ, ১৯০৬

১১৪। গৌরীপুর জমিদারীর কাণ্ডকারখানার জন্য হোম পাব্ প্রোসিডিংস (এ) ফেব্রু, ১৯০৮, নং ১০২-৩ দ্রষ্টব্য ; হোম পুলিশ ফাইল নং এ ১৪০-৪৮, বি, ১১২-১৪, মে, ১৯০৬ দ্রষ্টব্য।

১১৫। রীজনার অ্যাণ্ড গোল্ডবার্গ সম্পাদিত গ্রন্থে (পৃঃ উঃ) ই· এন· কোমারভ, এ· জে· লেভ্‌কোভ্‌স্কি এবং এ· আই· চিচেরভ—এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এ ছাড়া রীজনার-কৃত সার-সংক্ষেপটিও মূল্যবান ; তদেব, পৃঃ ৬৫৯-৬১

১১৬। ১১ সেপ্টেঃ, ১৯০৭, হোম· পল· অক্টো, ১৯০৭, ১৯ নং ডিপোজিট

১১৭। ম্যাকওয়ার্থ ইয়াং-এর মেমো, ২রা জানুয়ারী, ১৯০৫, পঞ্জাব ফিনান্সিয়াল কনসালটেশনস্, ফাইল ৪৪১/১০৪ এ কিপ উইথ।

১১৮। ফর্টনাইট্‌লি রিপোর্ট, ই· বি· অ্যাণ্ড আসাম, নং ১৩৩ টি,২৩ নভেঃ, ১৯০৬; হোম পাব্ প্রোসিডিংস (এ) ডিসেম্বর, ১৯০৬, নং ৩১১, এবং ঐ নং ৩৫৯ সি, ১২ই অগষ্ট, ১৯০৭; হোম পল প্রোসিডিংস (এ) সেপ্টেঃ, ১৯০৭, নং ৪৪

১১৯। আর· সি· ক্রাডক, মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার-এর পত্র গভর্নর জেনারেলের একান্ত সচিবকে, ২৭শে নভেম্বর, ১৯০৭, এবং গভর্নর জেনারেলকে, ১৭ই জুন, ১৯০৮, Eur. MSS D 573, ১৬ খণ্ড, পৃঃ ৪৫-৪৮। সিপাহীদের অতি অল্প বেতনের কথা স্মরণ রাখা উচিত। রাজদ্রোহ-মূলক পুস্তিকার একটাতে এভাবে আবেদন জানানো হয়েছিল: "হে ভারতীয় সিপাহীবৃন্দ, তোমাদের জীবনের মোট দাম হচ্ছে ৯ টাকা, আর ঐ দামে ইউরোপে একটা গাধা কেনা যায়।" সংযোজন 'ক', মিন্টোর চিঠি মর্লেকে, ২২শে জানু, ১৯০৮। বাংলার পরিস্থিতি জানার জন্য দ্রষ্টব্য : অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ বেঙ্গল আণ্ডার অ্যানড্রু ফ্রেজার, ১৯০৩-৮, পৃঃ ৩০

১২০। চিরল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২২৭

১২১। পরিসংখ্যান সারণী 'খ' দ্রষ্টব্য।

১২২। বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্যর জগদীশ বসুর প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছিল তা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। 'বোস-ওয়ার' নামে পরিচিত এই ঘটনাই নিবেদিতার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বিবেকানন্দের সঙ্গে একদা যিনি ইংলণ্ড নিয়ে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তিনিই কিছু পরে ক্ষুব্ধ হয়ে স্বীকার করেছিলেন,"ইংলণ্ড, অথবা তার মধ্যে যা কিছু মহৎ বস্তু ছিল, মনে হয়, সবই নষ্ট হয়ে গেছে।" রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র', ৬ষ্ঠ খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৫৭) এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

১২৩। চিরল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২১৬-১৮

১২৪। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের Nationalism দ্রষ্টব্য।

১২৫। ইভান তুর্গেনেভ, 'দ্য থ্রেশোল্ড।'

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠা

চরমপন্থী নেতারা (এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে ১৮৯২ থেকে ১৯০৬ সালের কাল-সীমার মধ্যে চরমপন্থার পরিধির কিছুটা ভিতরে আসতে দেখা গিয়েছিল) ভারতবর্ষের ইতিহাসকে এক সুনিবিড় ঐক্যবোধের উন্মীলন বলে মনে করতেন। ইংরেজ আমলা এবং তাঁদের অনুগ্রহ-পুষ্ট মুসলমান নেতারা কিন্তু এদেশের অন্তর্লীন বিভেদের ধুয়ো ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলছিলেন। ১৮৬১-র ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস বিল-এর উপর বিতর্কের সময় স্যর চার্লস উড্ খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন যে "আইন প্রণয়নের সময় আমাদের একটা নয়, বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি এবং আচার-আচরণে বিভক্ত কয়েকটা জাতির কথা মনে রাখতে হবে।" ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব অব্যাহত রাখার প্রধান অজুহাত হিসেবেই তিনি উক্ত তথ্য ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে কলভিন এবং হান্টারের মতো প্রশাসক এই অজুহাতটাকেই ফাঁপিয়ে তুলে মুসলমানদের প্রতি সুবিচারের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। আর এঁদেরই সুরে সুর মিলিয়েছিলেন স্যর সৈয়দ আহমদ খাঁর মতো মুসলমান নেতারা। গভর্নর জেনারেলের পরিষদে 'মধ্যপ্রদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিল' নিয়ে আলোচনার সময় স্যর সৈয়দ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাকে উড-এর ভাষণের প্রতিধ্বনি বললে কিছু অন্যায় হবে না।[১] মীরাটে-প্রদত্ত অপর একটি বক্তৃতায় তিনিই দ্বি-জাতি তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন এবং ভারতবর্ষের শান্তি ও প্রগতির খাতিরে এদেশে ইংরেজদের আরো বহুকাল—এমন কি অনন্তকাল—থাকার জন্য প্রার্থনা জানান।[২] ১৮৮৮-র অক্টোবরে প্রাদেশিক পরিষদগুলির জন্য লর্ড ডাফরিন যে কমিটি তৈরী করেছিলেন তার মধ্যেও এই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ব্যাপারটাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল "অতি স্পষ্ট" এবং তা নিয়ন্ত্রণের জন্য মনোনীত সদস্য-পদ সৃষ্টির ক্ষমতা যথাযথ ব্যবহারের সুপারিশ করেছিলেন লর্ড ডাফরিন। ভারতবর্ষের মূঢ়, মূক জনগণের, বিশেষ করে অসংখ্য বিচিত্র সংস্কৃতিসম্পন্ন,জাতি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের যে দাবী কংগ্রেস করেছিল তা অত্যন্ত রূঢ় ভাবেই নস্যাৎ করে দেন ডাফরিন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এ জন্যই তাঁর মিনিটে তিনি মন্তব্য করেন যে "এই রকম একটা প্রতিষ্ঠানের হাতে ভারত সরকারের দায়-দায়িত্ব আংশিক বা সামগ্রিকভাবে হস্তান্তরিত করার অর্থ হবে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে, বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র জাতিকে এবং শতশত ভিন্ন স্বার্থের লোককে এমন কিছু মানুষের কর্তৃত্বাধীনে ফেলে দেওয়া যাদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা 'আনুবীক্ষণিক' বলে বর্ণিত হতে পারে। এখনই মনে হচ্ছে মুসলমানরা প্রতিদ্বন্দ্বী ও দুর্বলতর অপর একটা জাতির আধিপত্য স্থাপনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।" ইংরেজ আমলাদের মুখে অহরহ এ জাতীয় কথাবার্তা শোনা যেতো যে ভারতীয় সমাজের বহুবিচিত্র উপাদানগুলির মধ্যে একটা ভারসাম্য স্থাপনের জন্য পরাক্রান্ত ও নিরপেক্ষ এক বৈদেশিক শক্তির উপস্থিতি অনিবার্য,

এমন কি কাম্য।[৩] এই ধুয়োটা বিলেতের ইণ্ডিয়া অফিস বেশ ভালোভাবেই ধরতে পেরেছিল। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট-এর সংশোধনী প্রস্তাবের (যেটি পরবর্তীকালে লর্ড ক্রশ-এর অ্যাক্ট, ১৮৯২, নামে পরিচিত হয়) উপর ভাষণ দেওয়ার সময় লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির জন্য তাঁর গভীর উদ্বেগ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং প্রস্তাবিত আইন পরিষদে তাদের সকলের স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিতেও তিনি পিছপা হননি। লর্ড ক্রশ-এর অ্যাক্টই ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতির প্রবর্তন করে। এই ব্যবস্থার ফলে যাঁরা কাউন্সিলর নিযুক্ত হবেন তাঁরা সংখ্যা বা অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব না করে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবেন বলে লর্ড ল্যান্সডাউনও গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।[৪] রিজলে ১৯০১-এর আদমসুমারিতে ভারতীয় সমাজের বহুমুখিতা মোটা দাগে এঁকে দেন এবং সাবধান করে দেন যে কোনও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করলে উচ্চতর শ্রেণীদের আধিপত্যই স্থাপিত হবে। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্ম-গোষ্ঠীর জন্য আলাদা প্রতিনিধিত্ব সুপারিশ করেন।[৫]

ভাইসরয়ের পদ অলঙ্কৃত করে লর্ড কার্জন যে এই শেখানো-মন্ত্রই আওড়াবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। প্রশাসনিক উন্নতি বিধানের জন্য রচিত বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা ইংরেজ আমলাদের হাতে বাঙালী বিদ্বেষে অনুরঞ্জিত হয়ে চরমপন্থী দমনের এবং শেষ পর্যন্ত,সাম্প্রদায়িক ভেদ প্রখরতর করার একটা অসৎ উপায়ে পরিণত হয়। বঙ্গ-ভঙ্গ ইংরেজ সরকারের হাতে দু'পাশে শাণ-দেওয়া একটা অস্ত্র হয়ে ওঠে। আমলারা ভেবেছিলেন মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠতার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করে নতুন একটা প্রদেশ গঠন করতে পারলে চরমপন্থী এবং সাধারণভাবে বাঙালী হিন্দুরা (যাঁরা চরমপন্থী এবং মডারেট কংগ্রেসের সবচেয়ে তেজী অংশ) নির্বিষ হয়ে যাবে। পূর্ববঙ্গ ও আসামে তারা পরিণত হবে সংখ্যালঘু একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ে, আর বিহার-উড়িষ্যা-যুক্ত পশ্চিম বাংলায় সংখ্যালঘু বাংলাভাষী এক সম্প্রদায়ে। ঢাকায় গড়ে তোলা স্বতন্ত্র একটা প্রশাসন, হাইকোর্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে অনুন্নত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে, আর এই সঙ্গে হিন্দুমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক বনিয়াদটাও সুনিশ্চিতভাবে দুর্বলতর হয়ে যাবে।[৬] ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের মদত-পুষ্ট মুসলমান চাষীরা আর কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক হিন্দু জমিদারদের খাতির করবে না। ইংরেজ আমলারা এই রঙিন কল্পনায় মশগুল হয়েছিলেন যে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ এভাবে একই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেবে আর ব্রিটিশ রাজের জন্য অর্জন করবে মুসলমান সম্প্রদায়ের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হলেও ইত্যবসরে তা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে রেষারেষি ও শত্রুতার বীজ বপন করেছিল। ওয়াহাবী আন্দোলনের সময় থেকে মুসলমানদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবোধ জাগতে আরম্ভ করেছিল এই পরিস্থিতিতে তা প্রবলতর হবার সুযোগ পায়, আর এ ভাবেই বাড়তে থাকে আপন স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের জেদ ও তৎপরতা।

তবে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল উন্মাদনার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই ফাটলটা সাময়িক ভাবে চাপা পড়ে গিয়েছিল। মর্লের 'সেটেল্‌ড্ ফ্যাক্ট'কে 'আনসেট্‌ল' করে দেওয়ার এই সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে আন্তরিকভাবেই হাত মিলিয়েছিলেন মহম্মদ ইউসুফ, লিয়াকৎ হোসেন, আবদুল রসুল ও আবদুল হালিম গজনভির মতো মুসলমান নেতারা। লিয়াকৎ ১৯০৫-এর ৪ঠা অগষ্ট বিলেতী বর্জনের কথা

তোলেন।[৮] তিনি 'অ্যান্টি সার্কিউলার সোসাইটি'র সক্রিয় সদস্যও হন এবং পূর্বভারতীয় রেলের ধর্মঘট সংগঠন করেন। উর্দু ভাষায় লেখা তাঁর পুস্তিকাগুলি মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতো।[৮] ১৯০৫-এর ২৪শে অক্টোবর 'ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমি ক্লাবে' যে শিক্ষা বর্জন আন্দোলনের সভা হয় রসুল তার সভাপতি ছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গের দিন ফেডারেশন হলে যে স্বদেশী জমায়েত হয় তার সভাপতি ছিলেন মহম্মদ ইউসুফ। টাঙ্গাইলের জমিদার ও কলকাতার উকিল আবদুল হালিম গজনভি স্বদেশী শিল্পোদ্যোগ স্থাপনে ও বিলাতী জুতা বর্জনে অগ্রণী ছিলেন।[৯] ১৯০৬-এর ১৩ই মে কলকাতায় আহুত এক জনসভায় বেশ কয়েকজন মুসলমান নেতা বরিশাল কন্‌ফারেন্স ভেঙে দেওয়ার জন্য সরকারী দমননীতির নিন্দা করতেও পিছপা হননি। মিশর, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে মুসলমানদের বৈপ্লবিক কাজকর্মের দৃষ্টান্তে উদ্দীপিত হয়ে বন্দেমাতরমের শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এসেছিলেন আবুল কালাম আজাদ। অরবিন্দের সঙ্গেও তিনি দু-তিনবার সাক্ষাৎ করেন এবং শেষ পর্যন্ত একটা বিপ্লবী সংস্থার সদস্যও হয়েছিলেন। আজাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "এই সময়েই আমি মুসলমানদের মধ্যেও কাজ করতে শুরু করি এবং রাজনৈতিক দায়িত্বপালনে উদ্‌গ্রীব বহু মসুলমান তরুণের সাক্ষাৎ পাই।" আজাদ শুধু মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে বিপ্লবীদের বিরূপ মনোভাব দূর করতেই সহায়তা করেননি, বাংলা ও বিহারের বাইরেও বিপ্লবীদের কাজ-কর্মের পরিধি বিস্তার তাঁর প্রচেষ্টাতেই সহজতর হয়ে গিয়েছিল।[১০]

কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডেনিসন রস এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী রিজলে অবশ্য ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে একটা শ্লেষাত্মক ধারণা পোষণ করতেন। এঁদের মতে আবদুল রসুল ছিলেন একজন 'ব্রীফলেস' ব্যারিষ্টার, এবং এই আন্দোলনে সামিল হয়ে তিনি হিন্দু অ্যাটর্নীদের মনোরঞ্জন করতে চান। আর হাসান জান তো ছিলেন স্বদেশী পার্টির বদান্যতা-নির্ভর এক ছোকরা ছাত্র-নেতা।[১১] কার্জনের একান্ত-সচিব লরেন্স-এর মতো ঝানু আমলা এবং ভ্যালেন্টাইন চিরল এবং সিডনী লো-এর মতো ধূর্ত সাংবাদিকরা কিন্তু 'দেওয়াল লিখন'টা পড়তে পেরেছিলেন। আর সে জন্যই এই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বিপদ সম্পর্কে সদ্যাগত বড়লাট মিন্টোকে সতর্ক করে দিতে তাঁরা দেরী করেননি। মুসলমানদের হাল-হকিকৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হিসেবে সুখ্যাত আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর মরিসনও ব্রিটিশ সরকারকে 'কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ বৃদ্ধির অশুভ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে অবহিত করেন'।[১২] মর্লেও মিন্টোকে এই বলে সাবধান করে দেন যে, "তুমি এবিষয়ে নিশ্চিত হতে পারো যে অল্পকালের মধ্যেই মুসলমানরা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করবে।" ১৯০৬ সালের ঐ গ্রীষ্মকালে মিন্টোর সমস্ত বিজ্ঞ শুভানুধ্যায়ীরাই তাঁকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন কিছু বিশেষ সুবিধা দিয়ে মুসলমানদের সরকারের স্বপক্ষে টানার চেষ্টা করেন।

বলাবাহুল্য এ বিষয়ে মিন্টোর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাৎক্ষণিক। স্যর ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার নতুন-তৈরী পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমতা রক্ষার অছিলায় সরকারী চাকরিতে হিন্দুদের বাদ দিয়ে মুসলমানদের বহাল করার নীতি প্রায় খোলাখুলিভাবেই ঘোষণা করেছিলেন।[১৩] স্বয়ং কার্জনের মতে সেখানে একশ'জনের মধ্যে পঞ্চাশ জনই ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী এবং সংখ্যালঘুদের জন্য পক্ষপাতিত্বের অজুহাত পূর্ববঙ্গ ও আসামের ক্ষেত্রে খাটে না। মুসলমানরা ফুলারের কাছে 'সুয়োরানী'র আদর

পেতে আরম্ভ করেছিল। ফুলারের উত্তরাধিকারী হেয়ার অবশ্য বুঝতে পেয়েছিলেন যে তাঁর পূর্বসূরি আসলে জনসমষ্টির একাংশকে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন।[১৪] লাটসাহেবের বদান্যতার ফলে যারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখতে শুরু করেছিল মিন্টো তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলে তারা মহা শোরগোল তুলল। আমলারা সেই বিক্ষোভকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার ফলে মিন্টো তাঁর মুসলমান-তোষণ নীতির একটা সুন্দর অজুহাত পেয়ে গেলেন। তিনি লিখলেন, "মুসলমানদের উপর বরাবরই আমার খুব আশা-ভরসা ছিল। বাঙালীদের (হিন্দুদের) বাগ্মিতাশক্তি তাদের অবশ্য নেই, নাম-ডাকও তাদের কম। কিন্তু এখন যেহেতু তারা বাঙালীদের সাফল্যে বেশ কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, সেজন্য এখন তাদের স্বার্থরক্ষায় আমাদের চেষ্টার যৌক্তিকতা তর্কাতীত, এবং তা এই একপেশে (হিন্দু জাতীয়তাবাদী) আন্দোলনের মোকাবিলায় আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে।"[১৫] গ্রামাঞ্চলে জবরদস্তি করে বয়কট চালু করতে গিয়ে হিন্দু-নেতারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সরকার-ঘেঁষা মুসলমানদের সুবিধে করে দিয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে কুমিল্লার দুজন মুসলমান জমিদারের কথা বলা যায় যাঁরা তাদের জমিদারীতে বিপিনচন্দ্রকে ঢুকতে দেননি বলে বয়কটের শিকার হন। তা ছাড়া তাঁরা স্বদেশীদের অর্থ ভাণ্ডারে কিছু দানও করেননি। সাধারণ মুসলমানদের বিশেষ করে বিরূপ করে তুলেছিল হিন্দু জমিদার বা তাঁদের নায়েব-গোমস্তাদের[১৬] এবং মাড়োয়ারী মহাজন-ব্যবসায়ীদের চিরাচরিত নিপীড়ন। শিক্ষিত, বিত্তশালী মুসলমানরা এই সময় থেকেই 'স্বদেশী'র জবাবে 'স্বজাতি'র জিগির তুলতে আরম্ভ করেন। পুরোপুরি মুসলমান-নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তৈরীর দাবীও ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠতে শুরু করল।[১৭] পূর্ববাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এই হিন্দু-বিদ্বেষের সংবাদ হেয়ার যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। যদিও উক্ত অশুভ প্রবণতা যে ইংরেজ আমলাদের উস্কানির ফল—সে তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরতে দেরী করেনি 'বেঙ্গলী' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা', তবু বড়লাট মিন্টোর পক্ষে স্বদেশী হাঙ্গামাকারীদের জাতীয়তাবাদী হিসেবে বিচার না করে হিন্দু বিক্ষোভকারীরূপে চিহ্নিত করা ও নিপীড়িতদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) ত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। স্বদেশী নেতারা এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ, 'সঞ্জীবনী'-তে কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'নব্যভারত'-এ ডি· এন· চৌধুরী হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির উপর বারবার জোর দিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ ও অশ্বিনীকুমার ঈদ্ মিল্লাতে নিয়মিত যোগ দিতেন। সিরাজউদ্দৌলাকে হিন্দুরা জাতীয় বীররূপে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাঁর উপর একাধিক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল, তবু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার মূলে আঘাত করা সম্ভব হয়নি।

১৯০৬-এর বাজেট বিষয়ক বক্তৃতায় মর্লে আসন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিতে মুসলমান নেতাদের উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে গিয়েছিল। বিধান পরিষদে সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেলেও নির্বাচনপ্রথা চালু হলে রাজনৈতিক শক্তির পাল্লাটা যে হিন্দুদের দিকেই বেশি ঝুঁকবে সেটা বুঝতে তাদের অসুবিধে হয়নি। ১৮৯২ সাল থেকেই মুসলমানরা ইংরেজ সরকারের নেকনজরে ছিল এবং বিশেষ সুবিধা-প্রাপ্ত সম্প্রদায় হিসেবেও গণ্য হয়ে আসছিল। এখন মুসলমান নেতাদের মনে এই প্রশ্নটাই বড়ো হয়ে উঠল যে ইংলণ্ডের উদারনৈতিক সরকার কি সে নীতির অবসান ঘটাবে? আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড-এর কাছে সম্পাদক মহসীন-উল্-মুলক তাঁর গভীর উৎকণ্ঠার কথা জানান।[১৮] এস· এইচ, বিল্গ্রামী আরও একধাপ এগিয়ে সখেদে ঘোষণা করেন,

"আমার আশঙ্কা হচ্ছে মিঃ মর্লে নিশ্চয়ই সমসাময়িক কালের ভারতীয় রাজনীতির চেয়ে ভল্‌তের ও অষ্টাদশ শতকের সাহিত্য সম্পর্কে বেশী অবহিত ।"[১৯] এই সময়েই ভাইসরয়ের কাছে একটা মুসলমান-প্রতিনিধি দল পাঠাবার জন্য আর্চবোল্ড অনুরুদ্ধ হন ।

আলিগড় কলেজ-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক মহসীন উল্‌-মুল্‌কের ৪ঠা অগষ্টের এই চিঠি খুব গুরুত্বপূর্ণ । তিনি খোলাখুলিভাবেই খেদ প্রকাশ করেছিলেন যে "প্রধান মুসলমান নেতারা আর তাঁদের তরুণ সহধর্মীদের কংগ্রেসের মোহিনীমায়া থেকে দূরে রাখতে পারছেন না । এর উপর মাননীয় মর্লের বক্তৃতাটি মুসলীম যুব সম্প্রদায়কে আরও বেশী করে কংগ্রেসে যোগ দিতে উৎসাহিত করবে ।" আলিগড়ের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে মুসলমান তরুণদের অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে । "ওরা বলে যে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করতে অক্ষম ; কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহ ছাড়া আমরা আর প্রায় কিছুই করিনি, কিছু করার আগ্রহও আমাদের নেই ।" সাধারণভাবে বলা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে এ আশঙ্কা সুতীব্র হয়ে উঠেছিল যে ব্যাপকতর ভিত্তিতে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা হলে তাদের বরাতে হয়তো একটা আসনও জুটবে না ; নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দুরা সমস্ত সুবিধাটুকুই লাভ করবে । এই চিঠি থেকে প্রমাণিত হয় যে ঝানু মুসলমান নেতারা ইংরেজ আমলাদের মন ভিজিয়ে কিছু সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের আশা ছিল তরুণ মুসলমানদের সামনে এগুলিকে তাদের রাজনৈতিক সাফল্যের অভ্রান্ত প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে পারবেন । মিন্টো যদি মুসলমান-প্রতিনিধিবর্গকে সাক্ষাৎদানে ধন্য করেন তো সেটা আলিগড়ের নেতাদের জাতে তুলবে, হয়তো-বা রাজনৈতিক অপমৃত্যুর হাত থেকেও তাঁদের বাঁচিয়ে দেবে ।

দিশেহারা এই মুসলমানদের কাছে ত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন আর্চবোল্ড ; তবে দড়ি টানাটানির কাজটা তিনি পর্দার অন্তরাল থেকেই করেছিলেন । মুসলমান প্রতিনিধিবর্গের আর্জি শুনতে বড়লাট রাজী হবেন কিনা সে বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস লাভের জন্য তাঁর একান্ত সচিব ডানলপ স্মিথের দ্বারস্থ হন আর্চবোল্ড । তাঁর আবেদনে ঢাকার মুসলমানদের উদ্বেগের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছিল । তিনি জানান যে এই "প্রতিনিধিবর্গকে কিছু আশ্বাসবাণী শোনালে পরিস্থিতি অনেক সহজ সরল হয়ে যাবে ।"[২০]

অবশ্য এঁদের স্বাগত জানাতে মিন্টোর আগ্রহও কম ছিল না । তাঁরই স্বীকারোক্তি অনুসারে "এ দেশের প্রজাদের বেশ কয়েকটি মহলে একটা আশঙ্কা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল যে বাঙালীদের দাবীর ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দাবী উপেক্ষিত হবে । সুতরাং এই সমস্ত বিচার-বিবেচনা করার সময় আমাদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে কংগ্রেসের মাধ্যমে যারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ পাচ্ছে তারা ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থের উপর যথাবিহিত গুরুত্ব আরোপিত হয় ।"[২১] কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পাল্লাটা যে-কোনও রকমে ভারী করা মিন্টোর কাছে খুবই জরুরী হয়ে উঠেছিল । মুসলমানদের মাধ্যমে অভীষ্ট পূরণের সহজ একটা পথ খুঁজে পেয়ে তাকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মধ্যে স্থায়ী অবয়ব দিতে উৎসাহিত হয়েছিলেন তিনি ।

মিন্টোর কয়েকজন কাউন্সিলরও মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি বিমুখতা সৃষ্টির উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন ।[২২] প্রতিনিধিবর্গের তরফে আবেদন-পত্রের মুসাবিদাটা আর্চবোল্ড করে দিয়েছিলেন । ডানলপ স্মিথকে তিনি লিখেছিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে এরা (মুসলমান সম্প্রদায়) রাজনৈতিক কলাকৌশলের ব্যাপারে

এখনও অপটু, আর অনভিজ্ঞতা তাদের বিপথগামীও করতে পারে।"[২৫] আর্চবোল্ড-এর লেখা বয়ানের সমস্তটাই অবশ্য মহসীন উল্-মুল্কের মনোমতো হয়নি ; বিশেষ করে সব রকম রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দান তিনি সমর্থন করতে পারেননি। তা ছাড়া নির্বাচনের বদলে মনোনয়নের দাবী জানানোতেও তাঁর সায় ছিল না ; কেন না মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই এই মত পোষণ করতেন যে 'হিন্দুদের সাফল্য এসেছে তাদের আন্দোলনের জন্য, মুসলমানদের দুর্দশার মূল তাদের (রাজনৈতিক) নিষ্ক্রিয়তা।' মহসীনের বক্তব্যের মধ্যে এই ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে কিছু সংখ্যক মুসলমান একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং 'সে কাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করা তখন আর সম্ভব ছিল না।' সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরীর নেতৃত্বে ঢাকার মুসলমানরা রীতিমত অনমনীয় মতবাদ পোষণ করতেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে ফুলারের চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। অবস্থাটা এই রকম দাঁড়িয়েছিল যে মিন্টো যদি যথেষ্ট পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা দিতে অক্ষম হন তা হলে আলিগড়-গোষ্ঠী পূর্ববঙ্গের বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের সমর্থন হারাবে।[২৬] আর্চবোল্ড বিলগ্রামী ও ঢাকার নবাবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত 'আর্জি'র বয়ান সম্পর্কেও মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভাইসরয়ের সঙ্গে মুসলমান প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারটা ত্বরান্বিত হয় তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেঃ গভর্নর হেয়ারের রিপোর্টের ভিত্তিতে। ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে হেয়ারকে অবহিত রেখেছিলেন ডানলপ স্মিথ।[২৭] হেয়ার ভাইসরয়কে জানান, "মুসলিম নেতারা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন কিনা এ বিষয়ে যদি মিঃ মর্লে আমাকে প্রশ্ন করেন তা হলে আমার উত্তর নিঃসন্দেহে ইতিবাচক হবে। হিন্দুদের পত্র-পত্রিকাতে 'টুলি স্ট্রীটের তিন দর্জ্জীর' কথা ব্যঙ্গ ভরে লেখা হচ্ছে, আর পূর্ববঙ্গে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মুসলমান নেতার সংখ্যাল্পতাও অনস্বীকার্য। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে এই সব নেতারা যদি কোনও ভাবে মৌলভীদের বিরুদ্ধাচরণ না করেন তা হলে সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রত্যেকে বিনা বাক্যব্যয়ে এঁদের নির্দেশই পালন করবে। **বস্তুতপক্ষে এখন মুসলমানদের এই ধরনের আন্দোলনগুলি পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালিত হওয়া দরকার।**"[২৮] অনুচ্চারিত হলেও হেয়ারের বক্তব্যে এই সাবধান-বাণী ছিল যে ভারত সরকার যদি মুসলমানদের বিক্ষোভ দূর করার বিষয়ে উদাসীন হন তা হলে এরা যে আন্দোলন শুরু করবে তা অবধারিত ভাবেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিণত হবে। তিনি জানান যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিরোধ মানসে মুসলমানরা পাল্টা আন্দোলন আরম্ভ করেছে এবং এদের নেতৃত্ব করছেন ঢাকার নবাব। স্বদেশী নেতাদের প্ররোচনায় হিন্দু খাতকরা তাঁকে ঋণ পরিশোধের জন্য উদ্ব্যস্ত করে তুলেছে। খাতকদের এই উৎপাতের জ্বালাতেই নবাব সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছেন। কর্তৃপক্ষকে হেয়ার এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে "ঢাকাতে অন্তত হাজারখানেক বদমাস আছে যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবার যে কোনও সুযোগের জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে।" বয়কটের অজুহাতে হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছে, খাজনা বয়কট করে মুসলমানরাও তার বদলা নেবে। ঐ বিশাল এলাকায় খাজনা আদায়ের জন্য সামরিক বাহিনীকে নিযুক্ত করা সম্ভব নয়। একমাত্র বড়লাটই মুসলমানদের আশা-ভরসার প্রতি সহৃদয়তা দেখিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন।[২৯]

মুসলমান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বড়লাটের সাক্ষাতের দিন ধার্য হয়েছিল ১লা অক্টোবর। ভারত সচিবকে তিনি জানান : "(ভারতবর্ষে) বিভিন্ন জাতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির ক্ষেত্রে

আমাদের পূর্ণ এবং দৃঢ় নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আপনি যে মত পোষণ করেন আমিও তা-ই অনুসরণের চেষ্টা করবো।"[২৮] উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই প্রতিনিধিদের মধ্যে শুধু আলিগড়-পন্থীরাই ছিলেন না, এমন কিছুসংখ্যক মুসলমান নেতাও ছিলেন যাঁরা স্যর সৈয়দের ইংরেজ তোষণনীতির প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না।[২৯] যেমন প্রতিনিধিদের নেতা আগা খাঁ। ১৮৯২ সালে তাঁকে কংগ্রেসের নরমপন্থীদের খুব কাছে আসতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ১৯০৬ সালে আলিগড় পরিদর্শনের পরেই ফিরোজ শাহ মেহ্‌তা এবং বদরুদ্দীন তায়েবজির মতো নেতাদের প্রভাব ঝেড়ে ফেলতে তিনি দ্বিধা করেননি। আগা খাঁ নিজেই লিখেছেন, "১৯০৬ সালের মধ্যে অন্যান্য মুসলমান নেতৃবর্গের সঙ্গে আমি এবং মহসীন উল্-মুলক্ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে স্ব-শাসিত নতুন কোনও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, সম্পূর্ণ নতুন পথ অনুসরণের মধ্যেই আমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে। আর, ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ পৃথক একটা জাতি হিসেবে আমাদের রাজনৈতিক স্বীকৃতিলাভ ছাড়া গত্যন্তর নেই।"[৩০] পূর্বাহ্নেই তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং সরকারী সহৃদয়তার আশ্বাস পেয়েছিলেন।[৩১] মুসলমান প্রতিনিধিরা যে বক্তব্য পেশ করেন তার, একটি বাদে, সব ধারাগুলিই রচনা করে দিয়েছিলেন আর্চবোল্ড। আর্চবোল্ড ছিলেন মনোনয়ন-নীতির পক্ষপাতী। কিন্তু মুসলমান নেতারা তরুণ সম্প্রদায়ের কথা স্মরণে রেখে চেয়েছিলেন 'নির্বাচন'। তবে এ নির্বাচন অবশ্যই ধর্মের ভিত্তিতে হওয়া দরকার এবং উদ্দেশ্যপূরণের জন্য তার চারপাশে থাকবে নানা রক্ষাকবচ। এঁরা সকলেই মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সোজা কথায় ধর্মের ভিত্তিতে তাঁরা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের সংখ্যার আনুপাতিক হারে এই প্রতিনিধিত্বের হিসেব করলে চলবে না। এদেশে তাঁদের রাজনৈতিক গুরুত্ব, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষায় তাঁদের অবদান সম্পর্কেও তাঁরা ভাইসরয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াসী হয়েছিলেন। এদেশে মাত্র একশো বছর আগে তাঁরা যে মর্যাদা ও প্রতিপত্তির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন—সে উল্লেখও ছিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে এই মুসলমান প্রতিনিধিরা সংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্য আসন ছাড়াও 'ওয়েটেজ' অর্থাৎ অতিরিক্ত আসন দাবী করেন যাতে পঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ ও বাংলায় কখনোই তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্ষমতাহীন সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে না। তৃতীয়ত, তাঁরা মুসলমানদের জন্য আলাদা যে নির্বাচক মণ্ডলীর দাবী তুলেছিলেন তা জমিদার, আইনজীবী, ব্যবসাদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও স্নাতক এবং জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের নিয়ে গঠন করাই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। এর মধ্যে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মুসলমানদের কোনও স্থান ছিল না।[৩২]

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মিন্টো সানন্দে এই খবর দেন যে 'মুসলমান ডেপুটিশনে'র আবেদনে সাড়া দেওয়ার কাজটা সুসম্পন্ন হয়েছে। মর্লেকে তিনি লেখেন যে "মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার যৌক্তিকতার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালেও আমার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে (কোনও মহলে) যাতে একটুও সন্দেহ উপস্থিত না হয় সে বিষয়ে আমি খুবই সতর্ক ছিলাম।"[৩৩] প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত কাজটাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন মিন্টো। হেয়ারের পরামর্শ অনুসারে তিনি ঐ 'ডেপুটেশন'কেই প্রতিনিধিত্বমূলক বলে গ্রহণ করেছিলেন।[৩৪] আলিগড়-গোষ্ঠীর রাজানুগত্য এবং স্বদেশপ্রীতির সুখ্যাতিতে তিনি কার্পণ্য দেখান নি। আবার তারই সঙ্গে মুসলমাদের মন থেকে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ সম্পর্কিত আশঙ্কাও তিনি দূর করেন।[৩৫] প্রাচ্যের জাতিগুলির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং মানসিক প্রবণতার আবহে প্রতীচ্যের

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যে কতো দূর সঙ্গতিপূর্ণ হবে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। এ সম্পর্কে তিনি প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে 'এ দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি উপেক্ষা করে ব্যক্তিনির্বিশেষে ভোটাধিকার দান করলে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার শোচনীয় ব্যর্থতা অবধারিত'। অবশ্য মুসলমান প্রতিনিধিদের তিনি এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ন থাকে সে বিষয়ে তাঁর চেষ্টার কোনও ত্রুটি থাকবে না।[৩৬] মহসীন উল্-মুল্কের সঙ্গে পরে একান্তে আলোচনার সময় তিনি বলেন যে হিন্দুদের ক্রমাগত প্রভাববৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের অধিকার অর্জন।[৩৭]

বলা বাহুল্য, মুসলমান সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়ার অধিকার লাভ করেছিলেন ডানলপ স্মিথ।[৩৮] তিনিই ছিলেন মুসলমান প্রতিনিধিবর্গ ও বড়লাটের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত যোগসূত্র। অনুরূপ ভাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছিলেন আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড। এই বৈঠক নেহাৎই একটা ওপর থেকে সাজানো ব্যাপার বলে অমৃতবাজার পত্রিকা যে মত প্রকাশ করেছিল.[৩৯] তা ঠিক নয়। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে, 'ডেপুটেশনে'র উদ্যোগটা নিয়েছিলেন মুসলমানরাই ; ঝানু আমলারা সেটাকে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়েছিলেন মাত্র। অক্টোবরের ঐ গুরুত্বপূর্ণ দিনটিতে সিমলা-সম্মেলনে স্যর সৈয়দের অশরীরী উপস্থিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। যে বিষাক্ত বীজ তিনি বপন করেছিলেন, সিমলায় তারই অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, আর চল্লিশ বছর পরে তার বিষময় ফসল হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল পাকিস্তান।

১৯০৬-এর জুন মাসে জাতীয়তাবাদীদের দাবী-দাওয়া কঠোরতর হয়ে ওঠার আগেই মর্লে বড়লাট মিন্টোকে সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সিমলা-বৈঠক ছিল তার উদ্যোগপর্ব। মুসলমান প্রতিনিধিদের প্রতিবেদনে মিন্টোর উত্তরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও এতে হিন্দুদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মর্লের অস্বস্তি কিন্তু চাপা থাকেনি।[৪০] রাজনীতির আসরে এই 'ব্যালান্স'-এর খেলার বিপদও তাঁর অজানা ছিল না। ব্যামফিল্ড ফুলারের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণের ফলে মুসলমানদের তীব্র অসন্তোষ, আবার মুসলমান প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের ফলে হিন্দুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তো কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার ছিল না।[৪১] তবে এই মুসলমান-ডেপুটেশন নিঃসন্দেহে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের র‍্যাডিকাল সদস্যদের বিরুদ্ধে মর্লের হাত শক্ত করে দিয়েছিল।[৪২] তিনি নিজেই লিখেছিলেন, "এই ঘটনা 'কটনিয়ান'দের (কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল পার্লামেন্টের র‍্যাডিকাল সদস্য) পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিয়েছে, ভারত সরকারকে অভিযুক্ত করার আর কোনও উপায় তাঁদের নেই। তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাবের ফলে ব্রিটিশ জনমতের কাছে কংগ্রেসের মূল্য কমে যাবে, সরকারেরও কলকাঠি নাড়ার সুযোগটা অনেক বেশি হবে।"[৪৩] মুসলমানদের আরও কৃতজ্ঞ করার জন্য থিওডোর মরিসনকে তাঁর পরিষদে স্থান দেওয়ার কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন, বাতিল করে দিয়েছিলেন অ্যান্টনী ম্যাকডোনেলকে, যিনি 'হিন্দুদেরই প্রকৃত ভারতবাসী' জ্ঞান করতেন।[৪৪] মর্লে মুসলমানদের মধ্যেই একটা 'সুপ্ত শক্তি' খুঁজে পেয়েছিলেন আর তাঁদের প্রতি সুবিচারের প্রতিশ্রুতি দানে সে শক্তিকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।

পূর্ববঙ্গে বেশ কিছুকাল ধরেই এই 'সুপ্ত শক্তি'র অবাধ প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল ।[৪৫] মিন্টোর আশ্বাস এবং হেয়ারের প্রশ্রয়ে অতি উৎসাহী মুসলমানরা স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ করে দিয়েছিল । ঘটনার এই পটপরিবর্তনে তৃপ্ত মিন্টো মর্লেকে লিখেছিলেন, "তারাই আমাদের সৌভাগ্যের সূচনা করেছে, এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কাজটাও তারা ভালভাবেই সম্পন্ন করতে পারছে । আপনার এ ধারণা নির্ভুল যে মুসলমানরাই ইংলণ্ডের জনগণের সামনে এই সত্যটা উদ্‌ঘাটিত করে দেবে যে বাঙালীরাই (হিন্দুরাই) ভারতবর্ষের সব কিছু নয় । আর আমাদের এ তথ্যটা কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বাঙালীদের (হিন্দুদের) সামাল দেওয়া গেলেও তাদের সংযত রাখা কঠিন ।"[৪৬] ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার শতানন দানবটা ইংরেজদের এই নীতির ফলেই জন্মেছিল, আর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে তার বীভৎস তাণ্ডব শুরু করতেও দেরী করেনি । এই সময়ে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ঢাকা, কুমিল্লা এবং জামালপুরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটতে থাকে,[৪৭] এবং যে সমস্ত সিভিলিয়ান প্রকাশ্যে মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন ।

তবে শুধুমাত্র বিক্ষোভ দেখিয়ে বা দাঙ্গা বাধিয়েই মুসলমানরা তাঁদের শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেননি । এই সময়ে 'অল ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগ' নামক একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজেও তাঁদের অনেককে আত্মনিয়োগ করতে দেখা গিয়েছিল । আগা খাঁ আত্ম-জীবনীতে লিখেছিলেন যে "তিনি এবং সিমলা-বৈঠকে যোগদানকারী মুসলমান নেতারা এ বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার উপরেই তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে । ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে ভারতীয়দের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আমাদের স্বীকৃতি লাভ করতেই হবে"।[৪৮] এই আগা খাঁই ডানলপ স্মিথকে জানান যে তিনি সিমলা-ডেপুটেশনের অন্যান্য সদস্যদের একটা স্থায়ী কমিটি গঠনের কথা বলেছেন । মহসীন উল্-মুল্‌ক এই কমিটির সম্পাদক মনোনীত হন এবং কোনও উদ্যোগ গ্রহণের আগে তাঁকে সরকারের অনুমোদন নিতে বলা হয় ।[৪৯] এই সময়ে 'নাইন্টিন্‌থ্ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় আমির আলীও মুসলমানদের একটা পৃথক রাজনৈতিক দলগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা লেখেন । ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁ উদ্যোগী হয়ে একটা চিঠি মারফৎ 'দ্য মুসলীম অল ইন্ডিয়া কনফেডারেসী'র পরিকল্পনা প্রচার করেন । ১৯০৬-এর ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকাতে আহুত এক মুসলমান সম্মেলনে ভিকর-উল্-মুল্‌ক-এর সভাপতিত্বে এই পরিকল্পনা সামান্য কিছু রদবদল করে গৃহীত হয় । প্রতিষ্ঠানটির নাম, একটু সংক্ষিপ্ত করে, রাখা হয় 'অল ইণ্ডিয়া মুস্‌লীম লীগ' এবং মহসীন-উল্-মুল্‌ক এবং ভিক্‌র-উল্-মুল্‌ক লীগের যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন ।[৫০] এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লীগের লক্ষ্যরূপে বর্ণিত হয়েছিল : (ক) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য অটুট রাখা, (খ) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও অধিকারগুলির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা এবং সরকারের কাছে যথাবিহিত সম্মান সহকারে মুসলমানদের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি তুলে ধরা, এবং (গ) লীগের অন্যান্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিঘ্নিত না করে ভিন্ন সম্প্রদায়গুলির প্রতি মুসলমানদের সদ্ভাব বজায় রাখা ।[৫১] একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে লীগের শেষ লক্ষ্যটি এক মুখে দু' কথা বলার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণিত হতে পারে । বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদকে মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে পরম হিতকর বলে ঘোষণা করে এবং বয়কটের মতো অন্যান্য সমস্ত আন্দোলনের নিন্দা করে লীগ তার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেছিল । সুতরাং 'গ' সংখ্যক শুভেচ্ছাটি বাস্তবায়িত করার কোনও প্রয়োজনই লীগের হবার কথা নয় । স্যর

সৈয়দের উত্তরাধিকার আলিগড়-পন্থী এবং বাংলার 'নবাব'দের হাতে এভাবেই সুরক্ষিত হয়েছিল। জন্ম-লগ্ন থেকেই ব্রিটিশ আনুগত্যের ধ্বজা উড়িয়ে লীগ হয়ে উঠেছিল মুসলমান জমিদার, জোতদার শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থের রক্ষক, মধ্যবিত্তের শুভাশুভের প্রতি উদাসীন এবং চরম হিন্দু-দ্বেষী একটা প্রতিষ্ঠান।

স্বদেশী আন্দোলনকে দু পাশ থেকে আক্রমণ করার যে অপচেষ্টা মিন্টো করেছিলেন তা সফল হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এবং পার্লামেন্টকে এ কথা বোঝাতে তাঁর কোনও অসুবিধে হয়নি যে স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় পর্যায়ের কোনও ঘটনা নয়, সেটা কেবল হিন্দুদেরই একটা ব্যাপার। পূর্ববঙ্গে লীগ ছিল প্রবল-প্রতাপ ঢাকার নবাবের কর্তৃত্বাধীনে—যে নবাব (বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-পরিকল্পনা সমর্থনের বিনিময়ে) ১ মিলিয়ন পাউণ্ড ঋণের সোনার শিকলিতে বাঁধা ছিলেন। এ ছাড়াও হেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন যে ভারত সরকারের উচিত তাঁকে আরও কিছু ঋণ দান করা যাতে আসানুল্লার সম্পত্তির স্বীয় অংশটুকু তিনি বিক্ষোভকারীদের কবল থেকে নির্বিঘ্নে উদ্ধার করতে পারেন। হেয়ার এ ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন যে 'মিন্টো যদি এতে অরাজী হন তা হলে তা সরকারের মর্যাদা হানির কারণ হবে এবং মুসলমানদের উপর হেয়ারের ব্যক্তিগত প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবে।'[৫২] এইভাবেই আদর-আস্‌কারা পেয়ে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য হয়ে,নবাব কালবিলম্ব না করে পরমোৎসাহে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে এবং তার সুযোগ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন।

কৃষি সম্পর্কের অবনতি নবাবকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। সংখ্যাগুরু মুসলমান চাষীদের মধ্যে খাজনা হ্রাসের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মুসলমান বর্গাদাররা হিন্দু জোতদারদের জমি চাষ করতে অস্বীকার করছিল। উচ্চ বর্গের সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে নিম্নবর্গের জমিদারবিরোধী মনোভাব মিলে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। এ আগুনে ইন্ধন জোগাচ্ছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামের মাদ্রাসায় শিক্ষিত মুসলমান মোল্লা ও মৌলভিরা। তাদের কেউ কেউ ঢাকার নবাবের হয়ে কাজ করছিল। নদীয়া[৫৩], ঈশ্বরগঞ্জ[৫৪] এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া (কুমিল্লা)য় তাদের কার্যকলাপ লঘু করতে চেয়েছিল সরকার। এপ্রিল ও মে (১৯০৬) মাসে ঐখানে গোলমাল শুরু হয়। বিভিন্ন মুসলিম সাম্প্রদায়িক ইস্তাহারের মধ্যে 'লাল ইস্তাহার' সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল। লীগের জন্মকালে এটা প্রথম প্রকাশ পায়। এতে হিন্দুদের মুসলমান ধনসম্পদের অপহারক বলে অভিহিত করা হয়েছিল।[৫৫] মুসলমান প্রজাদের মধ্যে পাটের চাষ বা কারবার করে যারা হঠাৎ ধনী হয় তাদের মধ্যে এসব প্রচারের মূল্য ছিল যথেষ্ট। তারা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে হিন্দু জমিদার ও নায়েবদের অত্যাচার অনাচার প্রতিরোধ করার জন্য তৈরী ছিল। দ্বিতীয় পক্ষকেও নিরীহ বলা চলে না। তারা অনেকেই কোর্ট–কাছারি না গিয়ে খাজনা বাড়াতে চেয়েছিল, অথবা খাজনার অর্ধাংশ 'মাথোট' রূপে আদায় করতে আরম্ভ করেছিল। বিশেষ করে আপত্তিকর ছিল 'ঈশ্বরবৃত্তি' অর্থাৎ দুর্গাপূজা বাবদ সেস।[৫৬] মোল্লারা সহজেই উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে।

জমিদার নায়েব ছাড়া গুর্লে সাহা জাতের মহাজনদের অত্যাচারের কথাও তুলেছেন। পাট চাষ সম্প্রসারণের ফলে মূলধনের সমস্যা বাড়ে। মাড়োয়ারী ও মুসলমান মহাজনরা অনেক বেশী সুদ নিত কিন্তু তা আদায় করত পাটে আর প্রতি বছর সব দেনা শোধ করে নিত। সাহারা বছরের পর সুদ জমাতে দেয় এবং পরে কোর্টে গিয়ে বন্ধক সূত্রে জমি কিনে নেয়। চাষীরা আর সব সহ্য করতে পারে, জমি মহাজনের হাতে তুলে দিতে পারে না। এজন্য দাঙ্গার সময় সাহাদের উপর আক্রমণ হতো সর্বাধিক।[৫৭] তবে গুর্লের মতে খোদ প্রজার চেয়েও যারা অধীনস্থ প্রজা ছিল তাদের উপর চাপটা বেশী পড়েছিল।

প্রাদেশিক গভর্নর ও চীফ সেক্রেটারীরা বেশির ভাগই বলেছিলেন যে মুসলমান কৃষকগণ তখনও হিন্দু জমিদার মাত্রই উৎপীড়ক এ কথা মনে করে না। পূর্ববঙ্গের পক্ষে এটা সর্বৈব সত্য নয়। তবে হেয়ার ও তাঁর অধঃস্তন আমলারা যে লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে মুসলিম পক্ষ নেন, তাতে সন্দেহ নেই।[৭৮] তিনজন মুসলমান নেতা—আবদুল রসুল,নবাব আমির হোসেন ও সৈয়দ সামসুল হুদা—মিন্টোর কাছে জেলা শাসকদের পক্ষপাতিত্বের বিষয় উল্লেখ করেছেন। কুমিল্লার দাঙ্গায় অভিযুক্ত নিবারণ রায়ের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীলে হাইকোর্ট মন্তব্য করেন যে দায়রা জজ হিন্দুসাক্ষীদের উপেক্ষা করেছেন এবং ইউরোপীয়দের সাক্ষ্য নেননি।

এ সময় দ্বারভাঙ্গার মহারাজা আমলাদের সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে বড়লাটকে অবহিত করতে চেয়েছিলেন।[৭৯] কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন। মিন্টো মশগুল ছিলেন তাঁর সৃষ্টির (মুসলিম লীগ) আনন্দে। আলিগড়ে আহুত দ্বিতীয় লীগ সম্মেলন (১৯০৮) বঙ্গ-ভঙ্গকে স্বাগত জানিয়ে এবং স্বরাজ ও স্বদেশীকে নিন্দা করে যে প্রস্তাব নিয়েছিল তাকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন বললে অন্যায় হবে না।[৮০]

পঞ্চম অধ্যায়

টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১। লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, প্রোসিডিংস, XXII, ১৮৮৩, পৃঃ ১৯-২০

২। মীবাট ভাষণ, ১৪ই মার্চ, ১৮৮৮, ফিলিপস (সম্পাদিত) দ্য এভল্যুশন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান, ১৮৫৮-১৯৪৭, সিলেক্ট ডকুমেন্টস (ও ইউ পি, ১৯৬২), পৃঃ ১৮৮

৩। ইন্ডিয়া পাবলিক লেটাবস, ৯, ১৮৮৮, পৃঃ ১১৯৫ ১২০০

৪। ল্যান্সডাউনেব বক্তৃতা, ১৬ই মার্চ, ১৮৯৩, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ গভর্নব জেনাবেল অফ ইন্ডিয়া, প্রোসিডিংস, XXXII, ১৮৯৩, পৃঃ ১০৫-১১

৫। সেন্সাস বিপোর্ট, ১৯০১, ভূমিকা

৬। বড়লাট সচিবকে চার্লস বেইলিব নোট, ২৫শে জুলাই, ১৯০৮, মর্লেকে মিন্টোব চিঠিতে অন্তর্ভুক্ত, Eur Mss. D 573/17, পৃঃ ১২

৭। সুবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে লিয়াকৎ হোসেন, ৪ঠা অগষ্ট, ১৯০৫, মর্লেকে মিন্টোব টেলিগ্রাম, নং ১৭২৮, ১৫ই জুলাই, ১৯০৭, হোম পল প্রোসিডিংস (এ) ফেব্রু, ১৯০৮, নং ৪৩

৮। ভাবত সবকাবকে পূর্ববঙ্গ ও আসামেব অস্থায়ী চীফ সেক্রেটাবী (হোম) নং ১৬৭সি, ১৯শে জুন, ১৯০৭, অন্তর্ভুক্ত, ঐ, নং ৪২

৯। কার্লাইলকে হ্যালিডে, ২১শে সেপ্টে, ১৯০৫, হোম পাব প্রোসিডিংস(বি), অক্টোবব, ১৯০৫, নং ১১৫

১০। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম (কল, ১৯৫৭) পৃঃ ৪-৫

১১। ফর্টনাইটলি বিপোর্টস ফ্রম ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম, নং ১৮৪ 'টি', ৭ই ডিসে, ১৯০৬, হোম পাব প্রোসিডিংস (এ) জানু, ১৯০৭, নং ২৬২

১২। অন্তর্ভুক্ত, মিন্টোকে মর্লে, ২২শে জুন, ১৯০৬, Eur Mss D 573/1

১৩। ফুলাবেব সার্কুলাব, ২৫শে মে, ১৯০৬

১৪। মর্লেকে মিন্টো, ১৫ই অগষ্ট, ১৯০৬ Eur Mss D 573/8, পৃঃ ২২। হেয়াব স্বযং ঐ চেষ্টা কবেছিলেন, তদেব, ১৯শে ডিসে, ১৯০৬, ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩

১৫। তদেব, ১৫ই অগষ্ট, ১৯০৬, পৃঃ উঃ

১৬। তদেব, ১১ই নভে, ১৯০৬, ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৯

১৭। কাউন্টেস অফ মিন্টো, ইন্ডিয়া মিন্টো অ্যান্ড মর্লে, ১৯০৫-১০, পৃঃ ৩০ ৪০

১৮। আর্চবোল্ডকে মহসীন উল্-মুল্ক-এর চিঠি, ৪ঠা অগষ্ট, ১৯০৬, Eur. Mss. D 573/8, পৃঃ ১৯

১৯। হাযদ্রাবাদেব বেসিডেন্ট সি এস বেইলিকে এস এইচ বিলগ্রামীব চিঠি, ২৪শে জুলাই, ১৯০৬, মিন্টো পেপারস, লেটাবস অ্যান্ড টেলিগ্রামস, ১৯০৬, ২য খণ্ড, সংখ্যা ২৫

২০। ডানলপ স্মিথকে আর্চবোল্ড, ৯ই অগষ্ট, ১৯০৬, মিন্টো পেপাবস, কবসপন্ডেন্স, ২য খণ্ড, সংখ্যা ৪০

২১। মর্লেকে মিন্টো, ৮ই অগষ্ট, ১৯০৬, Eur. Mss. D 573/8, পৃঃ ১৭

২২। ডানলপ স্মিথকে ইবেটসন, ১০ই অগষ্ট, ১৯০৬, মিন্টো পেপাবস, কবসপণ্ডেন্স, ২য় খণ্ড, সংখ্যা ৪১

২৩। ডানলপ স্মিথকে আর্চবোল্ড, ২০শে অগষ্ট, ১৯০৬, তদেব, সংখ্যা ৫০। মহসীন উল্-মুল্ককে লেখা আর্চবোল্ড-এব চিঠি, যেটি রাজেন্দ্রপ্রসাদেব ইন্ডিয়া ডিভাইডেড গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১০৬-৭ দ্রষ্টব্য।

২৪। আর্চবোল্ডকে মহসীন উল্-মুল্ক, ১৮ই অগষ্ট ১৯০৬, ডানলপ স্মিথকে আর্চবোল্ডের ২২শে অগষ্ট, ১৯০৬ তাং চিঠিব সঙ্গে প্রেরিত, মিন্টো পেপারস, করসপন্ডেন্স, ২য খণ্ড, সংখ্যা ৫৫

২৫। হেয়াবকে ডানলপ স্মিথ, ২৪শে অগষ্ট, ১৯০৬, ঐ, সংখ্যা, ৫৪

২৬। ডানলপ স্মিথকে হেয়াব, ১লা সেপ্টে, ১৯০৬, encl মিন্টো টু মর্লে, ১০ই সেপ্টে, ১৯০৬, Eur.Mss. D 573/8, পৃঃ ৫২-৫৩, শেষ বাক্যটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ।

২৭। মিন্টোকে হেয়ার, ২রা সেপ্টে, ১৯০৬, তদেব, পৃঃ ৫৪
২৮। মর্লেকে মিন্টো, টেলিগ্রাম, ৩১শে অগষ্ট, ১৯০৬
২৯। সৈয়দ রাজী ওয়াস্তি, লর্ড মিন্টো অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশানালিস্ট মুভমেন্ট, ১৯০৫-১৯১০, পরিশিষ্ট '২'-তে স্বাক্ষরকারীদের নামের তালিকা আছে
৩০। আগা খাঁ, মেময়রস্, পৃঃ ৩৩
৩১। মর্লেকে মিন্টো, ৪ঠা অক্টো, ১৯০৬, Eur. Mss D 573/8, পৃঃ ৭০
৩২। মুসলমানদের স্মারকলিপি,১লা অগষ্ট, ১৯০৬ মর্লে পেপারস, ইঃ অঃ লাইঃ
৩৩। মর্লেকে মিন্টো, ৪ঠা অগষ্ট, ১৯০৬, পৃঃ উঃ
৩৪। হেয়ারকে মিন্টো, ১লা অক্টো, ১৯০৬, মিন্টো পেপারস, লেটারস অ্যান্ড টেলিগ্রামস, ২য় খণ্ড, সংখ্যা ৭১
৩৫। হেয়ারকে ডানলপ স্মিথ, ২রা অক্টো, তদেব, সংখ্যা ৭৩
৩৬। মুসলমান ডেপুটেশনের কাছে মিন্টোর উত্তর, মর্লে পেপারস, পৃঃ উঃ; কাউন্টেস অফ মিন্টো, পৃঃ উঃ, ৫ম অধ্যায়, পৃঃ ৪৫-৭৭; মেময়রস্ অফ আগা খাঁ, পৃঃ ৭৬; আমীব আলি, ডন অফ এ নিউপলিসি ইন ইন্ডিয়া, 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী', নভে, ১৯০৬, পৃঃ ৮২৩
৩৭। দ্য আলিগড় ইনস্টিটিউট গেজেট, ২২শে এপ্রিল, ১৯০৮. লালবাহাদুর, দ্য মুসলীম লীগ, ইটস্ হিস্ট্রী, অ্যাকটিভিটিস্ অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস্, (আগ্রা, ১৯৫৪), পৃঃ ৩৯-৪০
৩৮। ডানলপ স্মিথকে মহসীন উল্-মুল্ক, ৭ই অক্টো, ১৯০৬, মিন্টো পেপারস, করসপনডেন্স, ২য় খণ্ড, সংখ্যা ১০৯
৩৯। 'অমৃতবাজাব পত্রিকা,' ৪ঠা অক্টো, ১৯০৬
৪০। মিন্টোকে মর্লে, ৫ই অক্টো, ১৯০৬, ১১ই অক্টো, ১৯০৬, Eur. Mss. D 573/1, পৃঃ ২০৩, ২১১
৪১। 'অমৃতবাজার পত্রিকা,' ২রা ও ৩রা অক্টো, ১৯০৬ ; 'বেঙ্গলী', ৩-৬, ও ৯ই অগষ্ট, ১৯০৬। রমেশচন্দ্র দত্তের মতো কয়েকজন নরমপন্থী নেতাও এব মধ্যে কোনও অন্যায় খুঁজে পাননি।
৪২। মিন্টোকে মর্লে, ১১ই অক্টো ১৯০৬, Eur. Mss. D 573/1, পৃঃ ২১২
৪৩। ঐ, ২৬শে অক্টো, ১৯০৬, ঐ, পৃঃ ২২৪
৪৪। ঐ, ২৭শে ডিসে, ১৯০৬, ঐ, পৃঃ ২৮০-৮১
৪৫। ঐ, ২৪শে জানুযারী, ১৯০৭, ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮
৪৬। স্যার আর্থার গডলেকে মিন্টো, ১৭ই অক্টো, ১৯০৬, মিন্টো পেপারস, সংখ্যা ২৪ ; সম্রাট সপ্তম এডযার্ডকে মিন্টোর পত্র, ১২ই ডিসে, ১৯০৬, লেটারস টু হিজ ম্যাজেস্টি, নং ১৭
৪৭। কুমিল্লা দাঙ্গার উপর ই· বি· ও আসামের চীফ সেক্রেটারী ল' মেজুরিযরকে চট্টগ্রামেব কমিশনার লুসন, ১৫ই মার্চ, ১৯০৭, হোম পাব, মে, ১৯০৭, ১৫৯-১৭১ 'এ'। জামালপুরের দাঙ্গার উপর ল' মেজুরিয়রকে ঢাকাব কমিশনার আর. ন্যাথান, নং ৬ 'কে', জুলাই, ১৯০৭, ৫৭-৬৩ 'এ' এবং এল· ও· ক্লার্কের নোট, ১৮ই মে, ১৯০৭, ঐ জুলাই, ১৯০৭, ৬-১৬ 'এ'।
৪৮। আগা খাঁ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭৬
৪৯। ডানলপ স্মিথকে আগা খাঁ, ২৯শে অক্টো, ১৯০৬, মিন্টো পেপাবস, করসপন্ডেন্স, ২য় খণ্ড, সংখ্যা ১২৬
৫০। 'দ্য আলিগড় ইনস্টিটিউট গেজেট,' ১লা/২রা জানুয়ারী, ১৯০৭
৫১। 'পাইয়োনীয়ার,' ২রা জানু, ১৯০৭, 'দ্য আলিগড় ইনস্টিটিউট গেজেট,' ৯ই জানু, ১৯০৭
৫২। মিন্টোকে হেয়ার, ২৭শে এপ্রিল, ১৯০৭, মিন্টো পেপারস, করসপন্ডেন্স, ১৯০৭, ১ম খণ্ড, নং ২১৯। ঋণ শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর করা হয়। দ্রষ্টব্য : মর্লেকে মিন্টোর চিঠি, ৮ই মে, ১৯০৭, Eur.Mss.D 573/10, পৃঃ ৬৭
৫৩। ভারত সরকার (হোম)কে বাংলা সরকার, নং ৯৭৫ 'পি', ৭ই এপ্রিল, ১৯০৬, হোম পাব প্রোসিডিংস (এ) জুন, ১৯০৬, নং ১৭৯
৫৪। হোম পাব প্রোসিডিংস, জুলাই, ১৯০৬, নং ১২৪ 'এ' ; ঐ মে, ১৯০৭, নং ১৬৯, ঐ জুলাই, ১৯০৭, নং ১৪-১৫ ; আর· সি· ক্রোনিন, ব্রিটিশ পলিসি অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন বেঙ্গল, পৃঃ ১০৬ ও তৎপরবর্তী
৫৫। ভারত সরকারকে ই· বি· ও আসাম সরকার (হোম) নং ১৬২ সি, ১৬ই জুন, ১৯০৭, হোম পল প্রোসিডিংস (এ) জুলাই, ১৯০৭, নং ১৮৯ ; ৫ই মে, ১৯০৭-এর 'বেঙ্গলী' পত্রিকা ইস্তাহারটা পুরো ছেপে দেন।
৫৬। আর· ন্যাথানের নোট, ৬ কে, জুলাই, ১৯০৭, হোম পল প্রোসিডিংস (এ) ডিসে, ১৯০৭, নং ৫৭-৬৩

৫৭। ডব্‌লু· আর· গুর্লে, রিপোর্ট অন দ্য ইনডেটেডনেস অফ দ্য এগ্রিকালচারাল পপ্যুলেশন অফ মাইমানসিং, ৩০ অক্টো, ১৯০৭, অন্তর্ভুক্ত ভারত সরকারকে পি. সি· লিওন, ১৫ই ফেব্রু, ১৯০৮, ভারত সরকার রেভিন্যু/এগ্রিকালচার ডিপার্ট, এল· আর ব্রাঞ্চ, মার্চ, ১৯০৮, ৪২-৪৩ এ

৫৮। মর্লেকে মিন্টো, ৮ই মে, ১৯০৭, Eur. Mss. D 573/10, পৃঃ ১০৩ ; রমেশচন্দ্র মজুমদার, হিস্ট্রী অফ ফ্রীডম মুভমেন্ট, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২০ ও তৎপরবর্তী। নেভিনসন, পূঃ উঃ, পৃঃ ১৯২-২০২ ; সি· জে· ওডোনেল, দ্য কজেস অফ দ্য প্রেজেন্ট ডিসকনটেন্ট ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ ৬৭-৭৩

৫৯। ডানলপ স্মিথের টীকা, ১৩ই মার্চ, ১৯০৭

৬০। রাজেন্দ্র প্রসাদ, পূঃ উঃ, পৃঃ ১১৫ ; সমগ্র বিষয়টির জন্য দ্রষ্টব্য : ওয়াই· ভি· গ্যানকোভস্কি ও এল· আর গর্ডন পোলনস্কায়া, এ হিস্ট্রী অফ পাকিস্তান, ১৯৪৭-৫৮ (নাউকা পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৬৪)। গ্রন্থটি অবশ্য মৌলিক দলিলপত্রের উপর নির্ভর করে রচিত নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মর্লে-মিন্টো সংস্কার

১৯০৫-এর অগষ্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ· জে· ব্যালফুর ভারতবর্ষে ভাইসরয়ের পদের জন্য ক্যানাডার প্রাক্তন গভর্নর-জেনারেল মিন্টোকে মনোনীত করেন। ১৮০৭ থেকে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে গভর্নর-জেনারেলের পদাসীন ব্যারণ মিন্টো (পরবর্তীকালে বংশের প্রথম আর্ল রূপে সম্মানিত) ছিলেন নবাগত ব্রিটিশ শাসকের প্রপিতামহ। অভিজাত হুইগদের রীতি অনুসারে মিন্টোও শিক্ষালাভ করেছিলেন ইটন এবং ট্রিনিটিতে। রবার্টস-এর অধীনে কিছুকাল ভারতবর্ষে সরকারী কাজ করার অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছিল। সামরিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ মিন্টো পেয়েছিলেন ইংলণ্ড ও তুরস্কের হয়ে রুশদের বিপক্ষে যুদ্ধের সময়। ১৯০৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তিনি ছিলেন ক্যানাডার মুখ্যপ্রশাসক। কার্জন শাসনের তিক্ত-অভিজ্ঞতার পর ব্যালফুরের রাজনীতি ও কূটনীতিবিদদের উপর আস্থা ছিল না। একটা চিঠিতে মিন্টোকে মর্লে জানিয়েছিলেন : "কিছুদিন আগে ব্যালফুর আমার এক বন্ধুর কাছে স্বীকার করেছিলেন যে ১৯০৪ সালে কার্জনকে ভারতবর্ষে ফেরৎ পাঠানোর সিদ্ধান্ত তিনি তাঁর প্রশাসন-কালের দু-তিনটি ভুলের অন্যতম বলেই মনে করেন।"[১] শাসন-বিষয়ে কোনও তত্ত্ব বা দর্শন নিয়ে মাথা ঘামানোর অভ্যেস মিন্টোর ছিল না। রেসের মাঠের ভাষাতেই তিনি এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন : "ঘোড়াকে গ্যালপ করানোর ফাঁকে তাকে ক্ষণিক বিশ্রাম নিতে দিয়েই ঘোড়দৌড়ের বহু বাজি জেতা সম্ভব হয়েছে।" বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষের প্রশাসনিক অশ্বটিকে রুদ্ধশ্বাসে দৌড় করিয়েছিলেন কার্জন, সদ্য-নিযুক্ত ভাইসরয় তাকে একটু বিশ্রাম দিতে চেয়েছিলেন। মিন্টো কার্জনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় কলকাতার জনৈক রসিক সিভিলিয়ান মন্তব্য করেন : 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস'-এর জায়গা নিয়েছে 'সেন্স অ্যান্ড সেন্‌সিবিলিটি'।

মিন্টো ভারতবর্ষে গভর্নর-জেনারেলের আসনে ভালভাবে বসার আগেই ব্যালফুর পদত্যাগ করেন এবং ১৯০৫ সালের শেষে গঠিত হয় ক্যাম্পবেল-ব্যানারম্যানের উদারনৈতিক সরকার। ১৯০৬-এর জানুয়ারীতে সাধারণ নির্বাচনে ইউনিয়নিস্টদের বিপর্যয় ঘটেছিল, আর লিবারেলরা সর্বসমেত ৩৭৭টি আসন পাওয়ায় তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ৮৪তে পৌঁছেছিল। ভারত সচিবের পদে অবশ্য মর্লেই থেকে যান। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস রচয়িতা হিসেবে মর্লে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন ; জীবন-চরিতকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি কম ছিল না। তাঁর আদর্শ পুরুষ এবং নেতা গ্ল্যাডস্টোনের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তিন খণ্ডে তাঁর যে জীবনচরিত মর্লে রচনা করেছিলেন তার ভাষা ও শৈলী গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতার মতো গুরুগম্ভীর হলেও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে তা স্বীকৃতি পেয়েছিল। মর্লের লেখা ব্যক্তিগত পত্রগুলি সুপাঠ্য এবং এগুলির মধ্য থেকেই একজন বিচক্ষণ কিন্তু দুর্বল-চিত্ত রাজনীতিবিদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চোখে ভারতীয়

রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ভণ্ডামী এবং ছলনাগুলো অনায়াসে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, "এই বিভাগে আমার যে সব সুহৃদ আছেন তাঁরা প্রায়ই আমায় বলেন—আমি ভারতবর্ষের কিছুই জানি না। আমি অবশ্য তা অস্বীকার করি না। কিন্তু তার পরেই আমার নির্মোহ মনে শাসন সংক্রান্ত এমন কিছু নীতি ও আদর্শ ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেন যেগুলি একমাত্র পিটারস্‌বার্গে ট্রেপফ্ সরকারের সঙ্গে খাপ খেতে পারে, অথবা যে অরেঞ্জ প্রশাসন আয়ারল্যান্ডের সর্বনাশ ঘটিয়েছিল তার সঙ্গে মানিয়ে যেতে পারে।"[২] তিনি যে একজন গ্ল্যাডস্টোন-পন্থী লিবারেল মর্লে তা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে রাজী ছিলেন না, আর আইরিশ হোমরুলের জন্য তাঁর প্রিয় নেতার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম সর্বদাই তাঁর মনে জাগরূক ছিল। লর্ড অ্যাক্টন কিন্তু মর্লে চরিত্রের আরেকটা দিকের মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বলেছেন—'সততার থেকে যে জেদ সৃষ্টি হয় মর্লে চরিত্র তার থেকে মুক্ত ছিল না'। বার্কের প্রতি প্রবল অনুরাগ সত্ত্বেও ক্রমওয়েলের প্রভাব থেকে তিনি আত্মরক্ষা করতে পারেননি।

ভারতবর্ষের এই সময়কার রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ইংলণ্ডে বিভিন্ন পার্লামেন্টারী গোষ্ঠীর সংস্কার প্রবর্তনে আগ্রহের মধ্যে যে সমাপতন ঘটেছিল তা মর্লের চোখে ধরা পড়েছিল। আর ভারতব্যাপী ঐ অবাঞ্ছিত বিক্ষোভের হেতুটাও অতি অল্প সময়ের মধ্যে বড়লাট মিন্টো ধরে ফেলেছিলেন। এ জন্যই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদকে একটা 'বেদনাবহ-ভ্রান্তি' বলে স্বীকার করে নিতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। মর্লেকে তিনি লিখেছিলেন, "এ কথাটা আমি স্বীকার না করে পারি না যে প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাই বলা হোক না কেন, বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের পিছনে যুক্তিগ্রাহ্য বেশ কিছু অনুভূতি আছে। আমার সন্দেহ, হয়তো যথেষ্ট সহৃদয়তার সঙ্গে এই আঞ্চলিক মনোভাবের বিচার-বিবেচনা হয়নি...ইয়র্কশায়ারের ইষ্টরাইডিঙকে প্রকৃত প্রশাসনিক প্রয়োজনেও যদি কেউ লিঙ্কনশায়ারের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, আমার মনে হয়, তা নিয়ে হাঙ্গামাটা কম হবে না।"[৩] তাঁর জানা ছিল যে অধিকাংশ বাঙালী নেতা বিশ্বাস করতেন যে পূর্ববঙ্গের বদলে বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যথাক্রমে উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে যোগ করে দিলে ব্যাপারটা সকলের মনোমতো হতো। কিন্তু সে পথে না গিয়ে, আগাগোড়া দুঃসহ রূঢ়তা ও অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে কার্জন বাঙালীদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছেন। যাদের বিচ্ছিন্ন করা হলো তাদের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত ঔদাসীন্য দেখিয়ে সমস্ত কিছু অসহ্য করে তুলেছিলেন তিনি।[৪] কংগ্রেসকে অবজ্ঞা করে কার্জন যে মহাভুল করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করার কোনও বাসনা মিন্টোর ছিল না।[৫] অবশ্য মুসলমানদের চোখে প্রীতিকর হয়ে ওঠার জন্য এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে বঙ্গ-বিচ্ছেদ হিতকর বলে যে যুক্তি ব্যামফিল্ড ফুলার দেখিয়েছিলেন তা মিন্টো অস্বীকার করেননি। কিন্তু তাই বলে বরিশালের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণে ফুলারের ব্যর্থতার নিন্দা করতেও তিনি পিছপা হননি। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে রসাতলে যাবে না বা তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফুলার যে আসলে সুরেন্দ্রনাথের সুবিধে করে দিয়েছেন—এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি মিন্টোর ছিল।[৬] শিক্ষা বিষয়ে ফুলারের সার্কিউলার এবং স্কুলের ছাত্রদের শায়েস্তা করার জন্য তিনি যে রাস্তা নিয়েছিলেন, বিশেষ করে সরকারী চাকরি পাওয়ার পথ তাদের কাছে একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, মিন্টোর বিচারে, তা অশোভন বলে ঠেকেছিল।

ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলারের সমস্যা তাঁর কাছে অপক্ষপাত প্রমাণের একটা সুযোগ এনে দিল। মর্লে তো ফুলারের উপর রেগে লিখেছিলেন: "ব্রিটিশ রাজের খুবই দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে

বলে ভাবতে হবে: যদি একদল মাথা-গরম কলেজের ছাত্রদের হুমকিতে তা কাঁপতে শুরু করে।"[৭] ঢাকায় যাঁরা ক্ষমতায় বসে আছেন তাঁদের দরকার একটু ধৈর্য। বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয়ের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসীদের সমস্ত উত্তাপ বে'র হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁদের মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। "বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সমস্ত পরিকল্পনাটাই ছিল তেতো বড়ি, তাই তাকে গিল্টি-পালিশ করে চক্‌চকে করাটা আরও জরুরী" বলে মর্লের মনে হয়েছিল।[৮] কিন্তু ফুলারের অত্যাচার তাতে বাধা দিচ্ছিল। জবরদস্ত ফুলার নিজেই তাঁর পতন ডেকে এনেছিলেন। সিরাজগঞ্জের দুটি স্কুল বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে অতি-উৎসাহী হয়ে ওঠে। তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটকে অনুরোধ জানান। অভিযুক্ত স্কুলটি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হোক—উপাচার্য স্যর আশুতোষের এই পরামর্শ পেয়ে রিজলে ফুলারকে তাঁর চিঠিটি প্রত্যাহার করতে বলেন। ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে মর্যাদাহানিকর বিবেচনা করে ফুলার পদত্যাগ করেন। মিন্টো দেরী করেননি পদত্যাগ পত্রটি গ্রহণ করতে।[৯] প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উপর ফুলার-সৃষ্ট ঝামেলা সামলানো মিন্টোর পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল।

ঐ বছরের গ্রীষ্মকালেই ভারতসচিব গোখ্‌লের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এটুকু বুঝেছিলেন যে বাঙালীরা কংগ্রেসকে পুরোপুরি 'নষ্ট' করতে পারেনি এবং এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে সরকারের সহায়তায় পিছপা হবে না কংগ্রেস। অবশ্য মিন্টো এবং তাঁর কাউন্সিলরদের সঙ্গে তিনিও একমত ছিলেন যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলি শিকড় গাড়তে পারবে না। কিন্তু পার্লামেন্টের কিছু সংখ্যক র‍্যাডিকাল সদস্য সেই চেষ্টাতেই অত্যুৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।[১০] অপরপক্ষে, প্রতিক্রিয়াশীল নীতি আয়ারল্যাণ্ডে ব্যর্থ হয়েছে তা গোখ্‌লের অগোচর ছিল না। আর চরমপন্থী তৎপরতা দমনের অজুহাতে জবরদস্ত আমলাশাহীর সমর্থন যে পরিণামে বিক্ষুব্ধদের হাতই শক্ত করে দেবে—তা মর্লের অগোচর ছিল না।[১১] মোটকথা ব্রিটিশ নেতারা বুঝেছিলেন যে কংগ্রেসের কিছু কিছু দাবী না মানলে তা সত্যকার জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে অতি প্রবল হয়ে উঠবে। সুতরাং মিন্টোর উচিত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যাবৃদ্ধি, বাজেট আলোচনার পূর্ণ সুযোগ দান এবং সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার প্রবর্তনের কথা চিন্তা করা। তবে এ সমস্ত কিছুই হবে প্রশাসনের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে, সরকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় হাত না দিয়ে। অবশ্য বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে একজন দেশীয় সদস্যের অন্তর্ভুক্তির যে চিন্তা মিন্টোর মাথায় এসেছিল[১২] সিভিলিয়ান গোষ্ঠী এবং ইঙ্গ-ভারতীয়রা যে সেটিকে মোটেই সুনজরে দেখবেন না—সে বিষয়ে মর্লের আশঙ্কা ছিল।[১৩] কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসেবে দেশীয় রাজন্যবর্গের একটা পরিষদ গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা মিন্টো পেশ করেছিলেন (কার্জনও বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন) তার সাফল্য সম্পর্কে মর্লের বেশ সন্দেহ ছিল। এ দেশের নৃপতিদের পারস্পরিক কোঁদলের কথা তাঁর জানা ছিল।

১৯০৬-এর সেই গ্রীষ্মে মর্লে নরমপন্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে গোখ্‌লের সঙ্গে সবিস্তারে আলাপ-আলোচনা করেন। ভারতবর্ষের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনে তিনি যে বদ্ধপরিকর—গোখ্‌লে ভারতসচিবকে সে কথা স্পষ্ট ভাবেই জানিয়েছিলেন। মর্লে লিখেছেন, "আমি কিন্তু আমার এই দৃঢ় ধারণা (তাঁর কাছে) গোপন রাখার চেষ্টা করিনি যে আগামী বহুদিনের জন্য,আমার জীবনে যে ক'টি দিন বাকি আছে তারও বহু বছর পর্যন্ত

সেটা স্বপ্নই থেকে যাবে।[১৪] ফুলারের পদত্যাগে মুসলমানদের তীব্র প্রতিক্রিয়ার খবর পাওয়ার পর তিনি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রশ্নটিও পুনর্বিবেচনা করতে রাজী হননি।

এদিকে মুসলমান সম্প্রদায়কে যে কংগ্রেসী আন্দোলনের একটা প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো সম্ভব সেটা মিন্টোর কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। বড়লাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে আর্চবোল্ড-এর কাছে মহসীন উল্-মুল্কের চিঠি, হেয়ারের প্রতিবেদনে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান হিন্দু-বিদ্বেষের উল্লেখ এবং ফুলারের পদত্যাগের ফলে মুসলমান সমাজে হতাশার সংবাদ (সাম্প্রদায়িকতার বিষ যে হেয়ারই ছড়িয়েছিলেন তা হেয়ারের স্বীকারোক্তিই প্রমাণ করে)—ভাইসরয়কে পরিস্থিতিটা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ করে।[১৫] ভারতবর্ষে রাজনীতির এই টানাপোড়েন সম্পর্কে মর্লেও অবহিত ছিলেন এবং মুসলমানদের ডেপুটেশনের ফলাফল জানতে তাঁর ঔৎসুক্যেরও অবধি ছিল না। গোখলে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের খুশী করার জন্য এই অনুকূল পরিস্থিতিটা নষ্ট করার কোনও বাসনাই তাঁর ছিল না।[১৬]

গোখ্লের ইংলণ্ড ভ্রমণ নেহাৎ অকারণ ছিল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের হাত শক্ত করার জন্য তিলক এবং গোখ্লেকে পরস্পরের কাছাকাছি আসতে দেখা গিয়েছিল। তিলক 'বয়কট' প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। গোখ্লেও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদকে একটা 'প্রচণ্ড রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতা' এবং 'নির্মম অবিচার' বলে ধিক্কার দিতে কুণ্ঠিত হননি। নিরুপায় একটা জাতির সামনে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হিসেবে বয়কটের সমর্থনে তিনিও সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন।[১৭] গোখ্লে লিখেছিলেন, "একমাত্র এই বয়কটের মাধ্যমে (ওদের) দৃষ্টি আকর্ষণ সম্ভব, এর ফলেই ল্যাঙ্কাশায়ারের মান্যগণ্যরা বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হবেন।"[১৮] তবে কংগ্রেসী রাজনীতিতে তখনো প্রবলপ্রতাপ ফিরোজ শা মেহতা এবং দীন্‌শ ওয়াচা তিলক এবং গোখলের এই সম্প্রীতি সুনজরে দেখেননি। গোখ্লের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে (১৯০৫) আপোষ মীমাংসার দ্বারা কোনও রকমে বিরোধ এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। সম্মেলনে বাঙালী প্রতিনিধিরা প্রিন্স অফ ওয়েলস্-এর উদ্দেশে অভিনন্দন-বার্তা পাঠানোর বিরোধিতা করলে তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন মাদ্রাজের প্রতিনিধিরা। শেষোক্তদের সঙ্গে বহু সংখ্যক পঞ্জাবী এবং মহারাষ্ট্রীয় কংগ্রেসীও যোগ দিয়েছিলেন। এরপর কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তাবটি উত্থাপনের সময় গোখ্লের অনুরোধে তিলক এবং লাজপৎ রায় অনুপস্থিত থাকতে রাজী হন এই শর্তে যে তিনি ঘোষণা করবেন প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি।[১৯] কিন্তু বাঙালী প্রতিনিধিরা তখনো আপত্তি জানাতে থাকায় লাজপৎ তাঁদের আলাপ-আলোচনায় নিবিষ্ট রাখেন এবং সেই অবসরে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয়, সমস্ত নেতাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই বয়কট প্রস্তাবের বিরোধিতা আসে এবং তাঁকে নিবৃত্ত করেন রমেশচন্দ্র দত্ত। শেষ পর্যন্ত বয়কট সম্পর্কে কংগ্রেস সুস্পষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রদ করার দাবী জানিয়ে একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। অপর একটা প্রস্তাবে সরকারী দমননীতির নিন্দা করে, পরোক্ষ প্রতিবাদের শেষ অস্ত্র হিসেবে বাংলা কর্তৃক বিদেশী পণ্য বয়কটের সমর্থন করা হয়। প্রস্তাবটিতে একথাও উল্লিখিত হয়েছিল যে ভারত সরকার জনগণের সমস্ত আবেদন এবং প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশকে দু-টুকরো করার ব্যাপারে যেভাবে অনড় হয়ে আছেন, তার প্রতিবিধানের জন্য এবং এ বিষয়ে ব্রিটিশ জনমতের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এই একটিমাত্র নিয়মতান্ত্রিক এবং কার্যকর উপায় প্রজাদের হাতে আছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে গোখ্‌লে বয়কট সমর্থন করেন, তবে বোম্বাই-এর নেতাদের চাপে তাঁকে এই সতর্কতাবাণীও উচ্চারণ করতে হয় যে কংগ্রেস যেন বয়কটের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকে। এ বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহই ছিল না বয়কটের ফলে 'অপরপক্ষের ক্রোধাগ্নি তীব্রতর হয়ে উঠবে…কেন না এই নীতির সঙ্গে যুক্ত কিছু তিক্ত ব্যাপার, ক্ষতি করার একটা অপচেষ্টাও জড়িয়ে আছে।' তাঁর অভিমত ছিল এ জাতীয় অস্ত্র প্রয়োগ শেষ উপায় হিসেবে করাই বাঞ্ছনীয়।[২০]

কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী গোষ্ঠীর প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যে ভাঁটা লেগেছে সেটা বেনারস অধিবেশনেই গোখ্‌লে বুঝতে পেরেছিলেন। রাজনৈতিক আধিপত্য ফিরে পেতে হলে নরমপন্থীদের বড়ো রকমের একটা সাফল্য অর্জন যে অত্যাবশ্যক সেটাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। মর্লের কাছ থেকে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ এবং ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে গোখ্‌লে ১৯০৬-এর এপ্রিলে বিলেত যান। তাঁর দক্ষতা এবং সৌভাগ্যের উপরেই নরমপন্থীদের ভাগ্য নির্ভর করছিল। ওদিকে মর্লে সম্পর্কে তিলকের কোনও মোহ ছিল না। তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন, "মর্লে তাঁর নীতি এবং আদর্শ সবটাই (সাম্রাজ্যের স্বার্থে) বাঁধা দিয়ে বসেছেন।" তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, গোখ্‌লের মিশন ব্যর্থ হবেই।[২১] ১৯০৬-এর গ্রীষ্মের দিনগুলি যতোই ফুরিয়ে যেতে থাকে নিজের বিশ্বাস সম্পর্কে তিলক ততোই নিঃসন্দেহ হতে থাকেন। তবে গোখ্‌লে হাল ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। মর্লের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় কিছু সুরাহা যে হবেই—নিজেকে এ প্রবোধ দিয়ে চলেছিলেন। "আমাদের দরকার আরেকটু ধৈর্য, আরও একটু আপোষের মনোভাব।"[২২] তিলক মন্তব্য করেছিলেন, "সমস্ত ব্যাপারটা নরমপন্থীদের আত্মাবমাননা প্রকট করে তুলেছে।" এমন কি সুরেন্দ্রনাথ নৌরজীর কাছে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের ব্যাপারে মর্লের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন।[২৩] ওদিকে ফুলারের নির্যাতন বাঙালীদের অস্থির করে তুলেছিল। জনগণের সর্বপ্রকার অধিকার হরণ এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতাকে অপমান করতেও তাঁর বাধেনি। স্বদেশীদের মীটিং-এ ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করায় এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণ বন্ধ করার ব্যাপারে তিনি প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। বরিশালে প্রাদেশিক কংগ্রেসে সামরিক ও পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে চরমপন্থীরাও বঙ্গ-ভঙ্গের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য স্বদেশী ও বয়কটকে ব্যাপকতর করে তুলতে অগ্রসর হন। পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে তিলককে সভাপতি করার জন্য তাঁদের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। এই সময়েই ফুলারের উত্তরসূরী হেয়ার বিপিনচন্দ্রের রাজদ্রোহমূলক কাজকর্মের একটা প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান। তার থেকে জানা যায় যে উক্ত বাঙালী নেতা ইংরেজদের 'ফিরিঙ্গী' বলে অপমান করেছেন, বারবার সকলকে শোনাচ্ছেন হিন্দুদের বাহুবলের কথা এবং তরুণদের ব্যায়াম চর্চার জন্য আখড়া গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করছেন। ছাত্র সমাজের উপর সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব বিলীয়মান, প্রকট হয়ে উঠেছিল ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নিষ্ক্রিয়তা।[২৪] এ দেশে চরমপন্থীদের কর্মতৎপরতা যে খুবই বেড়ে যাচ্ছিল তা রমেশচন্দ্র দত্তও ভারতসচিবের গোচরে এনেছিলেন। ফরাসী বিপ্লব এবং আইরিশ অ্যানার্কিস্টদের ইতিহাস মর্লেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের কাজকর্মের ধারা সম্পর্কে একটা ধারণা করার সুযোগ দিয়েছিল ; নরমপন্থীদের অচল অবস্থা প্রণিধান করতেও তাঁর অসুবিধে হয়নি। তিনি লিখেছিলেন : "এখন আমাদের সামনে প্রশ্ন একটাই—নরমপন্থীদের জন্য আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব তা করে চরমপন্থীদের বিষদাঁত

আমরা ভেঙে দিতে পারবো কিনা। তবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে ব্যাপারটা স্থানীয় পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে।”[২৫]

ভারতবর্ষে বড়লাটের প্রাসাদে বসে মিন্টোও প্রায় এই রকমই ভাবছিলেন। ১৯০৬-এর অগস্টে এ· টি· আরুনডেলকে সভাপতি করে তিনি শাসন সংস্কার সম্পর্কিত সব রকম প্রস্তাব (অবশ্যই সীমিত পরিসরে) বিচার-বিবেচনা করার জন্য ছোট একটা কমিটি তৈরী করেছিলেন। কমিটি সদস্যদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ সম্পর্কিত কোনও প্রস্তাবই বরদাস্ত করা হবে না, কারণ তা সরকারের দুর্বলতার পরিচায়ক বলে প্রতিভাত হবে, এ দেশে ইংরেজ রাজত্বকে বিষময় করে তুলবে এবং মুসলিম প্রতিবাদের ঝড় তুলবে। কমিটির কাছে ভাইসরয়ের দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল—প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি অবশ্যই বিচার করতে হবে জাতি ধর্ম ও শ্রেণী স্বার্থের ভিত্তিতে—ঠিক যেমনটি হয়েছিল ১৮৮৮ সালে স্যর সি· এইচিসন (Aitchison)-এর নেতৃত্বাধীন কমিটির রিপোর্টে এবং ১৮৯২ সালের সংস্কারের ক্ষেত্রে। তৃতীয়ত, আরুনডেল কমিটিকে বলা হয় খানদানী অভিজাতবর্গ এবং জমিদার সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি রেখে যেন অধিকতর প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রশ্নটি নিষ্পত্তি করা হয়। তা ছাড়া ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী, কৃষিজীবী, চা-কর এবং ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেবার নির্দেশও কমিটিকে দেওয়া হয়।[২৬]

আগেই বলা হয়েছে ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর মুসলমান প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিন্টোর বৈঠক উল্লেখযোগ্য ভাবে সফল হয়েছিল এবং তার ফলে সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে ব্রিটিশরাজের অনুগত প্রজায় পরিণত করাটাও সহজ হয়ে গিয়েছিল। শুধু চরমপন্থীদের চালচলন সরকার ভাল বলে মনে করছিলেন না। কংগ্রেস রাজনীতিতে তিলকের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য মিন্টোকে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। ঐ মারাঠি নেতা যে ব্রিটিশরাজের চিরশত্রু তা তিনি ভাল করেই জানতেন। আর নরমপন্থীদের অসুবিধেটা কোথায় তাও তিনি অনুভব করতে পারছিলেন। মর্লের চিন্তাধারার রেশটুকু নিয়েই যেন তিনি লিখেছিলেন,“আমার নিজের ধারণা—ভারতবর্ষে নরমপন্থীদের সঙ্গে একমত হতে না পারলেও তাঁদের সদ্‌বুদ্ধিকে যথাযথ মূল্য দিলে অনেক কিছু করা সম্ভব হবে। তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পালের মতো চরমপন্থীরা যদি কংগ্রেসের উপর পাকাপাকিভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন তা হলে তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কংগ্রেসও দু-টুকরো হয়ে যাবে। সন্দেহ নেই, অসম্ভবের পিছনে ধাওয়া করেছেন চরমপন্থায় বিশ্বাসীরা।”[২৭] ভারতীয় রাজনীতির এই ধরনের বিশ্লেষণের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় ব্রিটিশ সরকারের নরমপন্থীদের দলে-টানার নীতির বীজ। ইতিপূর্বে মর্লে যার আভাস দিয়েছিলেন মিন্টো এখন নিজস্ব ভাবনায় তাকেই একটা স্পষ্ট অবয়ব দিলেন। এর আগে ব্রিটিশ রাজের প্রতি মুসলমানদের অনুরক্ত করার ব্যাপারে তিনি অনেকটা এগিয়েছিলেন। গোখ্‌লের ‘মিশনে’র অসাফল্যের পর ম্রিয়মান নরমপন্থীদের অনুরূপভাবে সরকারের প্রতি টানাও জরুরী বলে তাঁর মনে হলো।

চরমপন্থীদের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে নরমপন্থীরা যে বড়লাটের ‘শরণ’ নিতে আরম্ভ করেছিলেন তা মিন্টোর কাগজপত্র থেকেই জানা যায়।[২৮] বিপিনচন্দ্রকে সুরেন্দ্রনাথ ঘোরতর অপছন্দ করলেও তাঁর বহু শিষ্য ঐ চরমপন্থী নেতার দলভারী করতে আরম্ভ করেছিলেন। এদিকে মেহতা এবং ওয়াচা নরমপন্থীদের এই ভয় দেখাতে শুরু করেছিলেন যে তিলক অথবা লাজপৎকে যদি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয় তাহলে ‘বোম্বাই সমস্ত

পরিস্থিতিটা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হবে', অর্থাৎ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসবে।[২৯] গোখ্‌লে ভয় করছিলেন যে চরমপন্থীরা প্রবলতর হয়ে উঠলে শাসন সংস্কার সম্পর্কে মর্লে যে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন তা উবে যাবে।[৩০] সুতরাং আত্মরক্ষার্থে নরমপন্থীদের ছলনার আশ্রয় নিতে দেখা গেল। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তাঁরা সুকৌশলে সর্বজনশ্রদ্ধেয় দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতির পদে বরণ করেন।[৩১]

তখনকার মতো চরমপন্থীরা এই ব্যবস্থা মেনে নিলেও উত্তাপ, উত্তেজনা এবং দ্বন্দ্বের কারণটা থেকেই গিয়েছিল। খাপার্ডের অপ্রকাশিত দিন-লিপি থেকে জানা যায় যে এই সময় বিপিনচন্দ্রের আহ্বানে তিলককে সভাপতি করে যে সম্মেলন বসে তাতেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে বিষয়-নির্বাচনী সভায় সম্ভব না হলেও প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁরা 'অফিসিয়াল' সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। ভিন্ন প্রদেশাগত প্রতিনিধিদের কাছে গোখ্‌লে এবং মুধোলকর যে প্রচার অভিযান শুরু করেছিলেন তার জবাব দিতে থাকেন অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং তিলক। এরপর দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদে বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে কংগ্রেসীদের মধ্যে যে অশোভন বাকবিতণ্ডা আরম্ভ হয় তার একটা বিবরণ দিয়েছেন 'সর্বত্রগামী' ডানলপ স্মিথ। মহারাষ্ট্রের খাপার্ডে এবং বাংলার বিপিনচন্দ্র কোনও রকম আপোষ মীমাংসায় আসতে অস্বীকার করেন। ব্রিটিশ সরকারকে তাঁরা আর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতে রাজী ছিলেন না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে তাঁদের প্রবল অনীহাও তাঁরা গোপন করেননি। নরমপন্থীদের প্রস্তাবিত কয়েকটি বিষয়ে তিলক এবং লাজপৎ একমত হলেও সাধারণভাবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিপিনচন্দ্র এবং খাপার্ডের অনুরূপ। এঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন মতিলাল ঘোষ। লাজপৎ অবশ্য অনুগামীদের মাথা ঠাণ্ডা রাখার এবং সতর্ক হবার উপদেশ দিতে কসুর করেননি। কিন্তু বাঙালী প্রতিনিধিদের বাগ মানানো যায়নি। এদিকে গোখ্‌লে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন যাতে চরমপন্থীরা তাঁদের প্রস্তাব ভোটে তুলতে না পারেন, কেন না তিনি এটা সুনিশ্চিত ভাবেই জানতেন যে ভোটাভুটি হলে বিপিনচন্দ্র তাঁর দলবল নিয়ে নরমপন্থীদের একেবারেই পর্যুদস্ত করে দেবেন।[৩১ক] বয়কট নিয়ে মতদ্বৈধ হওয়ায় পাল কিছু অনুগামী নিয়ে বিষয় নির্বাচনী সভা ত্যাগ করে যান। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর ভাষণ ধোঁয়াটে হলেও তার মধ্য থেকেই এই রূঢ় সত্যটা বেরিয়ে এসেছিল যে কংগ্রেসের মধ্যে ফাটল ধরেছে। 'ইউনাইটেড কিংডম' বা তার উপনিবেশগুলির মতোই স্বায়ত্তশাসন বা 'স্বরাজ' লাভই যে কংগ্রেসের লক্ষ্য তা ঘোষণা করলেও তিনি 'স্বরাজ' শব্দটার ব্যাখ্যা করেননি। খাপার্ডের ৩১ ডিসেম্বরের দিনলিপিতে দেখি 'স্বরাজ' কথাটার উচ্চারণে বহু নরমপন্থী শিউরে ওঠেন। চরমপন্থীরা আবার 'স্বরাজে'র ভিন্নতর ব্যাখ্যা করেন। তিলক তার মধ্যে শুনলেন স্বরাজ্যের প্রতিধ্বনি।[৩২] শুধু তিনি নন, মহারাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ স্বরাজ শব্দটির মধ্যে ছত্রপতি শিবাজীর রণহুঙ্কার শুনতে পেয়েছিলেন।

কংগ্রেস অধিবেশনে এরপর গোলমাল শুরু হয় 'সাত' নম্বর প্রস্তাবটা নিয়ে। প্রশ্নটা ছিল—ইংরেজী শিক্ষা, চাকরী, সরকারের দেওয়া খেতাব, বৃত্তিসহ বিদেশী সমস্ত কিছুই বয়কট করা হবে কিনা, অথবা শুধু ব্রিটিশ পণ্যই বয়কটের আওতায় আনা হবে, এবং তা হলে, এই নীতি সমস্ত ভারতবর্ষেই প্রযোজ্য হবে কিনা। পাল বয়কটকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান,[৩৩] কিন্তু মালব্য বাংলার বাইরে তার প্রয়োগ চান না। গোখ্‌লে চান তাকে শুধু ব্রিটিশ পণ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে।[৩৪] শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে যে প্রস্তাবটি পাশ করা হয় (লাজপৎ রায়ের সংশোধনের পর) তা নরমপন্থীদের সাফল্যই সূচিত করেছিল। বেনারস

কংগ্রেসে গৃহীত 'প্রস্তাব'টির মতোই ছিল এর বয়ান : "এই কংগ্রেসের এটাই সিদ্ধান্ত যে বাংলাপ্রদেশকে বিভক্ত করার প্রতিবাদে সেখানে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা তখন এবং এখনও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।" প্রস্তাবের সমর্থনে এগিয়ে আসেন মাদ্রাজের জি· আর· আয়ার, উত্তরপ্রদেশের মদনমোহন মালব্য, মহারাষ্ট্রের গোখ্‌লে ও বাংলার আশুতোষ চৌধুরী এবং প্রতিবাদে বিপিনচন্দ্র সহ বাংলার অন্যান্য তরুণ চরমপন্থীরা সম্মেলন ত্যাগ করেন। গোলমাল বাধে আট নম্বর প্রস্তাবটির বেলাতেও। তার বয়ান চরমপন্থীদের দাবী অনুসারে 'Swadeshi at any sacrifice' হবে না নরমপন্থী পছন্দ অনুযায়ী 'Swadeshi even at a sacrifice' হবে—তা নিয়ে বাকবিতণ্ডার ঝড় বয়ে যায়। ডানলপ্ স্মিথ জানাচ্ছেন এর পরেই দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বড়লাটের কাছে নিবেদন করেন : "কংগ্রেস নরমপন্থীদের হাতে থাকবে না তা চরমপন্থীদের কবলে পড়ে দেশময় নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে সেটা সরকারই নির্ধারণ করে দিন।" লাজপৎ রায় পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছিলেন, "সন্দেহ নেই ঐ সময় দাদাভাই নৌরজী যদি সভাপতির আসনে না থাকতেন এবং আমি যদি (বিক্ষুব্ধদের) বাধা না দিতাম তা হলে পরের বছর সুরাটে যা ঘটেছিল তা-ই ঘটে যেতো কলকাতায়।" তবে পঞ্জাবকেশরীর ভাষ্যটি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। পঞ্জাবের প্রতিনিধিদের কিছু ভোট নরমপন্থীদের পক্ষে গেলেও অজিত সিং-এর দল চরমপন্থীদের সমর্থন করেছিল। মোটের উপর এই সময় তিলক তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুসারে আন্দোলন চালাবার জন্য 'নতুন দলে'র গোড়াপত্তন করেন।[৩৫]

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কংগ্রেস রাজনীতির যে হতাশাব্যঞ্জক ছবি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন মিন্টোর কাছে তা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। তবে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে যে ধরনের অগ্নিবর্ষী লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল তার পরে বড়লাটের পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভবপর ছিল না। লাজপৎ রায়ের 'দ্য পঞ্জাবী', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত বেশ কিছু রচনা সরাসরি জনসাধারণকে বিদ্রোহে উস্‌কানি দিতে শুরু করেছিল। সরকারের আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় ও আইরিশ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্র (যেমন 'দ্য গ্যেলিক আমেরিকান'(The Gaelic American) ও'দ্য ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট'), কিছু বুলেটিন ও সার্কিউলার। পঞ্জাব ও সীমান্তের সেনানিবাসগুলিতে সেগুলি বিদ্রোহের প্ররোচনা দিচ্ছিল।[৩৬] 'দ্য পঞ্জাবী'র বিরুদ্ধে মামলা ও তার শাস্তিদানের পর লাহোরে বেশ কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় আক্রান্ত হন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা রাওয়ালপিণ্ডিতেও ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্জাবের লেঃ গভর্নর ইবেটসন্ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে 'রাজদ্রোহী' জমায়েত নিষিদ্ধ করার জন্য এবং লাজপৎ রায়, অজিত সিং ও হায়দার রিজার বিরুদ্ধে দ্বীপান্তরের পরোয়ানা জারির জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রার্থনা করেন। ইতিমধ্যে অতিরিক্ত রাজস্ব বৃদ্ধি ও বারি দোয়াব খাল অঞ্চলে জলকর বৃদ্ধির ফলে অসন্তোষ, কলোনাইজেসন্ অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে চেনাব উপত্যকার লায়ালপুর, শিয়ালকোট, ফিরোজপুর ও লাহোরের অধিবাসীদের বিক্ষোভের সঙ্গে মিশে গোটা পঞ্জাবকে অশান্তিতে উত্তাল করে তুলেছিল। ঐ এলাকায় প্লেগজনিত মৃত্যুহার অসম্ভব বেড়ে যায় এবং সে আতঙ্কের সঙ্গে মিশে যায় তুলো চাষে ব্যাপক অজন্মার জন্য অনটন ও মহাজনদের উপর ক্রোধ। লাজপৎ রায় ও অজিত সিং সুকৌশলে এই বিক্ষোভ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলেন।[৩৭] ভাইসরয় মিন্টোর খেদোক্তি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : "কঠোরতার সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো বহু রাজদ্রোহের ঘটনা ঘটছে কিন্তু পরিতাপের বিষয় ঐ সব ঘটনার নায়কেরা (জনগণের) প্রকৃত

কিছু অভাব-অভিযোগ নিজেদের কাজে লাগাতে সমর্থ হচ্ছেন। অস্বীকার করার উপায় নেই অসন্তোষগুলি অকারণ নয়।"[৩৮] মিন্টো আরও লিখেছিলেন, "প্রধানত পঞ্জাব থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকজন নেওয়া হয় এং তাদের দাবীদাওয়া সমর্থন করেই পঞ্জাবের চরমপন্থীরা সামরিক বাহিনীর আনুগত্য ও নৈতিক বোধ নষ্ট করার সুযোগ নিচ্ছেন।"[৩৯] সন্দেহ নেই জওয়ানরা (অন্যান্যদের মাস মাইনের তুলনায়) স্বল্প বেতনের জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। শিখ রেজিমেন্টে ব্যাপক অসন্তোষ বিষয়ে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার নিঃসন্দেহ ছিলেন। এমন কি উত্তরপ্রদেশেও বিক্ষোভ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।[৪০]

এই পরিস্থিতিতে মিন্টো যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা একদিকে ছিল দুর্গতদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে অকৃপণ, অপরদিকে যে সব রাজনীতি-করা মানুষ এদের বিপথে পরিচালিত করছিলেন তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনে অবিচল। কলোনাইজেসন বিল-এর অসঙ্গতি এবং তাকে কেন্দ্র করে অকারণ কাল-ক্ষয়কারী সরকারী নীতির অন্যায় স্বীকার করতেও যেমন মিন্টোর বাধেনি, তেমনি পঞ্জাব সরকারের 'মর্যাদা'র প্রশ্নটিকেও তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দিতে রাজী হননি। ফলে কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশের আপত্তি সত্ত্বেও আইনটি তিনি বাতিল করে দেন। এরই সঙ্গে লাজপৎ রায় ও অজিত সিং-এর দ্বীপান্তরের আদেশ,[৪১] গোটা পঞ্জাবে প্রকাশ্য সভার বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্স জারী, এবং কিচেনারের সুপারিশ অনুযায়ী একটা 'মিলিটারী প্রেস অ্যাক্ট'-এর প্রস্তাব করতেও মিন্টো ইতস্তত করেননি। ওদিকে বাংলার লেঃ গভর্নর স্যর অ্যানড্রু ফ্রেজারের এই সন্দেহ হয়েছিল যে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪এ-এর ধারা অনুযায়ী কলকাতার কোনও জুরী হয়তো বিপিনচন্দ্রকে দোষী সাব্যস্ত করতে রাজী হবে না। তাকেও দ্বীপান্তরে পাঠানো হোক।[৪২] এ বিষয়গুলি মিন্টোকে ভাবিয়ে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯০৭-এর ৩রা জুন প্রকাশিত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশ অমান্য করায় 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম' প্রভৃতি পত্রিকার বিরুদ্ধে জনগণকে রাজদ্রোহে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। 'বন্দেমাতরম' মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় পালের ৬ মাস কারাদণ্ড হয়, অরবিন্দ ঘোষ খালাস পান। 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বিচার চলাকালে জেলে প্রাণত্যাগ করেন। ১৬ই জুন, ১৯০৭-এ প্রকাশিত দুটি নিবন্ধের জন্য 'যুগান্তর'-এর বিরুদ্ধে মামলা আনা হয় এবং সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এক বছর জেল হয়। তৎসত্ত্বেও রাজদ্রোহী প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে 'যুগান্তরে'। দ্বিতীয়বার অভিযুক্ত হয়ে 'যুগান্তরের' মুদ্রকের দু' বছর জেল হয়। হাতবদলের পরও 'যুগান্তরে' রাজদ্রোহমূলক নিবন্ধ প্রকাশ অব্যাহত থাকে।[৪৩] সি· জে· স্টিভেনসন মুর তাঁর (১লা মে, ১৯০৮) প্রতিবেদনে 'যুগান্তর' ও গোপন সমিতিগুলির যোগ লক্ষ্য করেন।

পরিস্থিতিটা আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন প্রধানত আমলাদের প্ররোচনায় পূর্ববঙ্গে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। নরমপন্থীরা এই রাজনৈতিক অশান্তির মধ্যে প্রায় হতাশার শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছন। এমন কি সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী এবং নরেন্দ্রনাথ সেনকে সরকারের কাছে প্রায় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের উদ্যোগ করতেও দেখা গিয়েছিল। মিন্টোর ভাষায় "'কিং অফ বেঙ্গল' (সুরেন্দ্রনাথ) তাঁর প্রাসাদ-কক্ষের একটা সোফাতে বসে বাঙালী চরমপন্থীদের অত্যুগ্র কাজকর্ম এবং বিপিনচন্দ্রের বাড়াবাড়ি দমন করার জন্য প্রশাসনিক সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।"[৪৪] এতে, বলাবাহুল্য, বড়লাট খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

কিন্তু দমননীতি অবলম্বনের জন্য মিন্টো যে সমস্ত সুপারিশ করেছিলেন ভারত সচিব মর্লে, কিছুটা বিরক্ত হয়েই, তা বাতিল করে দেন। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে

ভারত সরকারের কাছ থেকে তিনি কিছু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁর আশা ছিল এভাবেই সংস্কার-প্রচেষ্টাগুলিকে ব্রিটেনের দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা যাবে। মহামান্য সম্রাটের ভাষণেও তিনি ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বিষয়ে একটা অনুচ্ছেদ যোগ করে দিয়েছিলেন এই আশায় যে পার্লামেন্টের ঐ অধিবেশনেই সে বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কিছু করা যাবে। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েই তিনি লক্ষ্য করলেন যে ভারত সরকার অকারণে কালক্ষেপ করছেন, কিচেনার, ইবেটসন্ এবং রিচার্ডস একসিকিউটিভ কাউন্সিলে নেটিভ্ সদস্য সংযোজনের বিরুদ্ধতায় অনড় এবং গোটা শাসন পরিষদ আরুনডেল্ কমিটির সুপারিশ পুনরায় পর্যালোচনা করার পক্ষপাতী।[৫৫] দরকার মতো অপেক্ষা করতে রাজী হলেও মর্লে অনন্তকাল ধরে এ জাতীয় সময় নষ্ট বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে কোনও ভারতীয়কে অন্যতম এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলর নিযুক্ত করলে তাঁদের বিশেষ অধিকার আর অক্ষত থাকবে না বলে আমলাদের আশঙ্কা মর্লের চোখে বিরক্তিকর ঠেকেছিল। আরুন্ডেল্ এবং বেকার যথার্থই লিখেছিলেন: "সরকারের সংরক্ষিত কাউন্সিলে একজন নেটিভের প্রবেশাধিকারকে আমাদের দুর্গের অভ্যন্তরে কোনও বিপজ্জনক শত্রুর অনুপ্রবেশ না ভেবে রক্ষী বাহিনীতে নতুন সংযোজন বলেই গণ্য করা উচিত।" কিছুকাল আগে ভাইসরয় অথবা ভারত সচিবের পরিষদে, কিংবা দুটোতেই,ভারতীয় সদস্য গ্রহণকে মর্লে 'Cheapest concession' বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। আর এর ফলে প্রশাসনিক যন্ত্রটি যে একটুও কমজোরী হয়ে যাবে না সে সম্পর্কেও তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না।[৫৬]

ইন্ডিয়া কাউন্সিলের কিছু সদস্য এবং কয়েকজন ইংরেজ রাজনীতিবিদের যে-কোনও-রকম সংস্কারের বিরোধিতা মর্লের মেজাজ তিক্ত করে দিয়েছিল। তাঁর এ খেদোক্তি অকারণ ছিল না যে "যে ঘোড়াগুলিকে দিয়ে আমাদের প্রশাসনিক রথ চালাতে হবে তাদের প্রত্যেকটির গাঁটে গাঁটে কী ভয়ঙ্কর বাত।"[৫৭] বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে এবং বিলেতে সংস্কার বিরোধীদের মূল আপত্তিটা সৃষ্টি হয়েছিল (শাসন পরিষদে) দেশীয় সদস্যের অন্তর্ভুক্তিকে কেন্দ্র করে। সুখ্যাত উদারনৈতিক রিপন 'রিফর্ম ডেস্‌প্যাচ'টিকে 'বাক চাতুরীতে ভর্তি' বলে বর্ণনা করেছিলেন, আর নতুন যুগ, নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছিল সেগুলিকে 'স্রেফ ধাপ্পা' বলে মনে করতেন ফাউলার। আবার ব্যামফিল্ড ফুলারের স্বভাবসুলভ কূটবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল যখন তিনি একজনের বদলে দুজন ভারতীয়কে (ঢাকার নবাব ও গোখ্‌লে) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে ঢোকাতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁরা অনন্তকাল ধরে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করেন।[৫৮] ইন্ডিয়া কাউন্সিলের বিচারে নেটিভ্ সদস্য তো অস্পৃশ্যেরও বেশি ঘৃণ্য ছিলেন, এবং ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের দৃষ্টিভঙ্গীও খুব আলাদা ছিল না।[৫৯] একজন ভারতীয় সদস্য এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের গোপন দলিলপত্র তথ্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন—এ দৃশ্যের কল্পনাতেও শিউরে উঠেছিলেন রিপন, ফাউলার এবং এলগিন। পরে, কোনও এক সময়ে, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কোনও ভারতীয় সদস্যকে ঐ পদে গ্রহণ করাটা তবু তাঁরা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। তবে ঐ প্রস্তাবটা মিন্টোর একেবারেই মনঃপূত ছিল না। তিনি লিখেছিলেন: "সিভিল সার্ভিসের একজন ভারতীয় সদস্যকে দিয়ে আমাদের কোনও কাজই হবে না।"[৬০] একজন সিভিলিয়ানের পক্ষে সাধারণ ভারতীয়ের কোনও প্রত্যাশা মেটানো সম্ভব নয়—এই ছিল মিন্টোর অভিমত।

১৯০৭ সালের ২১শে মার্চের রিফর্মস ডেসপ্যাচকে ঘিরে যখন এ জাতীয় তর্কবিতর্কের

ঝড় বয়ে চলছিল তার মধ্যেই বজ্রপাতের মতো আচমকা পঞ্জাবের ঘটনাবলীর কথা সকলের কানে আসে। একটু দুঃখের সঙ্গেই মর্লে লিখেছিলেন : "এই এক পুরোনো বেদনার কাহিনী! প্রশাসনিক ব্যর্থতা মাঝে মাঝেই বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, সে সব দমন করতেও হয়। আর এর দোষটা গিয়ে পড়ে সংস্কারকামীদের উপর। তাঁদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়, জয় হয় প্রতিক্রিয়ার, আর শেষ পর্যন্ত গলদগুলো থেকেই যায়, হয়তো বা আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে।"[৫১] তবে সমস্ত কিছুতে যাঁরা রাজদ্রোহের ছায়া দেখে উত্তেজিত হন বা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার বাণী যাঁরা অহরহ উচ্চারণ করেন, তাঁরা যা-ই বলুন না কেন, মর্লে সাংবিধানিক সংস্কারের প্রশ্নে ছিলেন অবিচলিত। তিনি জানতেন 'বিপ্লবীদের মতোই ঐসব চরিত্রের মানুষ ইতিহাসের অসংখ্য ছন্দপতনের জন্য দায়ী।' লণ্ডন শহরের সাধারণ মানুষজন প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে এতো দূর অজ্ঞ যে তাঁরা ফুলারের অপসরণকেই লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডির দাঙ্গা-হাঙ্গামার মূল কারণ বলে মনে করেন। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের কথা স্মরণে রেখেই মর্লে লিখেছিলেন, "এঁরা ভারতবর্ষে 'দ্য গ্র্যাণ্ড ডিউক পলিসি' প্রবর্তন করতে চান।" তিনি এ সমস্ত সহ্য করতে রাজী ছিলেন না—শুধুমাত্র উদারনীতির খাতিরে নয়, বাস্তব এবং জরুরী রাজনৈতিক প্রয়োজনে। স্বস্তির কথা এটাই যে ইংলণ্ডের র‍্যাডিকাল মতালম্বীরা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের নীতির বিরোধী ছিলেন, আর লাজপৎ প্রভৃতির দ্বীপান্তরের প্রশ্নে কমন্স সভায় আইরিশ, লেবার এবং বেশ কিছু সংখ্যক সাধারণ সদস্যও সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন।[৫২]

পার্লামেন্টে লাজপৎ রায়-এর ব্যাপারটা মেটাতে মর্লেকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, আর এই সুযোগে তিনিও ভারত সরকারকে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। ইবেট্‌সনকে তিনি বলেন, আসন্ন সংস্কার সম্পর্কে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের মুক্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।[৫৩] মর্লে মিন্টোর এই স্বীকারোক্তিতেও খুশী হয়েছিলেন যে ইবেট্‌সনের তাগিদেই তিনি পঞ্জাবের ব্যাপারে অন্যায় রকম তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। লাজপতের মতো চরিত্রবান মানুষের পক্ষে সেনাবাহিনীর আনুগত্য নাশ করার কোনও অভিপ্রায় পোষণ করা যে সম্ভব নয় তাও মিন্টো প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেন।[৫৪] বিপিনচন্দ্রের 'অপরাধ' যে অতি তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন সে বিষয়েও মর্লের সন্দেহমাত্র ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা বা তাঁকে কারারুদ্ধ করা যে অত্যন্ত গর্হিত এবং অবিবেচনার কাজ হবে সে কথাও তিনি মিন্টোকে জানিয়ে দেন।[৫৫] অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তখনই গ্রেপ্তার করা উচিত যখন এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে মুক্ত অবস্থায় তাঁর আচার-আচরণ সরাসরি এবং অকস্মাৎ দেশে গুরুতর হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে পারে। সুখের বিষয় ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা মিলিটারী প্রেস অ্যাক্ট বিষয়ে লর্ড কিচেনারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেননি। মর্লে এই মত পোষণ করতেন যে ইচ্ছাকৃতভাবে, অকারণে ভীতি সঞ্চারের জন্যই, কিচেনার এই অপচেষ্টা করেছিলেন। তবে নিরাপত্তার খাতিরে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আইন পাশের জন্য মিন্টো পীড়াপীড়ি করলে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই ভারত সচিব সম্মতি দেন, যদিও ইবেট্‌সন বা হিউয়েট্-এর মতো লোক যাতে কোনও অপব্যাখ্যা করতে না পারেন সে জন্য রাজদ্রোহী সভাসমিতি নিরোধ সংক্রান্ত বিলটির (১৯০৭-এর অক্টোবরে আনা) বয়ান পুনরায় রচনার জন্য তিনি আদেশ দিয়েছিলেন। বিশ শতকে সপ্তদশ শতাব্দীর স্ট্রাফোর্ডের শাসননীতি যে অচল তা তো তাঁর অজানা ছিল না। কিছুটা বিরক্তির সুর লেগেছিল তাঁর এই কথায় যে "মাত্রাতিরিক্ত দমননীতিকে ওরা কড়া শাসন বলে ভুল করেন এবং ঐ জাতীয় নীতি গ্রহণের জন্য আমার উপর চাপ দিয়ে ওঁরা কমন্স-এ আমার সুনাম ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট

করেছেন।"[৫৬] সুখের কথা এই যে ঐ সময় শ্রমিকদলের কেয়ার হার্ডি এবং হিন্ডম্যান ভারতবর্ষে 'নিউ ডীল' প্রবর্তনের জন্য উদারনৈতিক ও র‍্যাডিকালদের দাবী সমর্থনে সোচ্চার হয়েছিলেন। মিটিং সংক্রান্ত বিল ১৯০৭-এর ১লা নভেম্বর পাশ হবার চার দিনের পর লাজপৎ ও অজিত সিংকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯০৭-এর 'রিফর্মারস্ ইয়ার বুকে' এই মন্তব্যটি দেখা যায় : "দিনের পর দিন ব্রিটিশ সরকার মডারেটদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে অবহেলা দেখাচ্ছেন আর এরই প্রতিক্রিয়ায় চরমপন্থী শিবিরে কংগ্রেসীরা আরও বেশি সংখ্যায় এসে ভিড় করছেন।" এদিকে কংগ্রেসের মধ্যে ফাটল যতো বড়ো হচ্ছে সংস্কার প্রবর্তনের প্রশ্নটাও ততোই জরুরী হয়ে উঠছে। কিন্তু গোখ্‌লেকে 'সিডিসনে'র প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণে সোচ্চার করতে না পেরে মিন্টো ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। তাঁর মনে এ সন্দেহও উঁকি দিতে শুরু করেছিল যে গোখ্‌লে হয়তো মনে মনে পালদের মতই বিপ্লবী এবং শেষমেষ তিনি লিখেই ফেলেছিলেন, "গোখ্‌লের উপর আর আমার আস্থা নেই। খোলাখুলি ভাবে জঘন্য রাজদ্রোহের বিরুদ্ধাচরণ করে একজন সৎ নরমপন্থী নেতা হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ তিনি হেলায় হারাচ্ছেন।"[৫৭] বস্তুতঃএ বিষয়ে গোখলে ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ। দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বৃদ্ধিতে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের মোকাবিলা নির্মমভাবে করা হোক তাও তিনি চাইতেন। কিন্তু লাজপতের নির্বাসন দণ্ড তিনি সমর্থন করবেন কি করে? ডানলপ স্মিথকে তিনি লিখেছিলেন, "সরকারের হাতে যে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ এসেছে তার ভিত্তিতে আপনি তাঁকে (লাজপৎ) দোষী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু মানুষটির চরিত্র, আচার-আচরণ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান থাকায় আমি তাঁকে নিরপরাধ মনে না করে পারি না। তাঁর একজন পুরোনো সহকর্মী হিসেবে তাঁর মুক্তির জন্য সচেষ্ট হওয়া আমার কর্তব্য।" তা ছাড়া লাজপৎ এবং অজিত সিংকে একাসনে বসানোটাও অতি গর্হিত কাজ হয়েছিল। উগ্র কাজকর্মের সমর্থন করে প্রচার করতে অস্বীকৃত হওয়ায় লাজপৎকে কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক বলতে অজিত সিং-এর একটুও বাধেনি।[৫৮] বাংলার চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্রকে অল্পেই রেহাই দেওয়া হয়েছে, 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত রাজদ্রোহমূলক রচনাগুলি সম্পর্কে কোনও রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, অথচ পঞ্জাবে মাত্রাতিরিক্ত দমননীতি প্রবর্তিত হয়েছে—সেটাও গোখ্‌লে ভুলতে পারছিলেন না। বিচলিত হয়েই তিনি লিখেছিলেন, "রাজদ্রোহে উস্‌কানি দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রণী বিডন-স্কোয়ারের (জনসভার) কণ্ঠ-রোধ বহু পূর্বেই করা উচিত ছিল।" 'দ্য প্রিভেনশন্ অফ সিডিশাস মীটিংস্ অ্যাক্ট' (১ লা নভেম্বর, ১৯০৭-এ চালু) নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে কোনও রকম বাছবিচারই করছিল না এবং উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করতেও বিফল হয়েছিল। আর, হিন্দুমাত্রেই যে ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্যহীন—এ ধারণা পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উচিত মুসলমান সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত প্রশ্রয়দানের নীতি পরিত্যাগ করা। চরমপন্থীদের সঙ্গে নির্বিচার বয়কট ও ছাত্র রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে মতপার্থক্য সত্ত্বেও গোখ্‌লে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ তা সুযোগ করে দিয়েছে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মের। কংগ্রেস মঞ্চে চরমপন্থীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ এড়াতে চেয়েছিলেন বলেই প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা থেকে বিরত থাকতে হয়েছিল গোখ্‌লেকে।[৫৯] যে সব ন্যূনতম শর্তে তিনি সরকারী সংস্কার নীতির সমর্থনে রাজী ছিলেন সেগুলির মধ্যে ছিল বঙ্গ-ভঙ্গ রদ, লাজপতের মুক্তি এবং বড়লাটের শাসন পরিষদে অন্ততপক্ষে একজন ভারতীয়ের অন্তর্ভুক্তি। সে ভারতীয় কোন সিভিলিয়ান হলে চলবে না।[৬০]

মিন্টো স্বীকার করেছিলেন যে লাজপতের মতো অশ্বিনী দত্তের ব্যাপারেও তাঁর ভুল হয়েছে। বরিশালে যে ব্যাপক অশান্তি দেখা দিয়েছিল তার মূলে শুধু রাজনৈতিক উস্কানিই ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে গড়া ওঠা বহুবিধ অভাব-অভিযোগই কৃষিজীবীদের আন্দোলনের পথে ঠেলে দিয়েছিল। নিজ ধারণায় খাঁটি বিপ্লবী হলেও অশ্বিনীকুমার ছিলেন চরিত্রে নিষ্কলুষ এবং যুক্তি মেনে নিতে দ্বিধাহীন।[৩১] বরিশাল বাদে গোটা বাংলা নিরুত্তাপ। মডারেটদের দলে টানার এইটেই হয়তো শেষ সুযোগ বলে মনে করেছিলেন মিন্টো। অসুবিধে দেখা দিয়েছিল অন্যত্র। নরমপন্থীদের অবিসংবাদিত নেতা কে—তা ঠিক করা সরকারের পক্ষে সহজ ছিল না। গোখ্‌লে নিঃস্বার্থ ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি ছিলেন কিছুটা দুর্বলচিত্তের মানুষ, দৃঢ় মনোবল-সম্পন্ন নেতা হবার উপাদানের কিছুটা ঘাটতি ছিল তাঁর চরিত্রে।[৩২] তিনি কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হবেন কি না সে বিষয়ে মিন্টোর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাঁর সংশয় আরও বেড়ে যায় গোখ্‌লের এই উক্তিতে যে চরমপন্থীরা সারা দেশে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরী করেছে তার মধ্যে নরমপন্থার আদর্শ প্রচার তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, কেউ-ই তাঁর কথায় কর্ণপাত করবে না।[৩৩] তদুপরি শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নির্বাচনের যে পরিকল্পনা সরকার করেছিলেন গোখ্‌লেকে তার বিরূপ সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছিল। ওয়েডারবার্নকে তিনি যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিলেন তার থেকে (মিন্টোর মতে) এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে "রাজনীতির এই খেলায় তিনি হেরে গেছেন, এবং তাঁর ধারণা হয়েছে যে তাঁর দল ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় আমরা মনোযোগী হয়েছি এবং তার ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর আর বিশেষ কিছু করার নেই।"[৩৪] মর্লের অভিমতটাও বিশেষ আলাদা ছিল না। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "দলীয় সংগঠক হিসেবে গোখ্‌লে নিতান্তই অপরিণত। ওকোনেল ও পার্‌নেল-এর মধ্যবর্তী সময়ে যে সমস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর আইরিশ রাজনৈতিক নেতাদের আমরা দেখেছি গোখ্‌লে তাঁদের মতোই প্রায় সময়ে নাকে কান্না কাঁদেন।"

গোখ্‌লের অবস্থা মর্লে যথাযথভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। "গোবেচারা এই বিপ্লবী নেতা একেবারেই বিপ্লবের পক্ষপাতী নন, অথচ তিনি না পারেন নিজের জায়গাটা ছাড়তে, না পারেন বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে।"[৩৫] 'দ্য নিউ পার্টি' (চরমপন্থীরা নিজেদের এই নামেই পরিচয় দিতে শুরু করেছিলেন) কিন্তু সরকারী দমন নিপীড়নের ফলে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। 'কেশরী'তে তিলকের এই হুঙ্কার শোনা গিয়েছিল : "সরকার যদি রুশ-পন্থাই গ্রহণ করতে চান তবে তাঁদের ভারতীয় প্রজারাও রুশদের পথই অনুসরণ করবে।"[৩৬] সর্বপ্রকার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দিয়েছিলেন তিলক এবং বিপিনচন্দ্র। তিলক বলেছিলেন : "নিপীড়িত এবং লাঞ্ছিত হলেও আপনারা চাইলেই এ দেশের প্রশাসন যন্ত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে অকেজো করে দিতে পারেন। যদি একজন লালা লাজপৎ রায়কে নির্বাসনে পাঠানো হয় তবে মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে অপর একজনের উচিত তাঁর স্থান নেওয়া, ঠিক যেমন একজন জুনিয়র কালেক্টর যথাসময়ে একজন সিনিয়রের স্থলাভিষিক্ত হন।"[৩৭] তাঁর বক্তব্য বিশদতর করার জন্য তিলক লিখেছিলেন, "ভারতীয় মাত্রেরই এ তথ্য স্মরণে রাখা কর্তব্য যে মুষ্টিমেয় ইংরেজ ভারতবর্ষের প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন তার কারণ তাঁরা সর্বক্ষেত্রে ভারতীয়দের সহযোগিতা পান। এখন গোটা শাসনযন্ত্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। একজন বিদেশীকে বিতাড়িত করলেই চলবে না। বাসগৃহের চাবিকাঠিটি হস্তগত করা চাই। নিউ পার্টি চায় আপনারা উপলব্ধি করুন যে

আপনাদের ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে আপনাদেরই হাতে।"[৮] মর্লে বুঝলেন কংগ্রেস ভেঙে গেলে সরকারের কাছে গোখ্‌লের আর কোনও মূল্যই থাকবে না। চরম বে-কায়দায় পড়া নরমপন্থীদের ত্রাণের জন্য সরকারের পক্ষে কিছু করা দরকার। প্রথম দফার সংস্কার প্রবর্তনের দিনক্ষণ তাই হিসেব করেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। অগষ্টে দুজন ভারতীয়—কে· জি· গুপ্ত এবং জি· এইচ· বিলগ্রামীকে—মর্লে তাঁর পরিষদ-সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, শাসন বিষয়ক বিচক্ষণতার চেয়ে এঁদের চামড়ার রং-এর মূল্য তাঁর চোখে ছিল অনেক বেশি। এই সঙ্গেই লাজপৎ এবং অজিত সিং-এর মুক্তিদানের ব্যবস্থাও করা হল। এই সমস্ত ঘটনা কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি বন্ধ করেনি। নরম হওয়ার কোনও লক্ষণই চরমপন্থীদের মধ্যে দেখা যায়নি। 'কাউন্সিল অফ চীফ্‌স', পরিষদে সরকার-মনোনীতদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন বন্টনের তীব্র বিরোধিতায় তাঁরা সকলেই সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

১৯০৭-এর অক্টোবরে গোখ্‌লে কংগ্রেসে ভাঙন ঘটবে আশঙ্কা করছিলেন। ওয়েডারবার্নকে তিনি লেখেন, "বর্তমান পরিস্থিতি যতটা খারাপ হওয়া সম্ভব তাই হয়েছে। যদি কংগ্রেস ভাঙে, তাহলে সর্বনাশ ঘটবে, আমলাতন্ত্র তখন বিনা আয়াসে উভয় দলকে দমন করতে পারবে।"[৮৯] তিলকের প্রতিনিধি ডঃ মুঞ্জের সঙ্গে আলোচনা করে গোখ্‌লের প্রতিনিধি বামনরাও বুঝতে পারেন যে নাগপুরে কংগ্রেস ডাকা চলবে না। অ্যালফ্রেড নন্দী লেখেন, "এমন স্থানে কংগ্রেস ডাকতে হবে যেখানে চরমপন্থীদের প্রভাব এত প্রবল নয়।" মেহতা ও ওয়াচা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে কলকাঠি টিপে সুরাটে অধিবেশন স্থানান্তরিত করেন।[৯০] তাঁদের আশা ছিল সুরাট তাঁদের পক্ষে নিরাপদ হবে। এর পরেই লজ্জাজনক ঘটনাবলীর মধ্যে সুরাট কংগ্রেস কেমনভাবে তছনছ হয়ে গিয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে নেভিন্‌সনের লেখাতে। তিলকের দুর্গ নাগপুর থেকে নিজ-প্রভাবাধীন সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশন স্থানান্তরিত করার জন্য মেহতার নানাবিধ কৌশল, জবরদস্তি করে রাসবিহারী ঘোষকে কংগ্রেস সভাপতি করার অপপ্রয়াস দুই পক্ষের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ অবধারিত করে তুলেছিল। আর গোখ্‌লেও ঠিক এমনটিই আশঙ্কা করেছিলেন। অবশ্য তাঁর দোষ মেহতার থেকে খুব কম ছিল না। স্বরাজ, স্বদেশী এবং বয়কট সম্পর্কে কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলির বয়ান পাল্টানোর দায়িত্ব তাঁরই। পরিবর্তিত প্রস্তাবে স্বরাজকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য স্বশাসিত সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আয়ত্তাধীন রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। স্বদেশীর সংজ্ঞাও হয়ে গিয়েছিল সঙ্কীর্ণতর। সম্ভব হলে, বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহারে উৎসাহ-দানকেই এখন থেকে স্বদেশী প্রচার ভেবে তুষ্ট হতে চাইলেন নরমপন্থীরা। বয়কট সম্পর্কে নরমপন্থীদের নতুন প্রস্তাবে বলা হলো, "কংগ্রেসের মতে বাংলাপ্রদেশ বিভক্ত করার বিরুদ্ধে বাঙালীরা প্রতিবাদ স্বরূপ বিলেতী-দ্রব্য বর্জনের যে পন্থা নিয়েছে তা ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং এখনও আছে।" অর্থাৎ নরমপন্থীরা 'বয়কটে'র পরিধির মধ্যে শুধুমাত্র বিদেশী পণ্য বর্জন এবং তা-ও কেবল মাত্র বাংলাদেশে—আনতে চেয়েছিলেন। অবাঞ্ছিত ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, আক্রোশের কথা বাদ দিলেও এটা খুবই স্পষ্ট যে এজাতীয় খাদমেশানো সিদ্ধান্ত চরমপন্থীদের কাছে কোনও মতেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনটা অনিবার্য ছিল, তবে ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো না থাকলে সেটা হয়তো এমন কুশ্রী চেহারা নিত না।[৯১]

সুরাটে কংগ্রেস ভেঙে দু টুকরো হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে সরকারের পক্ষে

সৌভাগ্যজনক বলে উল্লসিত হয়েছিলেন বড়লাট মিন্টো। সে উল্লাস ঝরে পড়েছে তাঁর এই মন্তব্যে : "এতোদিন পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে তাতে চরমপন্থীদের পিছু হটে যাওয়াটা অতি পরিষ্কার হয়ে গেছে, আর বোঝা যাচ্ছে যে নরমপন্থীরা (তাঁদের প্রতি) আমাদের শুভেচ্ছাটাও যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।... এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে আমাদের অসামান্য সাফল্যের অভ্রান্ত নিদর্শন।"[৭২] এদিকে 'রাজনীতির আকাশটা মেঘমুক্ত হয়ে যাওয়াতে' গোখলেও স্বস্তি অনুভব করছিলেন। ডানলপ স্মিথকে তিনি জানান যে উত্তরপ্রদেশ এবং মাদ্রাজে চরমপন্থীরা কখনোই উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে তাদের প্রতিপত্তি সীমাবদ্ধ, আর নেতাদের নির্বাসিত করার পর পঞ্জাবেও তারা ভয়ঙ্কর ভাবে ব্যাহত হয়েছে। এখন তাদের একটিমাত্র ঘাঁটিই আছে—সেটা পূর্ববঙ্গে, এবং ইচ্ছা করলে সরকার জনগণের উপর সহানুভূতি দেখিয়ে তাদের এ প্রভাবটুকুও দূর করতে পারেন।[৭৩] তবে এ সময়ে নরমপন্থী পরিবারেও যে বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল না তা বিভিন্ন দলিলপত্র থেকে জানা যায়। গোখলের চোখে মতিলাল 'ছিঁচকে' ও সুরেন্দ্রনাথ 'আত্মম্ভরী এবং অপদার্থ'। মতিলালও এই বিশেষণগুলি ফিরিয়ে দিতে কসুর করেননি এবং নরমপন্থীদের মধ্যেও যে দুটো গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে সে তথ্যটাও লুকোবার চেষ্টা করেননি।[৭৪]

তবে নিজেদের মধ্যে যতো মতপার্থক্যই থাক কংগ্রেস সংবিধানে পরিবর্তন ঘটানোর মতো ঐক্য নরমপন্থীদের মধ্যে যথেষ্টই ছিল। পরিবর্তিত সংবিধানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য স্বশাসিত সদস্য রাষ্ট্রগুলি যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা ভোগ করে—তা-ই ভারতীয় জনগণের লক্ষ্য বলে বর্ণিত হলো এবং ঐ সব সদস্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমমাত্রায় এবং সমমর্যাদায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব পালনের অধিকারও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চাওয়া হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থীরা যে বড়লাট মিন্টোকে তাঁদের প্রধান সহায় হিসেবে গ্রহণ করছেন তাতে আর কারো সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু বড়লাট কংগ্রেসের এই অভ্যন্তরীণ বাদ-বিসংবাদের সুখস্মৃতি পুরো উপভোগ করার আগেই দেশে সন্ত্রাসবাদের দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটেছিল। প্রথম দফায় বাংলার লেঃ গভর্নর স্যর অ্যানড্রু ফ্রেজারের (৬ই ডিসেম্বর, ১৯০৭) এবং ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি· সি· অ্যালেনের (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০৭) জীবননাশের চেষ্টা হয়। ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮ সালে ঘটল মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণ। তাতে প্রাণ হারান নিরপরাধ দুই ইংরেজ মহিলা, যদিও আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন কলকাতার পূর্বতন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড। কুখ্যাত এই ম্যাজিস্ট্রেট 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তরে'র বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনার সময় সুবিচারের নামে প্রহসন করেছিলেন, সুশীল সেন নামক একটি কিশোরকে নির্মম বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়েছিলেন। এর কিছু পরেই মানিকতলায় বোমা তৈরীর কারখানা আবিষ্কারের ঘটনা মিন্টোর রোষানলে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। ক্ষিপ্ত বড়লাট লিখলেন, "সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যার এমন এক ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে ভারতবর্ষে যা এতাবৎকাল অজ্ঞাত ছিল। এর দৃষ্টান্ত এসেছে পশ্চিম থেকে এবং অনুকরণপ্রিয় বাঙালীরা তা শিশুর মতো অনুকরণ করেছে।"[৭৫] সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করতে লেঃ গভর্নর ফ্রেজারকে বেশি বেগ পেতে হয়নি, আর 'দক্ষ, ধূর্ত, উন্মত্ত' অরবিন্দ ঘোষই যে এদের অবিসংবাদিত নেতা—তা-ও তাঁর জানতে দেরী হয়নি।[৭৬] অরবিন্দের অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের স্বীকারোক্তি থেকে সন্ত্রাসবাদের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের হদিশও পাওয়া যায়। এইসব ঘটনার পরেও 'যুগান্তরের' পৃষ্ঠায় হিংসাত্মক কাজকর্মে প্ররোচনা অব্যাহত

থাকায়[৭৮] সংবাপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য মিন্টো একটা কঠোর আইন (Newspapers—Incitement to Offensive Act, 1908) জারী করেছিলেন। তা ছাড়াও পাশ হলো Indian Explosives Act. Criminal Law Amendment Act (Act XIV of Dec. 1908) দ্বারা স্পেশ্যাল বেঞ্চে সন্ত্রাসবাদের মামলা বিচারের ব্যবস্থা হলো এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সমিতির উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী হলো। এর পর নির্বাচনের কথা তিনি শুনতেও রাজী ছিলেন না ; রাজী ছিলেন না কোনও কংগ্রেসওয়ালাকে তাঁর পরিষদে গ্রহণ করতে, এমন কি গোখ্‌লে বা রমেশচন্দ্র দত্তের মতো নরমপন্থীকেও নয়।

সন্ত্রাসবাদীদের বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনা কিন্তু মর্লের মনে বিশেষ রেখাপাত করেনি। নির্বিচার দমননীতিতেও তাঁর আস্থা ছিল না। এ কথা লিখতে তাঁর বাধেনি যে, "কিংসফোর্ড-এর আদেশে বেত্রাঘাতের ঘটনা ন্যক্কারজনক", আর একটা প্রচার পুস্তিকা প্রকাশের জন্য সাত বছরের কারাদণ্ডদান "কশাকদের অমানুষিক রীতিনীতির-কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৭৯] মানিকতলার বাগান বাড়িতে বোমা ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধান লাভ এবং ঐ সমস্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ হওয়ার পর[৮০] তিনি সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইনটিতে সম্মতি দিয়েছিলেন (এটি বলবৎ হয় ১৯০৮-এর ৮ই জুন)। 'কেশরী'তে ১২ই মে ও ৯ই জুন, ১৯০৮ তারিখে প্রকাশিত রচনার জন্য[৮১] তিলকের বিচারের উদ্যোগও মর্লেকে অসন্তুষ্ট করেছিল। মিন্টোর ক্রোধ কিন্তু তখনও প্রশমিত হয়নি। তিনি লিখেছিলেন, "তিলকের মতো উগ্ররাজনীতিকের প্রতি সদাশয়তা দেখানোর সময় এটা নয়, আর এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে ৯ই জুন 'কেশরী'তে প্রকাশিত রচনটির জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা সম্পর্কে বোম্বাই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত।" কিন্তু তিলকের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত এবং তড়িঘড়ি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিন্টোর তৎপরতা মর্লেকে স্পর্শ করতে পারেনি। হয়তো কিছু শ্লেষ ছিল তাঁর এই উক্তিতে, "এটা স্বাভাবিক যে ওঁরা তিলককে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেন কেন না জুরী নির্বাচনটা ঐ উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।" তিলকের শাস্তি যে লঘু হবে না তা-ও জানা ছিল ভারত সচিবের। (তিলককে ৬ বছর মান্দালয় জেলে রুদ্ধ থাকার দণ্ড দেওয়া হয়।) আর নরমপন্থীদের মনে এ ঘটনার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কাও তাঁর মনে উঁকি দিয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনার পর নরমপন্থীদের হাতে রাখা যে সহজ হবে না তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।[৮২] নিজেদের অস্তিত্ব না হলেও, সম্মান ও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য নরমপন্থী নেতারা সুনিশ্চিতভাবে এই দণ্ডাজ্ঞার নিন্দা করবেন (যেমন ওঁরা লাজপৎ রায়ের ক্ষেত্রে করেছিলেন), আর এই জটিল পরিস্থিতিতে সংস্কারের ব্যাপারটাই পণ্ড হয়ে যাবে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক (র‍্যাঙ্কিন) এই মন্তব্য করেছিলেন যে, "এটা (তিলকের কারাদণ্ড) ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে।" দুর্ভাগ্যের শেষ তখনও হয়নি। বোম্বাইতে হাঙ্গামার সময় পাথর ছোঁড়ার অপরাধে ধৃতদের ১ বছরের কারাদণ্ড আর তিনেভেল্লি ও টুটিকোরিন-এর অপরাধীদের নির্বাসন দণ্ড, অনেকের বিচারে, অমানুষিক বলে মনে হয়েছিল। মর্লে মিন্টোকে লিখেছিলেন, "শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চয়ই আমাদের বজায় রাখতে হবে কিন্তু নিপীড়ন দিয়ে তো সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, উল্টে তা-ই সন্ত্রাসবাদের পথ প্রশস্ততর করে তুলবে। মিন্টোর মতো একজন সুখ্যাত হুইগ, মর্লের মতো সুপরিচিত উদারনৈতিক, কি এল্‌ডন, সিডমাথ, সিক্স অ্যাকটস্-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিজেদের জীবন সাঙ্গ করবেন?" ভাইসরয়ের কাছে ভারত সচিবের এটাই ছিল প্রশ্ন।

শেষ পর্যন্ত যখন ১লা অক্টোবর, ১৯০৮ সালে রিফর্ম ডেসপ্যাচটি (এটির প্রণয়নে মিন্টো

এবং রিজলের ভূমিকাই ছিল প্রধান) মর্লের হাতে পৌঁছল, তিনি হতাশ হয়ে দেখলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিকূলতার অজুহাতে ভারত সরকার লেঃ গভর্নরদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন ও বোম্বাই ও মাদ্রাজের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্য গ্রহণের বিষয়টি স্থগিত রেখেছেন। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে দেশীয় সদস্যগ্রহণের প্রশ্নটা ঐ ডেসপ্যাচে মিন্টো অন্তর্ভুক্ত করেননি কেননা ভারতসচিবই পূর্বাহ্নে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে এই বিষয়টির জন্য নতুন করে আইন তৈরীর দরকার হবে না। একটা পরামর্শদাতা পরিষদের উল্লেখ থাকলেও তা নিয়ে বড়লাটের খুবএকটা মাথাব্যথা ছিল না। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে সরকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছিল যদিও প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যা প্রায় সমান করে (কিন্তু কাস্টিং ভোটদানের অধিকার গভর্নরের হাতে রেখে) সরকারী আধিপত্যকে মোলায়েম করার একটা উপায় অবলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের কোনও উল্লেখই ছিল না এই দলিলে। ভারতীয়রা যে পার্লামেন্টারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অনুপযুক্ত মিন্টোর এ ধারণাটা অটুট ছিল। বিশ্বস্ত এবং সুযোগ্য ব্যক্তি বিশেষকেই তিনি আইন তৈরীর ব্যাপারে কিছু অধিকার দিতে তৈরী ছিলেন।[৮৫] রিজলের মতে খুব বেশি লোককে ভোটাধিকার দিলে জাতপাতের প্রভাব খাটানো হবে। মিন্টোর অভিমতটা ছিল এই রকম : "ইম্পিরীয়াল কাউন্সিলের আয়তন বৃদ্ধি ঘটায় ভারত সরকারের উচিত এ বিষয়ে খেয়াল রাখা যে ১৮৯২-এর শাসন সংস্কারের মতো এখনও নির্বাচকমণ্ডলী যেন শুধু চাকরী বা অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির কাজেই আত্মনিয়োগ না করে। তা ছাড়া নতুন নতুন নির্বাচনক্ষেত্র গঠন করা উচিত যাতে এতাবৎ প্রতিনিধিত্বের অধিকার-বঞ্চিত মুসলমান সম্প্রদায়, ভারতীয় বণিক ও ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত হয়।" বড়লাটের আশা ছিল এদের দিয়েই বৃত্তিজীবী শ্রেণীর অত্যধিক প্রভাব প্রতিপত্তি ঠেকানো যাবে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, "ইম্পিরীয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যে ২৮ জন সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে আসবেন তাঁদের মধ্যে ১২ জন মনোনীত হবেন প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলি থেকে, ৭ জন প্রধান প্রধান প্রদেশগুলির ভূস্বামী শ্রেণী থেকে, ৫ জন মুসলমান সম্প্রদায় থেকে (প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা না গড়ে ওঠা পর্যন্ত ৪ জন মুসলমান হবেন নির্বাচিত, ১ জন মনোনীত), ২ জন বাংলা ও বোম্বাই-এর চেম্বার অফ কমার্স থেকে এবং ২ জন ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে। প্রাদেশিক পরিষদগুলির নির্বাচনক্ষেত্র গঠিত হবে : (১) বড় বড় শহরগুলির মিউনিসিপ্যাল বোর্ড দ্বারা, (২) জেলাবোর্ড সহ ছোটখাটো শহরগুলির অনুরূপ বোর্ড দ্বারা, (৩) জমিদারদের মধ্য থেকে, (৪) ইউরোপীয় ও ভারতীয় চেম্বার অফ কমার্স দ্বারা, (৫) বিশ্ববিদ্যালয় গুলির দ্বারা, (৬) মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এবং (৭) চা ও পাট শিল্পের মতো বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত বণিকদের মধ্য থেকে।[৮৬] হাউস অফ লর্ডস-এ ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বিষয়ে ঘোষণার সময় (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৮) মর্লে স্বীকার করেছিলেন যে "নির্বাচনের কোনও ব্যবস্থাই এই প্রস্তাবে স্থান পায়নি। কয়েকটি বেসরকারী জনপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটের সুপারিশে বড়লাট যে মনোনয়ন করবেন তা-ই হবে এক্ষেত্রে নির্বাচনের বিকল্প।"

রিফর্মস্ ডেসপ্যাচের ভূমিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় বড়লাট কেন সংস্কারের প্রতি বীতরাগ হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় কলকাতা ও লাহোরে বোমা তৈরীর কারখানা আবিষ্কার, মধ্যপ্রদেশ, বাংলা ও বরোদার মধ্যে গোপন সংবাদ আদান-প্রদান ও

কলকাতায় সন্ত্রাসবাদীদের একটা কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপনের খবর এবং 'যুগান্তরে' বিদ্রোহের নিত্য জয়গান তাঁকে উত্যক্ত করে তুলেছিল।[৮৫] বহু প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী সাহেব সন্ত্রাসবাদীদের নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞার জন্য সোরগোল তুলেছিলেন। রাজদ্রোহের 'চাঁই' তিলক যে ৬ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে আপীল করার সুযোগ দেওয়া হয়নি—এতে মিন্টো কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করেন। কিন্তু ক্ষুদিরামের মামলায় জজদের ঢিমে তালে কাজ এবং কলকাতা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসের 'দুর্বলতা' তাঁর মেজাজ খারাপ ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। কমন্স-এ যে তাঁর দমননীতির প্রতিকূল সমালোচনা হচ্ছিল, তার জন্যও বড়লাটের বিক্ষোভের অন্ত ছিল না। তিনি লিখেছিলেন, "(ভারতবর্ষে) যে সমস্ত ক্ষেত্রে কঠোর দণ্ড দেওয়া হচ্ছে ইংলণ্ডে তার সমালোচনা বা রাজনৈতিক অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন বর্তমান পরিস্থিতিকে জীইয়ে রাখবে মাত্র।"[৮৬] শাসনতান্ত্রিক সংস্কারকে অগ্রাধিকার দানের জন্য মর্লে তাঁকে যে অহরহ তাগাদা দিচ্ছিলেন মিন্টো তার প্রতি বধির হয়ে উঠেছিলেন। "আমি এ বিষয়ে (তাঁর সঙ্গে) একমত হতে পারি না। যতদিন ব্রিটিশজাত তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবে ততদিন ভারতবর্ষে ব্রিটিশরাজের অবলুপ্তির কোনও আশঙ্কা নেই—কেন না এর জন্য যদি শক্তি প্রয়োগের দরকার হয় আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেই তা করবো"—এই ছিল বড়লাটের ঘোষণা।[৮৭] বিরক্তি ফুটে উঠেছিল তাঁর এই কটু মন্তব্যে : "হিণ্ডম্যান এবং হার্ডি গোখ্‌লে এবং দত্তের (রমেশচন্দ্র) কথায় নাচছেন, অথচ সমগ্র ভারতবর্ষের হয়ে কথা বলার কোনও অধিকারই তাঁদের নেই।" সংস্কারের মাধ্যমে এ জাতীয় লোকেদের প্রভাববৃদ্ধির কোনও বাসনা তাঁর নেই। তাঁর মনোভাব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই কথায়, "উনিও (গোখ্‌লে) যে একজন মারাঠি ব্রাহ্মণ এ কথার ব্যাঞ্জনা অনেক।"[৮৮] মিন্টোর বিচারে সংস্কার যদি আদৌ করতে হয় তা হলে তা করা উচিত এমন মানুষের জন্য যাঁদের ভাগ্য, ভালমন্দ, দেশের মাটির সঙ্গে জড়িত। তাঁর মতে এই তালিকায় স্থান পাবার যোগ্য ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব, বর্ধমানের মহারাজা, গিধৌর-এর মহারাজা, প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এবং মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—যাঁরা সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার জন্য অ্যানড্রু ফ্রেজারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। সোজা কথা মর্লে ও মিন্টোর কাছে সংস্কারের তাৎপর্য ছিল ভিন্ন এবং কাদের স্বার্থে সংস্কার প্রবর্তন করা হবে—তা নিয়ে দুজনের মতে একটুও মিল ছিল না।

মর্লের বিচারে সন্ত্রাসবাদ নয়, ভারতবর্ষের আর্থিক সামাজিক সমস্যাগুলোর গুরুত্বই ছিল বেশি এবং এ জন্য বোমা ছোঁড়ার ঘটনাগুলোকে তিনি ব্যাধি নয়, ব্যাধির উপসর্গ বলেই মনে করতেন। ১৭৮৯-র ফ্রান্সের Jacquerie-র ঐতিহাসিক মর্লে ভারতের বিক্ষুব্ধ কৃষক সমাজকেই অশান্তির প্রবলতম রাজনৈতিক কারণ বলে বর্ণনা করে প্রকৃত সত্যটা উদ্‌ঘাটন করেছিলেন।[৮৯] তাছাড়া ভারতসচিব লিখেছিলেন, "বাংলাদেশে, আমি যা বুঝেছি, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের—যাঁদের মধ্য থেকে রাজনীতিবিদদের আবির্ভাব ঘটছে—আয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একেবারে বাঁধা। এদের কেউ সরকারী চাকরী করেন, কেউ-বা জমিদারের কাছারিতে, এবং জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়াতে এঁরাই অত্যন্ত দুর্দশায় পড়েছেন।"[৯০]

সুখের কথা ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা সন্ত্রাসবাদের আবির্ভাবে অত্যধিক উদ্বিগ্ন না হয়ে সংস্কার প্রবর্তনের বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। ১৯০৮-এর ২৭শে নভেম্বরের ডেসপ্যাচে আমলাতন্ত্রের সঙ্কীর্ণ ধ্যান-ধারণার গণ্ডীর বাইরে আসার জন্য ভারত সরকারের কাছেও নির্দেশ পাঠানো হয়। প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে সরকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করার যে প্রবল বাসনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল তা গোটা সংস্কার পরিকল্পনার পক্ষেই বেসুরো,

আর প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারের হাতে ভেটো প্রয়োগের অধিকার থাকায় ঐ ব্যবস্থার কোনও প্রয়োজনই নেই। 'কাউন্সিল অফ চীফ্‌স' গঠনের যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, কংগ্রেসের অস্তিত্ব ও মর্যাদার পক্ষে অসঙ্গত বলে তাও বাতিল করা উচিত, যদিও দেশীয় নৃপতিবর্গের সম্মান রক্ষার খাতিরে প্রস্তাবটি বর্জনের সময় অনাবশ্যক রূঢ়তা এড়িয়ে চলা যুক্তিযুক্ত। ভারত সরকারের প্রস্তাব ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন যা মুসলমানদের ইম্পিরীয়াল এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রতিনির্ধি নির্বাচনের সুযোগ দেবে।[১১] এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হিন্দুদের অবধারিত প্রতিবাদ বিষয়ে অবহিত হয়ে মর্লে প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলী প্রবর্তনের প্রস্তাব দেন। এর সদস্যরা বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় (ভূস্বামী, লোকাল ও জেলাবোর্ডের সদস্য, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সদস্য) থেকে এমন সংখ্যায় আসবেন যে সংখ্যালঘুরা একমত হলে তাঁদের প্রতিনিধিদের সুনিশ্চিত ভাবেই পাঠাতে পারবেন। জনসংখ্যার অনুপাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান এই মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলীতে নির্বাচিত হবেন এবং এঁরা প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় থেকে সমানানুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।[১২] মর্লে আরও একটু এগিয়েছিলেন। ১৮৯২ সালের সংস্কার আইনে পরিষদের সদস্যদের প্রশ্ন উত্থাপনের যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল তিনি তার সঙ্গে সম্পূরক প্রশ্ন করার অধিকার যুক্ত করে আলোচনার স্বাধীনতা প্রবর্তন করতে চান। তা ছাড়া তিনি বোম্বাই এবং মাদ্রাজের শাসন পরিষদের সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে ৪ জন করতে চেয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে একজন অবশ্যই হবেন ভারতীয়। দমননীতি প্রসঙ্গে ভারতসচিব এই মন্তব্য করেছিলেন যে ভারত সরকারের এটাকে সৌভাগ্য বলেই মনে করা উচিত যে রুশ নৈরাজ্যবাদীদের তুলনায় লাজপৎ রায়, তিলক এবং পাল ছিলেন নিতান্তই 'মাইল্‌ড্ হুইগ।' তাছাড়া, অকারণ ও অত্যধিক উগ্র দমননীতি প্রয়োগ করে, শুধুমাত্র সন্দেহের বশে ও উপযুক্ত প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও নির্বাসন-দন্ডাজ্ঞা দান করলে (সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, সতীশ চ্যাটার্জি, ভূপেশ নাগ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও পুলিন দাস প্রভৃতিকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল) পার্লামেন্টের লিবারেল-ইউনিয়নিষ্ট-র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠীকে অহেতুক রুষ্ট করা হবে।[১৩]

এতোদিন পর্যন্ত মর্লে উদারনীতির পথ থেকে বিচ্যুত হন নি। কিন্তু এই সময়েই লণ্ডনে আমির আলির নেতৃত্বে এক মুসলমান প্রতিনিধিদল এসে উপস্থিত হলেন। ব্রিটিশ রক্ষণশীলদের একাংশ এবং 'দ্য টাইমস্' পত্রিকার মতো প্রভাবশালী সংবাদপত্রের সমর্থন-পুষ্ট হয়ে এঁরা ভারতসচিবের উপর রীতিমতো চাপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেন। নিজ বিচারবুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী যে পথকে সঠিক বলে মর্লে এতোকাল অনুসরণ করেছিলেন এবার তাঁকে তার থেকে কিছুটা সরে আসতে দেখা গেল। আমির আলি ডেলিগেশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলী'র প্রস্তাব বর্জনে মর্লেকে রাজী করানো। পৃথক নির্বাচন নীতির বদলে মর্লে ম্যাকডোনেল—পরিকল্পনাটিই গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে হিন্দু ও মুসলমানদের একই সঙ্গে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আলিগড়-পন্থী না হলেও আমির আলি অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। বস্তুতঃ তাঁর মুসলিম কনফারেন্স স্যার সৈয়দের মহামেডান এডুকেশনাল কংগ্রেসের পরিপূরক ছিল।[১৪] তার উপর, নির্বাচক-মণ্ডলীর (electoral college) পরিকল্পনা বাতিলের জন্য মিন্টোও ক্রমশ মর্লের কাছে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করেছিলেন। অমৃতসর অধিবেশনে মুসলীম লীগের

বিক্ষোভ ও বিরূপ সমালোচনার সংবাদও তিনি ভারতসচিবের কাছে পাঠাতে কসুর করেননি। মিন্টোর পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এই রকম : "মুসলমানরা এর (মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলী) বিরুদ্ধে খুবই আপত্তি জানাচ্ছেন। তাঁদের আশঙ্কা ধূর্ত আইনজীবীরা এমনভাবে নির্বাচক-মণ্ডলীর নিয়মকানুন কাজে লাগাবেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাঁদেরই নির্বাচিত করবেন—তাঁরা মুসলমান বা অন্য যে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায় ভুক্তই হোন না কেন,বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা ধুরন্ধর রাজনীতিক-আইনজীবীদের ক্রীড়নকে পরিণত হবেন।"[৯৫] মুসলমানদের আশঙ্কা যে তিনিও অমূলক বলে মনে করতেন না তা তাঁরই পরবর্তী চিঠিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "(মর্লে) পরিকল্পিত নির্বাচন যে পরিস্থিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হবার কথা তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে মুসলমানদের আপত্তিটা মিথ্যে ওজর বলে আমি নস্যাৎ করে দিতে পারি না।" এভাবে নির্বাচিত মুসলমান সদস্যরা হয়তো কার্যক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বার্থ সংরক্ষণে আগ্রহী হবেন না।[৯৬] দ্বিতীয়ত, এ আশঙ্কাও থেকে যায় যে রাজানুগত, রক্ষণশীল মুসলমানদের বাদ দিয়ে অস্থির, তরুণতর মুসলমানদেরই নির্বাচিত করা হবে।[৯৭] তৃতীয়ত, প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় একটি বিশেষ সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থাই নেই, অথচ ১৯০৬ সালে আগা খাঁর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিবর্গকে বড়লাট ঠিক ঐ প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন। এই সমস্ত কথা ছাড়াও ডানলপ স্মিথ অনবরত ঢাকার নবাব, মহম্মদ শফি প্রমুখ খানদানী মুসলমানদের অসন্তোষের কথা বলে মিন্টোর কান ভারী করে তুলেছিলেন। এর সবটাই অসত্য ছিল না। 'ডেকান প্রভিন্সিয়াল মুসলীম লীগে'র প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রদায়-ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি বাতিল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন বোম্বাই-এর গভর্নর ক্লার্ক (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০৮)। তাঁর অভিমত যে মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল অল ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগের সভাপতির ভাষণে।[৯৮] মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন ব্যাপারে মিন্টো নিঃসঙ্গ ছিলেন না। তাঁকে সমর্থন করার জন্য সব সময়েই তৈরী ছিলেন অ্যাডাম্‌সন এবং অ্যানড্রু ফ্রেজার। প্রাদেশিক সরকারগুলিও, কখনো স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, কখনো বা বড়লাটের প্রচ্ছন্ন নির্দেশে, তাঁরই মতবাদের প্রতিধ্বনি করতে শুরু করেছিল। রক্ষণশীল দলে তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় স্বয়ং রাজাকেও মর্লের নীতির বিরোধী করে তোলেন মিন্টো।

প্রভাবশালী মহলের এ ধরনের সহানুভূতি পেয়ে আমির আলি ডেলিগেশন মিশ্র-নির্বাচক মণ্ডলী প্রবর্তনের প্রস্তাব বাতিল করার দাবী করেন। তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি সেবা ও আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ মুসলমানদের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা এবং ভাইসরয়ের পরিষদে একজন দেশীয় সদস্য গ্রহণের বদলে একজন দেশীয় পরামর্শদাতা নিয়োগের দাবীও তাঁরা করেন। শেষের দাবীটির সংকেত-সূত্র তাঁরা পেয়েছিলেন কার্জন, লোভাট ফ্রেজার এবং ল্যান্সডাউনের কাছ থেকে। আমির আলি দাবী করে বসেন যে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে একজন হিন্দু সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সাম্প্রদায়িক সমতা রক্ষার জন্য ঐ পরিষদে একজন মুসলমান সদস্যকেও গ্রহণ করতে হবে।

এ জাতীয় বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতে চরিত্রবল ছিল না মর্লের। মিন্টোকে লেখা অ্যানড্রু ফ্রেজারের একটা চিঠি (১৯০৯, ২৯শে জানুয়ারী) থেকে জানা যায় যে ২৭শে জানুয়ারী আমির আলি-ডেলিগেশনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগেই 'মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলীর পরিকল্পনাটা আঁকড়ে থাকার কোনও বাসনা' মর্লের ছিল না। সেটিকে তাঁর 'অভিলাষের আভাস মাত্র' বলে মুসলমান প্রতিনিধিবর্গকে তিনি জানিয়েছিলেন।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে মুসলিম সদস্যগ্রহণ ছাড়া 'ডেপুটেশনিস্ট'দের সব দাবীই তাঁকে মেনে নিতে দেখা গিয়েছিল। তবে মুসলমানদের প্রতি এত দরদ থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে স্বয়ং মিন্টো আপত্তি জনিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল : "শুধুমাত্র ভারতীয় বলেই কোনও ভারতীয়কে আমি আমার পরিষদে গ্রহণ করতে রাজী নই।" জাতির ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের অধিকারের স্বীকৃতি দান নয়, জাতি বিশেষের অনুপযুক্ততা অস্বীকার করাই ছিল তাঁর মূল কথা।[৯৯] স্ট্যাটুটের দ্বারা কাউকে নিয়োগের ব্যবস্থায় মিন্টোর সায় ছিল না, কারণ তা হলে জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবীই শুধু মেনে নেওয়া হবে না, তা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-ধর্মের মধ্যে ঐ পদের জন্য অস্বাস্থ্যকর রেষারেষি সৃষ্টি করবে। ভারতীয় সদস্যকে আইনমন্ত্রক দেওয়া স্থির হয়। মিন্টো প্রথমে স্যর আশুতোষ মুখার্জিকে মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু 'গোঁড়া', 'কালো' এবং ব্যারিষ্টার নন বলে উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গদের তাঁকে পছন্দ হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর মনোনয়ন বাতিল করে স্যর এস· পি· সিংহকে ঐ পদে বসানো হয়। তবে রক্ষণশীল দলের অধিকাংশ সদস্যের সঙ্গে রাজা সপ্তম এডোওয়ার্ডও ভাইসরয়ের শাসন-পরিষদে একজন 'নেটিভ সদস্য' নিয়োগের ব্যাপারটাকে 'দুভার্গ্যজনক' এমন কি 'বিপজ্জনক' বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। ভারত সম্রাট প্রস্তাবটিতে সম্মতি দেন নিজের অনিচ্ছা জানিয়ে।[১০০]

মুসলমান সম্প্রদায়কে অত্যধিক সুবিধাদানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভালভাবেই সচেতন ছিলেন মর্লে। 'মিশ্র-নির্বাচক মণ্ডলী'র প্রস্তাবটা বাতিল করার সময় তিনি ভাইসরয়কে এই কথা লিখে সাবধান করে দিয়েলিন যে, "আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে মুসলমানদের হাতে রাখতে গিয়ে আমরা যেন হিন্দুদের দূরে ঠেলে না দিই।"[১০১] সে আশঙ্কা ছিলও। ফেব্রুয়ারীতে মুসলমানদের দাবী অনুযায়ী 'ডাবল-ভোটিং'ও তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল। বিলটির দ্বিতীয় দফায় আলোচনার সময় তাঁকে 'ওয়েটেজ' (বা বাড়তি সুবিধা)-এর ব্যাপারটাও হজম করতে হয়। নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণাগুলো এভাবেই অসম্মানিত হতে থাকে। নির্বাচনের সংজ্ঞা নিয়ে ইণ্ডিয়া অফিস ও ভারত সরকারের মধ্যে মতান্তর আর কারো কাছে গোপন থাকে নি। নির্বাচন ব্যবস্থাটাই ভারত সরকারের মনোমতো ছিল না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে ৩৩৮ জন বেসরকারী সদস্য প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ৩৬% শতাংশ্ব ছিলেন আইনজীবী, ২২% শতাংশ ভূস্বামী। ১৮৯২ সালের ব্যবস্থাটাতেই যদি উকিলরা (মিন্টো এবং তাঁর আই· সি· এস বাহিনী এঁদেরই ভয় পেতেন বেশি) এ জাতীয় প্রাধান্য পেয়ে থাকেন তা হলে ঐ ব্যবস্থা ব্যাপকতর হলে গোটা দেশ তাঁদের কবলে পড়বে বলে বড়লাটের গভীর দুশ্চিন্তা হয়েছিল। এ জন্যই ভূস্বামী ও মূলধনী শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন মিন্টো। তিনি আশা করেছিলেন—তাঁর 'দুচোখের বিষ' উকিলদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এ ভাবেই খর্ব করা যাবে।[১০২] এ নিয়ে মিন্টোকে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতাই ভুল পথে চালিত করেছিল। কোনও সমাজতাত্ত্বিকই আইনজীবীদের একটা শ্রেণী হিসেবে গণ্য করবেন না। আর, কোনও উকিলের পক্ষে জমিদার হওয়া বা জীবিকার সূত্রে জমিদারদের সঙ্গে যুক্ত হওয়াও তো অসম্ভব ছিল না। বেইলি এলাহাবাদে উকিল ও রইস শ্রেণীর মধ্যে পৃষ্ঠপোষক - পৃষ্ঠপোষিতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করেছেন। এই সহজ সম্ভাবনার কথা মনে থাকলে মিন্টো হয়তো উপলব্ধি করতে পারতেন যে অতিরিক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সংস্কারোত্তর আইন সভাগুলিতে উকিলদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়েই যাবে।[১০৩] যাই হোক, ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে, যখন পার্লামেন্টে 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস'

বিলটি পেশ করা হয়েছে, তখনও ইম্পিরীয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে 'নির্বাচিত সদস্য' বলতে মিন্টো তাঁদেরই বুঝতেন যাঁদের প্রাদেশিক পরিষদগুলির বেসরকারী সদস্যগণ কর্তৃক বচিত ও সমর্থিত নামের তালিক৷ থেকে তিনি স্বয়ং মনোনীত করবেন। সরকারের বক্তব্য ছিল : "ভাইসরয়ের এই ক্ষমতাটা অটুট রাখাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। এটা বাতিল করলে নির্বাচন পরিচালনার জন্য আবার একটা প্রশাসনিক যন্ত্র গড়ে তুলতে হবে (এখনো পর্যন্ত যার কোনও অস্তিত্বই নেই)। এদেশে আমরা শাসনতান্ত্রিক প্রগতির পথে যে পদক্ষেপ করতে যাচ্ছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাছে এটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে মনোনয়ন করা বা না-করা সম্পর্কে ভাইসরয়ের যে চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে তাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত হবে না। বর্ধিত সংখ্যায় জনপ্রতিনিধিত্বেব যে ব্যবস্থা আমরা পত্তন করতে যাচ্ছি যতোদিন পর্যন্ত না তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ কিছু অভিজ্ঞতা হচ্ছে ততোদিন এই ব্যবস্থাই বলবৎ থাকা বাঞ্ছনীয়।" স্মবণ করা যেতে পারে যে মিন্টো বোম্বাই এবং মাদ্রাজের শাসন পরিষদে একজন করে (দুজন নয়) অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ঐ দুটি প্রদেশের গভর্নবদ্বয়—ক্লার্ক এবং ললে—ভারতীয়দের সদস্যরূপে মনোনয়নে আপত্তি জানিয়েছিলেন। সে জন্য তিনিও এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। ভাবতসচিবকে তিনি লিখেছিলেন ,"এই পরিষদগুলিই তো ভারতবর্ষ শাসনের প্রকৃত দায়িত্ব পালন করছে, তাদের কোনও মতেই আমরা দুর্বল করে দিতে পারি না।"[১০৪]

নির্বাচন সম্পর্কে মর্লের অনমনীয় মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হয়েও মিন্টো নাছোড়বান্দার মতো তার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। তিনি নতুন একটা ওজরও তুললেন—রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যোগ্যতা অযোগ্যতার যুক্তি। তাঁর গভীর সন্দেহ হয়েছিল যে প্রচলিত আইনকানুনের সাহায্যে ভারত সরকার চরমপন্থীদের অনুপ্রবেশ রুখতে পারবে না। সতর্কতার খাতিরে তিনি এ বিষয়ে পূর্বাহ্নে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা দাবী করে বসলেন।

ইতিমধ্যে হাউস অফ লর্ডস-এ রিফর্মস বিলটি উত্থাপিত হয়েছিল (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯)। রক্ষণশীল লর্ডদের মর্লে এই বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন : "এ বিল যদি ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা পত্তন করার ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ হতো অথবা এই সংস্কার প্রচেষ্টার অধ্যায়টি প্রত্যক্ষ বা অনিবার্যভাবে ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সহায়ক হতো, তা হলে আমি অন্তত এর সঙ্গে কোনও ভাবেই জড়িত থাকতাম না।"[১০৫] কিন্তু তাঁর আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও রক্ষণশীল গোষ্ঠীর প্রবল আপত্তির জন্য তৃতীয়বার আলোচনান্তে ৩ নং ধারাটি (লেফ্‌টেনান্ট গভর্নরের শাসন পরিষদ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক) বাতিল করে দেওয়া হয়। ভারত সচিব অবশ্য ভালো ভাবেই জানতেন যে কমন্স-এ এর বদলা তিনি নিতে পারবেন। কলকাতার টাউন হলে আহূত হিন্দু-মুসলমানের এক সম্মেলন (৮ই মার্চ, ১৯০৯) হাউস অফ লর্ডসের কাছে ৩ নং ধারাটি পুনরায় রিফর্মস বিলের অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানায়। এই সুযোগেই মিন্টো অবিলম্বে বাংলায় একটি শাসন-পরিষদ স্থাপনের জন্য মর্লের কাছে দাবী করে বসেন। শেষ পর্যন্ত একটা ঘোষণার মাধ্যমে মিন্টোকে প্রতিশ্রুতি দানের বিনিময়ে (অবশ্যই পার্লামেন্টের অনুমতি সাপেক্ষে) মর্লে বিতর্কিত ধারাটির পুনরুজ্জীবনে সক্ষম হন।[১০৬]

নতুন পরিষদগুলি থেকে সরকারের চোখে বিপজ্জনক ব্যক্তিদের বাদ দেওয়ার ক্ষমতা দাবী করেছিলেন মিন্টো। সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত রাখার শর্তে বড়লাটের এই ক্ষমতা মানতে রাজী হলেন মর্লে। নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত রাজনৈতিক অপরাধীদের বাদ দেওয়া অনুচিত

বলে হবহাউস পার্লামেন্টে যে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তা মিন্টোর রোষাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। তাঁর যুক্তি ছিল—এটা মেনে নিলে মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনীতিকরা অনায়াসে পরিষদে ঢুকবেন ও ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা নষ্ট করতে সক্ষম হবেন। "ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতার প্রশ্নটি সমান মাপকাঠিতে বিচার হতে পারে না। ভারতবর্ষে আধুনিক রাজনৈতিক রীতিনীতি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছে অতি সম্প্রতি, আর তার সুশাসন অব্যাহত আছে শুধু মাত্র ব্রিটিশ কর্তৃত্বের মহিমার জন্য। লাজপৎ রায়ের মতো মানুষ যদি ভাইসরয়ের শাসন পরিষদে নির্বাচিত হন তাহলে তো গোটা ভারতবর্ষে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে।"[১০৭] সুতরাং নির্বাচনের পরে নয়, তার আগেই ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতার দাবীতে অনড় ছিলেন মিন্টো। তাঁর দাবী পূরণে মর্লে এবং অ্যাসকুইথ্ ইতস্তত করছিলেন, কিছুটা মার্কিন মতামত উপেক্ষা করতে না পেরে, আবার কিছুটা এই আশঙ্কার জন্য যে চরমপন্থীরা এর ফায়দা ওঠাবে। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে যে প্রস্তাবটা গৃহীত হয় তাতে বলা হলো: "সপরিষদ গভর্নর জেনারেল যদি কোনও ব্যক্তিকে তাঁর ব্যক্তিগত আচার-আচরণের জন্য জন-স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করে থাকেন তবে তিনি পরিষদে নির্বাচন-প্রার্থী হবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হবেন।" প্রস্তাবে 'নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত'—এই আপত্তিকর শব্দটি প্রয়োগ থেকে বিরত হয়ে মর্লে তাঁর উদারনীতির মান রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন।[১০৮] বস্তুত এতদ্বারা নির্বাচনের ব্যাপারে প্রার্থী বাছাই করার ব্যাপকতর ক্ষমতা দিলেন তিনি ভাইসরয়কে।[১০৯]

১৯০৯ সালের ২৫শে মে সংস্কার আইন পাশ হবার পরেও মর্লের ঝঞ্ঝাটের অবসান হয়নি। আগা খাঁ, বিলগ্রামী, আমির আলি প্রমুখ যে সমস্ত মুসলমান নেতা তখনও লণ্ডনে ছিলেন তাঁরা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচক-মণ্ডলীর ব্যবস্থাটা পুরোপুরি বাতিল করার জন্য জেদ করছিলেন। মিন্টোর টেলিগ্রাম থেকে এঁরা ভেবেছিলেন এতে সাধারণ নির্বাচক মণ্ডলীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, পৃথক-মুসলমান নির্বাচক মণ্ডলীর প্রশ্নটা গৌণ হয়ে গেছে। ২০শে মে তারিখে আরেকটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বড়লাট প্রকৃত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেন। সংরক্ষিত আসনে মিন্টো পৃথক মুসলমান নির্বাচক মণ্ডলীর নীতিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানদের যে আসন-সংখ্যা পাওয়ার কথা তার সঙ্গে যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে অসংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রে এবং মনোনয়নের ফলে লব্ধ আসনগুলি যুক্ত হলে মুসলমানরাই লাভবান হবে। যাই হোক, ১৯০৮ সালের ডেস্‌প্যাচে বর্ণিত আসন সংখ্যার থেকে বেশি আসন মুসলমানরা দাবী করে বসলেন। আবার শুধু এ সব আসনের জন্য তাঁরা পৃথক-নির্বাচক-মণ্ডলীর দাবী করলেন তাই নয়, তাঁদের নতুন বায়না হলো পৃথক নির্বাচনের নীতি প্রতিটি স্তরে অনুসরণ করতে হবে, এমন কি লোক্যাল বোর্ডও বাদ যাবে না। বিভ্রান্ত, বিব্রত ভারত-সচিবের কণ্ঠে এই বিলাপ শোনা গেল: "আমির আলি লোকটা অত্যন্ত আত্মম্ভরী এবং শূন্যগর্ভ বাক্যবাগীশ।"[১১০] এঁদের সম্পর্কে বড়লাটের ব্যক্তিগত ধারণাও খুব ভাল ছিল না। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে, "উপরে ইউরোপীয় চাকচিক্য থাকলে কি হবে, আগা খাঁর মধ্যে সংস্কৃতির লেশমাত্রও নেই। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার চেয়ে, তিনি কফিখানার আদব-কায়দা সম্পর্কে বেশি ওয়াকিবহাল।" সিমলার মুসলমান ডেপুটেশন বা অন্য কারো কাছেই তিনি এমন অসমীচীন কোনও প্রতিশ্রুতিই দেননি। ১৯০৬ সালে তাঁর মনে একবারও এ চিন্তার উদয় হয়নি যে প্রবহমান ভারতীয় জন-জীবন থেকে মুসলমানদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছেন তিনি। সংস্কার সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই যখন নিছক আলাপ-আলোচনার স্তরে ছিল তখন নীতিগত

ভাবে তিনি কয়েকটি বিষয় মেনে নিয়েছিলেন মাত্র। তা ছাড়া নির্বাচন-পদ্ধতির পূর্ব-নির্ধারণ সম্ভব ছিল না এবং অঞ্চল বিশেষে তার মধ্যে পার্থক্যও ছিল অবধারিত। পঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সুতীক্ষ্ণ থাকায় সেখানে মিউনিসিপ্যাল ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্বাচনের জন্যও স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী ছিল আবশ্যিক, আবার অন্যত্র পৃথক নির্বাচনী-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণ ছিল বিরূপ। "মুসলমানদের আবেদনের উত্তরে আমরা যে সমস্ত সুপারিশ করেছিলাম তার মূল কথা ছিল সর্বাগ্রে তাঁদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার প্রবর্তন। এর দ্বারাই তাঁদের প্রতিনিধিত্বের যথোপযুক্ত অনুপাত রক্ষিত হবে। এর উপর সাধারণ আসনের ক্ষেত্রে তাঁদের আসনলাভ করার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা থেকেই গিয়েছিল এবং মনোনয়নের মাধ্যমেও কিছু আসন পাওয়া তাঁদের পক্ষে ছিল সুনিশ্চিত।" বড়লাটের কোনও সংশয়ই ছিল না যে মুসলমানদের ক্ষমতার যতটা ভাগ পাওয়া উচিত ঐ ব্যবস্থায় তাঁরা তার থেকে অনেক বেশি পাচ্ছেন এবং সরকার তাঁদের প্রতি আরও বদান্য হলে হিন্দুদের মধ্যে বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠবে।[১১১] "মুসলমানদের অত্যধিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এই কারণে সুরেন্দ্রনাথ তো তখনই 'রণং দেহি' মনোভাব দেখাতে শুরু করেছিলেন।"

সরকার আশ্বস্ত হয়েছিলেন এ কথা ভেবে যে মুসলীম লীগ ১৯০৮ সালের অক্টোবরে নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিল। লীগের হিসেব মতো সংস্কারোত্তর ইম্পিরীয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মুসলমান-সদস্য সংখ্যা ১১ হওয়ার কথা : (ক) ৫ জন নির্বাচিত হবেন পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী থেকে, (খ) ৫ জন যুগ্ম নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে এবং (গ) অন্ততপক্ষে ১ জন মনোনয়নের ফলে। আরও বেশি আসনের দাবী করা থেকে মুসলমানদের নিরস্ত করার জন্য সরকারকে এ কথা ঘোষণা করতে হয়েছিল যে রিফর্মস অ্যাক্ট-এ আসন-সংখ্যা বেঁধে দেওয়ার ফলে অন্যান্য শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে মুসলমান সদস্যদের অনুপাত আর বাড়ানো অসম্ভব। তা ছাড়া মুসলমানরা তো আশাতিরিক্ত আসনই পাচ্ছে। মর্লেকে মিন্টো এই পরামর্শ দিতেও পিছপা হননি যে আসন সংক্রান্ত বিষয়ে মুসলীম লীগের দুই গোষ্ঠীর—আলি ইমামের নেতৃত্বাধীন এবং আমির আলির অনুগামীদের—মধ্যে মতদ্বৈধতার পূর্ণ সুযোগ তিনি যেন গ্রহণ করেন। "আমির আলি এবং আগা খাঁ—এই দুই ভদ্রলোক নিজেদের মত প্রচারেই ব্যস্ত এবং ইংলণ্ডে এঁরা কিছুটা প্রভাব বিস্তারও করেছেন। তবে ভদ্রতা বজায় রেখে এঁদের উপেক্ষা করাও চলে।"[১১২]

সিমলাতে প্রদত্ত মিন্টোর তথাকথিত প্রতিশ্রুতি বিষয়ে মর্লের পরিষদ সদস্য থিওডোর মরিসনের 'নোট' এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে অপর সদস্য কে· জি·গুপ্ত মিন্টোর দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করেছিলেন। শ্রীযুক্ত গুপ্তের অভিমত ছিল এই যে "মুসলিম নেতৃবর্গ, এবং মরিসন ও লোভাট ফ্রেজারের মতো যাঁরা তাঁদের সমর্থন করেন, তাঁরা পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে-বলা কিছু অসতর্ক উক্তির সদ্ব্যবহার করে মুসলমানদের দাবীদাওয়াগুলিকে অযথা ফাঁপিয়ে তুলছেন। প্রকৃত রাজনীতিতে এক সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে, অপর একটা সম্প্রদায়ের উপর অতিরিক্ত উদারতা বর্ষণ অন্যায়।"[১১৩] বিলটির উপর তৃতীয় দফার আলোচনার সময় ব্যাল্‌ফুর ঘোষণা করেছিলেন, "সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী ব্যবস্থার পত্তন প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের সঙ্গে খাপ খায় না। এ জাতীয় ব্যবস্থা মেনে নিলে দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। হিন্দুদের (ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোনও সম্প্রদায় যদি ভবিষ্যতে তাদের সংখ্যার কথা

বিস্মৃত হয়ে পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবী করে বসে, তা হলে আজকে মুসলমানদের ক্ষেত্রে যে অনুগ্রহ দেখানো হচ্ছে, ঠিক তেমনি করেই তাদের দাবী মানতেও সরকার বাধ্য হবেন।" মুসলমানদের দাবীর সমর্থনে রোনাল্ডসে পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্তানে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যার কথা উল্লেখ করলে ব্যাল্‌ফুরের মতো স্থিতধী রাজনীতিকও এই তীক্ষ্ণ মন্তব্য না করে পারেননি যে, "প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কোনও তত্ত্ব এই শিক্ষা দেয় না যে একটা দেশের জনসংখ্যার একটা অংশকে বাড়তি সুযোগসুবিধা দেওয়া উচিত কেন না তাঁরা যে দেশে বাস করেন তার বাইরেও তাঁদের ধর্ম বহুল-প্রচারিত।"[১১৪] ব্যাল্‌ফুরের দৃষ্টিভঙ্গী এটাই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে অন্তত একজন 'কনজারভেটিভ' সমস্ত 'লিবারেল'দের থেকে বেশি বিবেকবান ছিলেন।

এদিকে লণ্ডনে আমির আলি যে অন্যায় আবদার নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছিলেন তা ব্যর্থ করে দেবার জন্য মিন্টো সিমলাতে কয়েকজন মুসলমান নেতার সঙ্গে মিলিত হন। এঁরা মুসলমানদের জন্য ৫টির বদলে সর্বসমেত ৬টি আসনের দাবী জানান এবং এর বিনিময়ে সর্বস্তরে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দাবী ছাড়তে রাজী হন। আমির আলি যে পরিকল্পনা করেছিলেন তাতে মুসলমানদের জন্য ৭টি সংরক্ষিত আসনের ও শুধু পৃথক নির্বাচনের উল্লেখ ছিল। মিন্টো ৭টি আসন জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানদের পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে করতেন। তাঁর মতে সাধারণ আসন ছেড়ে দেওয়া মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। তা ছাড়া রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাধারণ ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালে ভুল করবেন তাঁরা। তাঁদের এই বিশেষ সুবিধাদানের চেষ্টা করলে হিন্দুদের কাছ থেকে প্রবল বাধা আসবেই।

ঠিক এই সময়ে লর্ড কিচেনারের একটা বিরক্তিকর অপচেষ্টার ফলে মুসলমান নেতাদের কিছু বাড়তি সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু বা মুসলমানদের প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ না জেনেই তিনি হঠাৎ অতিরিক্ত মুসলমান-দরদী হয়ে গেলেন এবং তাঁদের জন্য ৮টি সংরক্ষিত আসন ছাড়াও আরও কিছু অসংরক্ষিত আসনের সুপারিশ করে বসলেন। শাসন-পরিষদ এই দাবী প্রত্যাখ্যান করলেও সামরিক বাহিনীর অধ্যক্ষের এ জাতীয় রাজনৈতিক 'অ্যাডভেঞ্চার' মুসলমানদের জন্য মনোনয়নের মাধ্যমে আরও ২টি আসনের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে দিয়েছিল। ডানলপ স্মিথকে আলী ইমাম যে চিঠি দিয়েছিলেন (১৪ই জুলাই, ১৯০৯) এবং লক্ষ্ণৌতে মুসলীম লীগের অধিবেশনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মুসলমানরা—(১) ৬টি সংরক্ষিত আসন (বোম্বাই, মাদ্রাজ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম, বাংলা, উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্জাব), (২) ৬টি প্রদেশের আইন পরিষদের বেসরকারী সদস্যরা যে ১২ জনকে নির্বাচিত করবেন তার মধ্যে অন্তত ২টি (অসংরক্ষিত আসন — পঞ্জাব এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম থেকে ১টি করে), (৩) প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের ভূস্বামীরা যাঁদের নির্বাচিত করবেন তাঁদের মধ্যে অন্তত দুটি (১ টি পঞ্জাব ও ১টি বোম্বাই) আসন লাভের আশা করতেন। এ ছাড়াও তাঁদের আশা ছিল যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান থেকে একজন মুসলমান প্রতিনিধিকে বড়লাট মনোনীত করবেন। মিন্টো এটাই বলতে চেয়েছিলেন যে অসংরক্ষিত আসন থেকে ২টি, ৬টি সংরক্ষিত আসন এবং ২টি মনোনীত সদস্যের আসনের ব্যবস্থা মহত্ত্বের পরিচায়ক। মিউনিসিপ্যাল এবং জেলা বোর্ডে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর যে দাবী আমির আলি এবং আগা খাঁ করেছিলেন তা মিন্টো সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দেন। আঞ্চলিক ব্যাপারেও সাম্প্রদায়িকতার দাবী মেনে নিলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ

হবে সে বিষয়ে বড়লাটের কোনও সংশয় ছিল না।

ইতিমধ্যে লণ্ডনে আমির আলি 'ডেলিগেশন' যথারীতি থিওডোর মরিশনের (যিনি বিলগ্রামীর থেকেও উগ্রতর মুসলমান সমর্থকের ভূমিকা নিয়েছিলেন) সাহায্য পুষ্ট হয়ে, অক্লান্ত ভাবে চাপ দিতে থাকেন। সর্বস্তরে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী প্রবর্তনের যে প্রতিশ্রুতি মিন্টো তাঁদের দিয়েছিলেন বলে মুসলমানরা মনে করতেন তা পূরণের জন্যই তাঁদের এই আন্দোলন। মিন্টো 'পাউণ্ড অফ্ ফ্লেশ' দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু মরিশন বায়না ধরেছিলেন, 'দু পাউণ্ডে'র জন্য। ক্রুদ্ধ ভারত সচিব লিখলেন, "এই ব্যাপারে 'প্রতিশ্রুতি' শব্দটা ব্যবহারেই আমার আপত্তি। বিষয়টা নিষ্পত্তি করার চেষ্টায় একটা সময়ে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীটা (ওঁদের) জানিয়ে দিয়েছিলাম মাত্র। আর এটাও আমরা করেছিলাম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, আমাদের সদিচ্ছার নিদর্শন হিসেবে, মুসলমানরা আমাদের প্রতি কোনও বিশেষ বিবেচনা প্রদর্শন করবেন তার বিনিময়ে নয়।"[১১৫] কে· জি গুপ্ত যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে মরিশনের অন্যায্য দাবীর উত্তর দিয়েছিলেন। ভারত সরকারের ২২শে জুলাই, ১৯০৯ তারিখের 'ডেস্‌প্যাচের' উপর ভারতসচিবের পরিষদে ভোট গ্রহণের সময় উভয় পক্ষ সমসংখ্যক ভোট পাওয়ায় মর্লে তাঁর 'কাস্টিং ভোট' ('দ্য সোর্ড অফ মাই কাস্টিং ভোট') প্রয়োগ করে মুসলমানদের এই অন্যায় দাবী রুখে দেন।

কিন্তু এতো কাণ্ডের পরেও এই অশোভন বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটেনি। আগা খাঁ হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। মিন্টোর প্ররোচনায় আলী ইমাম এ সময় ইংলণ্ডে এসে আগা খাঁকে একটু নরম করার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের সুরাট ভাঙনের মতোই এ সময়ে মধ্যপন্থী এবং গোঁড়া মুসলমানদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্ট হয়েছিল, আর সরকারের আশঙ্কা হয়েছিল এই বিভ্রাটই হয়তো আসন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের পথ পিছল করে দেবে। ভারতসরকার নির্বাচন সংক্রান্ত যে নিয়মাবলী রচনা করেছিলেন কট্টর লীগপন্থীরা তার মধ্যে খুঁত আবিষ্কারে তৎপর হয়ে ওঠেন কেন না রেগুলেশন কমিটির সভাপতিত্ব করেছিলেন—এস পি সিংহ—একজন হিন্দু। এ ব্যাপারে তাঁরা শুধু 'দ্য টাইমস্' পত্রিকার চিরলের কাছ থেকেই সমর্থন পাননি, পার্লামেন্টের বিরোধী পক্ষেরও কেউ কেউ এঁদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত মিন্টোও এই মুসলমান গোষ্ঠীর আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। দ্বিধাগ্রস্ত, দিশেহারা মর্লে তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করতে পারেননি। 'তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও তিক্ততা জীইয়ে রাখতে চান নি', এ কথা মুখে বললেও আসলে কিন্তু তাঁকে পিছু হটতে হয়েছিল। জুলাই মাসেব ডেস্‌প্যাচে মিন্টো (নিতান্তই সাধারণ অর্থে) ৮টি আসন দেবার কথা উল্লেখ করেন। সিমলা-সাক্ষাৎকারের পর 'প্রতিশ্রুতি' শব্দটিকে কেন্দ্র করে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল, তারপর আর ঐ শব্দটির পুনর্ব্যবহারে তাঁর সাধ ছিলো না। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি আরও নতি স্বীকারের ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব বজায় রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু মর্লের দুর্বলতা তাঁর পায়ের তলার মাটি আলগা করে দিতে থাকে এবং তার ফলে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে তাঁকে আবার ৮টি আসনের 'গ্যারান্টি' ('প্লেজ' শব্দটা এড়িয়ে যাবার জন্য) দেবার কথা চিন্তা করতে দেখা গেল (৬টি সংরক্ষিত, ২টি মনোনীত)।[১১৬] খসড়াতে অবশ্য বিষয়টি উল্লিখিত হয়নি এবং তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল 'বর্তমান রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে বয়ান-রচনায় সতর্কতা অত্যাবশ্যক।' তবে ঘটনা স্রোতের এ ধরনের গতি-প্রকৃতির মধ্যে মিন্টোর অস্বস্তি লুকোনো থাকেনি।

"সাধারণভাবে সমস্ত ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সম্যকভাবে বিচার-বিবেচনা না করেই ইংলণ্ডে মুসলমানদের দাবী দাওয়াকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে মনে হচ্ছে হিন্দুদের স্বার্থ এবং সারা দেশে তাঁদের প্রভাবের কথা সকলে বিস্মৃত হয়েছেন। সংখ্যালঘু মুসলমানদের একতা, শক্তি ও সংহতির কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়—তাঁদের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব দেখাতে গিয়ে আমরা হয়তো এমন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সৃষ্টি করবো যার তুলনায় আমির আলি এবং আগা খাঁর তর্জন-গর্জন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে।"[১১৭] তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে "মর্লের পক্ষে আমির আলি, আগা খাঁ এবং চিরলের অভিমতকে এতো বেশি গুরুত্ব দেওয়াটা ঠিক হয়নি।" এ বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না যে, "ব্যক্তিগত স্বার্থই ছিল আমির আলির তৎপরতার আসল কারণ" এবং "ভারতবর্ষে আগা খাঁর প্রায় কোনও প্রভাবই ছিল না " আর চিরলকে তিনি "ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে পক্ষপাতদুষ্ট পর্যবেক্ষকদের অন্যতম" বলেই মনে করতেন। ইম্পিরীয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নতুন বিধান অনুযায়ী নির্বাচনের পর ২৭টি প্রতিনিধিত্বমূলক আসনের মধ্যে পৃথক এবং যুগ্মনির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে মুসলমানরা পেলেন ১১টি আসন। এর সঙ্গে মিন্টো আরও ১টা যোগ করলেন—মনোনীত সদস্যের আসন।[১১৮] কলকাতার একটা সান্ধ্য দৈনিকে উচ্চতম আইনপরিষদে সরকারের অবস্থার সঙ্গে 'লাইট ব্রিগেড'-এর তুলনা করে লেখা হয়েছিল :

'Moslems to right of them
Moslems to left of them
Moslems behind them
Volleyed and thundered.'[১১৯]

সন্দেহ নেই ভারত সচিব অবশেষে মুসলমানদের বিরক্তিকর বায়না থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন এবং লণ্ডনের জনমতও তুষ্ট হয়েছিল (এ বিষয়ে মর্লে খুবই আগ্রহী ছিলেন)। কিন্তু এটা অর্জন করতে হয়েছিল হিন্দুদের আঘাত করে। মর্লের পশ্চাদপসরণের ফলে লিবারেল পার্টির উপর কংগ্রেসীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং সরকারের এই সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের কুখ্যাত 'ডিভাইড অ্যান্ড রুলের' অভ্রান্ত প্রমাণ খুঁজে পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ উদারনীতির উপর আস্থা হারানোর পরিণাম কংগ্রেসে নরমপন্থীদের শক্তি হ্রাস এবং চরমপন্থীদের পুনরাবির্ভাব। এখন থেকে (হিন্দুদের মনে) ব্রিটিশ সদিচ্ছার উপর অনায়াস বিশ্বাসের স্থান নিয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত সন্দেহ। অপরপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব গড়ে উঠল। নিজেদের ভারতীয় না ভেবে শুধুমাত্র মুসলমান মনে করতে তাঁদের আর দ্বিধা রইল না। আরও দুঃখের বিষয়, মুসলমানগণ প্রায় নিঃসন্দেহ হলেন যে তাঁদের দাবীগুলি যতই অন্যায্য এবং আপোষহীন হোক না কেন ইংলণ্ডের একটা প্রভাবশালী মহলে (এঁদের দুর্ধর্ষ অ্যাসকুইথ্ সরকারও সমঝে চলতেন) তাঁদের জন্য আছে সুনিশ্চিত প্রশ্রয়। মুসলমানদের হাতে এই তুরুপের তাসটা তুলে দেওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই হিন্দুদের ঈর্ষা জাগে এবং মুসলমানদের দাবী দাওয়ার ক্রমবর্ধমানতা হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতি নষ্ট করে দেয়। কংগ্রেস ও ব্রিটিশ রাজের সম্পর্কের মধ্যে যে ফাটল ধরে ছিল তা গভীরতর হতে থাকে নির্বাসন-দণ্ড থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অধিকার বিষয়ে মিন্টোর অনমনীয় মনোভাবের জন্য। মুসলমানরা যেখানে চাওয়ামাত্র পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী, অসংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ও মনোনীত হবার অধিকার এবং এজন্য শিক্ষাগত ও সম্পত্তিগত যোগ্যতার অবনমন পাচ্ছে, তখন হিন্দু চরমপন্থীদের সামনে নিষেধের পাঁচিল তুলে ধরছেন

মিন্টো। মান্যগণ্য হিন্দুদের ক্ষেত্রেও শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকারগত যোগ্যতাকে অযৌক্তিকভাবে বাড়ানো হচ্ছে। এই পক্ষপাতী নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে উত্তরপ্রদেশের হিন্দুরা ১৯১০ সালে প্রাদেশিক হিন্দুসভা স্থাপন করে, হিন্দীভাষা এবং নাগরী লিপি প্রবর্তন ও শুদ্ধিপ্রথার সমর্থন করে। এখন থেকে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবোধ জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল ও দেশভাগের পরিণাম সূচনা করেছিল।

১৯০৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে মানিকতলার অস্ত্রাগার আবিষ্কার ও গোটা ভারতবর্ষে একই সঙ্গে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা সম্পর্কে দলিলপত্র পুলিশের হাতে আসার পর থেকেই সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে মিন্টোর মনোভাব অত্যন্ত কঠোর হয়ে ওঠে।[১২০] তবে, এখন আর কারো কাছেই এ তথ্য অজানা নেই যে সরকার মিথ্যেই ভয় পেয়েছিলেন। প্রাক্ বিশ্বযুদ্ধ পর্বে বাংলার সন্ত্রাসবাদ কয়েকজন রাজকর্মচারী ও গুপ্তচর নিধনেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। অরবিন্দের অনুজ এবং মানিকতলা গোষ্ঠীর নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও তাঁর অন্যতম সহকারী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন কী অকিঞ্চিৎকর ছিল তাঁদের প্রস্তুতি। বাংলার বাইরে যে তাঁদের প্রায় কোনও প্রভাবই ছিল না—তাও তাঁরা গোপন করেননি। বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা হয়তো দেশবাসীর কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার চেষ্টা করেছিলেন এবং আদালতে তাঁদের স্বীকারোক্তিগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত করেছিলেন যাতে সুপ্ত-জাতীয়-চেতনা উজ্জীবিত হয়, দেশবাসীর উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।[১২১] অন্য দিকে পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগ মিন্টোকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি। তাদেরই নাকের তলায় মানিকতলা গোষ্ঠীর অনায়াস তৎপরতা। তাদের অসতর্কতা ধরা পড়ে যাওয়ায় সরকারী ভর্ৎসনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তারা গোটা ব্যাপারটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে। মিন্টোও অযথা অত্যধিক উদ্বিগ্ন হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে আসন্ন বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। তখনও এদিকে ওদিকে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছিল। আলিপুর জেলে নরেন গোঁসাই (মানিকতলা মামলার রাজসাক্ষী)-এর হত্যা এবং 'কেশরী'তে তিলকের অনলবর্ষী রচনার পরিপ্রেক্ষিতে মিন্টোর পক্ষে 'করুণাময়-ক্যানিং'-এর ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব ছিল না।[১২২] ফৌজদারী মামলাগুলির নিষ্পত্তির ব্যাপারে অকারণ বিলম্ব এবং দণ্ডিতদের আপীল করার "অফুরন্ত সুযোগ দান" তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। বিশেষ আদালতের মাধ্যমে গুপ্ত-সমিতি ও ছাত্র সংগঠনগুলির মূলোচ্ছেদ ও নেতাদের (যেমন অরবিন্দ ও বারীন্দ্র) নির্বাসন ব্যাপারে বড়লাট বদ্ধ-পরিকর হন আর এ সমস্ত কিছুই খুব তাড়াতড়ি—সংস্কার প্রবর্তনের আগেই তিনি করতে চান।[১২৩] "আগে তেতো দাওয়াইটা খাওয়ানো দরকার, তারপর আমরা দেখবো কী ভাবে তিক্ততার অবসান করা যায়"—এই ছিল তাঁর মনোভাব।[১২৪] সুতরাং ইম্পিরীয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের একটি মাত্র অধিবেশনেই ভারতীয় ফৌজদারী-আইন সংশোধনী বিল (Act XIV of 1908) পাশ হয়ে যায়, যদিও, পরে জানা গেছে, একাধিক এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলর বিলটির বিরোধিতা করেছিলেন এবং চক্ষুলজ্জার খাতিরে রাসবিহারী ঘোষের মতো নরমপন্থী নেতারাও এর নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন।[১২৫] এর পর সরকার কালবিলম্ব না করে ন'জন বাঙালী নেতাকে—এঁদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং অশ্বিনীকুমার দত্ত—নির্বাসন-দণ্ড দেন। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উল্লাসকর দত্ত, হাইকোর্টে আপীলের ফলে, শেষ পর্যন্ত যাবজ্জীবন নির্বাসনে আন্দামানে প্রেরিত হন। ইতিমধ্যে আলিপুর জেলের মধ্যে নরেন গোঁসাইকে হত্যার জন্য কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৯ সালের জানুয়ারীতে ঢাকার অনুশীলন সমিতি,

বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতি," ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি এবং মৈমনসিং-এর সুহৃদ ও সাধনা সমিতি বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। এলিসিয়াম রোর গোয়েন্দা বিভাগের কবল থেকে ছোটোবড় কোনও প্রতিষ্ঠানই আত্মরক্ষা করতে পারেনি। সরকারের ভাবখানা ছিল এই রকম : দেশটাকে তো "স্যাঁতসেতে ভাবালুতার" দ্বারা শাসন করা যায় না ; ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩ নং রেগুলেশন অনুযায়ী সরকারী ক্ষমতাগুলি যে খুবই কার্যকর তা-ই বা অস্বীকার করা যায় কি করে ? ১৯০৯ এর মে মাসের মধ্যেই উৎফুল্ল মিন্টো 'হোম গভর্নমেন্টের' কাছে এই বিবরণ পাঠিয়েছিলেন যে ভগ্নোদ্যম, নেতৃত্বহীন কিছু সংখ্যক অর্ধোন্মাদ ছাড়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গুপ্ত সমিতিগুলি পরিচালনা করার মতো আর কেউ কোথাও নেই।[১২৬]

সন্ত্রাসের উত্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টির এই নীতি কিন্তু মর্লের পছন্দ ছিল না। যদিও ফ্রেজার, বেকার এবং অ্যাডামসনের সঙ্গে পরামর্শ করেই মিন্টো ৯ জন নেতাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, ভারত-সচিব এই ব্যবস্থা গ্রহণের পিছনে পুলিশের হাতটাকেই বেশি দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "আমরা যদি ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে দেখি তা হলে, আমার অনুমান, এই বিষয়টির মধ্যে স্টুয়ার্ট কিংবা প্লাওডেনের অথবা অন্য পুলিশের কোনও কর্তার হস্তক্ষেপ দেখতে পাবো।"[১২৭] ১৯০৯ এর ১০ই ফেব্রুয়ারী আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যার পর[১২৮] সন্ত্রাসের যে সমস্ত বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল তাতেও বিচলিত হন নি মর্লে। মিন্টো কিন্তু তাঁর জেদ বজায় রেখেছিলেন। নির্বাসন দণ্ডকে র‍্যাডিকালরা 'প্রিন্সিপ্‌ল অফ বাস্তিল' বলে উল্লেখ করতেন। মর্লে তাঁদের অনুসরণ করলেও রক্ষণশীলদের প্রশ্রয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত মিন্টো দমননীতিতে অটল ছিলেন। নির্বাসন-দণ্ড প্রাপ্তদের মুক্তিদান এবং নির্বাচন সম্পর্কিত বিধানাবলী-প্রকাশ একই সময়ে করার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে মর্লে এবং মিন্টোর বাক্‌যুদ্ধ চলেছিল সমস্ত অগষ্ট-সেপ্টেম্বর (১৯০৯) মাস ধরে। মিন্টো এই মত আঁকড়ে ছিলেন যে প্রথমোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে সময়টা 'অতীব অসুবিধাজনক কেননা মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীরা নতুন পরিষদগুলির নির্বাচনে নিশ্চয়ই অংশ নেবেন এবং যে নরমপন্থীদের স্বপক্ষে আনার জন্য সরকার এতো ব্যগ্র, তাঁদের বিপর্যস্ত করে দেবেন। সেক্ষেত্রে জন-স্বার্থ বিরোধী বলে তাঁদের নির্বাচন বাতিল করার জন্য তাঁকে ভেটো প্রয়োগ করতেই হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি যতোটা নিন্দিত হবেন তার অনেকগুণ বেশি নিন্দা তাঁর উপর বর্ষিত হবে তিনি ঐভাবে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য হলে।[১২৯] এদিকে সুরেন্দ্রনাথ (সে সময়ে লণ্ডনে ছিলেন) নির্বাচন সম্বন্ধে কোনও ঘোষণার আগেই অশ্বিনীকুমার দত্ত ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের মুক্তির জন্য ভারত-সচিবের কাছে আবেদন করেন। মর্লে (তাঁর আবেদনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে) দুঃখ করে বলেছিলেন যে, "ওঁদের আটক রাখার ব্যাপারটা আমার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বিষয়ে কথাবার্তাকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করে তুলবে।"[১৩০] মিন্টো তাঁর কাজের সমর্থনে যে সমস্ত রাজনৈতিক কারণের কথা বলেছিলেন (যেমন রাজানুগতদের উপর তার অশুভ প্রতিক্রিয়া) তা সবই অগ্রাহ্য করে মর্লে গোখলের কথা উদ্ধৃত করে এ বিষয়ে বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন যে (উল্লিখিত) নেতাদের কারারুদ্ধ করে রাখলে চরমপন্থীদের হাতেই জয়ের চাবিকাঠি তুলে দেওয়া হবে।[১৩১] গোখ্‌লে লিখেছিলেন, "সন্দেহ নেই বঙ্গ-বিচ্ছেদ বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করতে অস্বীকার করে এবং নেতৃবর্গকে কয়েদ রেখে সরকার বাংলার নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী গোষ্ঠীর অবস্থা বেসামাল করে দিয়েছেন। সমস্ত দেশে এ রকম একটা বিশ্বাস সর্বজনীন হয়ে উঠেছে যে সকলে না হলেও এঁদের কেউ কেউ নিরপরাধ এবং এঁদের দণ্ডিত করা হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে যে সরকার নিজ শক্তির

একটা প্রমাণ দিতে চান ।”[১৫২] মিন্টো অবশ্য গোখ্‌লের অভিমত মূল্যহীন এবং বিভ্রান্তিকর বলে তুচ্ছ করতে দ্বিধা করেননি, আর কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের মুক্তিদানের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার দায়িত্ব নিতেও তিনি অস্বীকার করেন । তাঁর বক্তব্য ছিল, “ওঁদের মধ্যে এই দু জনই সবচেয়েবিপজ্জনক, কেন না এঁরাই সন্ত্রাসবাদী দলগুলো সংগঠিত করেছেন, এবং সেগুলির আর্থিক সংগতি সম্ভব হয়েছে এঁদেরই চেষ্টায় । এঁদের যদি এখন ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে যে সমস্ত সমিতির এঁরা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেগুলি অল্পকালের মধ্যে এঁদের ঘিরে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ।”[১৫৩] রাগ নয়, নিতান্ত দুঃখেই সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, “মিন্টোর জেদ আসলে একটা সাংঘাতিক রাজনৈতিক ভুল ছাড়া আর কিছুই নয় । এর দ্বারা কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি, এটা কেবল ক্ষতিই করে চলেছে । বড়লাটের অমনীয়তায় কেউই ভয় পায় না, উল্টে তা চারিদিকে রাজনৈতিক অস্বস্তি এবং উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছে ।”[১৫৪] এই সময় লণ্ডনে কার্জন-উইলির (Wyllie)র হত্যা (জুলাই, ১৯০৯), তাঁর নিজের প্রাণনাশের চেষ্টা, (১৩ই নভেম্বর) এবং নাসিকের কালেক্টর এ এম জে জ্যাকসনের প্রাণনাশের ঘটনা (ডিসেম্বর) নিঃসন্দেহে মিন্টোর হাত শক্ত করে দিয়েছিল । নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর, ইণ্ডিয়ান ‘প্রেস অ্যাক্ট’ (১৯১০) এবং ‘প্রিভেনশন অব সিডিশাস মীটিংস অ্যাক্ট’ (১৯১০) দ্বারা বর্মাবৃত হয়ে মিন্টো বন্দী মুক্তির আদেশ দিয়েছিলেন । বাংলা-সরকারের সুপারিশ মতো আরও কিছু ব্যক্তির মাথায় যে নির্বাসন দণ্ড ঝুলছিল, তা-ও বাতিল করে দেন ভারত সরকার ।

ভারত-সচিব এবং ভারত সরকারের মধ্যে এ সময়ে যে পত্র-বিনিময় চলেছিল তার মধ্য থেকে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ওঁদের দুজনের কাছে নরমপন্থীদের সংজ্ঞা ছিল আলাদা । কংগ্রেসের বাইরে যে সমস্ত রাজানুগত, একটু-আধটু রাজনীতি-করা মানুষ ছিলেন, ‘মডারেট’ বলতে মিন্টো তাঁদেরই বুঝতেন । মর্লের চোখে কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ও গোখ্‌লের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসীরাই ছিলেন ঐ পদবাচ্য হবার যোগ্য । লাজপৎ রায় সম্পর্কে ভুল করার পরেও মিন্টো চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীকে সমার্থক মনে করতেন । যে হেতু ‘মডারেট’রা একটা শূন্যগর্ভ দল, সে কারণে তাদের দিয়ে চরমপন্থীদের রুখে দেওয়ার আশাও ভারত-সরকারের ছিল না । সুতরাং সুরেন্দ্রনাথকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে মিন্টোর বাধেনি । এই দৃষ্টিভঙ্গী সরকারকে নরমপন্থীদের সহযোগিতা লাভ থেকে বঞ্চিত করেছিল । যে পরিমাণ রাজনৈতিক বোধ ও স্বচ্ছ দৃষ্টি থাকলে তিলক, বিপিনচন্দ্র, লাজপৎ রায় এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের মতো মানুষদের সঙ্গে অরবিন্দ, বারীন্দ্রের মতো রাজনৈতিক নেতার তফাৎটা স্পষ্ট ভাবে ধরা যায় তা মর্লের যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল এবং ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের সঙ্গে চরমপন্থীদের যে বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না—তা-ও তাঁর জানা ছিল । তাঁর মনে হয়েছিল, আরেকটু সহৃদয়তা, কিছু উদারতর সংস্কার এবং বঙ্গ-ভঙ্গ রদের দ্বারা চরমপন্থীদের রাজভক্তে পরিণত করা না গেলেও তাঁদের উগ্রতা কিছুটা প্রশমিত করা যেতো । কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ সমস্ত কিছুই শুভ-ইচ্ছা মাত্রেই থেকে গিয়েছিল, এগুলিকে বাস্তবায়িত করার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় মর্লের ছিল না । নিজ বিশ্বাস এবং বিবেকের নির্দেশ অবিচলিতভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি ভারতসচিবের পক্ষে । বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা হয়েছিল আরও দু বছর পর । ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করলে মর্লের পক্ষে এ কাজটা হয়তো সংস্কার-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই করা যেত । কিন্তু মুসলমান প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা ও লর্ডস-এ রক্ষণশীলদের আক্রমণের ভয় তাঁকে নিথর করে দিয়েছিল । তাঁর নিরুদ্যমের পিছনে তৃতীয় কারণ, এ সময়েই হাউস অফ লর্ডস-এর শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা এবং

আইন-তৈরীর ক্ষমতার সীমারেখা নিয়ে পার্লামেন্টের দুই কক্ষের মতান্তর তীব্রতম হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত এ জন্য প্রতিরোধের আভাস পাওয়া মাত্র, মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলীর পরিকল্পনা তিনি ত্যাগ করেছিলেন। মর্লে ভালভাবেই জানতেন যে সমস্ত বিরোধিতার মূলে ছিল মুসলমানদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও অসহিষ্ণুতা এবং মিন্টো ও রিজলের কিছু অন্ধ-সংস্কার। তবু মরিসন এবং বিলগ্রামীর বিরুদ্ধে ম্যাকডোনেল ও কে· জি· গুপ্তকে তিনি যথোচিত সমর্থন করতে পরেননি। লোভাট্ ফ্রেজার এবং চিরলের বিরূপ সমালোচনা তাঁকে ত্রস্ত করেছিল। ফলে, ব্যক্তিগত ভাবে আমির আলি এবং আগা খাঁকে অত্যন্ত অপছন্দ করলেও এবং তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়েও ভারতসচিবের পক্ষে এঁদের উপেক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি। আইরিশ হোমরুলের জন্য যিনি নিজের রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন করতেও পিছপা হননি সেই গ্ল্যাডস্টোন উদারনীতির যে মহৎ ঐতিহ্য রেখে গিয়েছিলেন তার অনুসরণে অক্ষম হয়েছিলেন মর্লে। অত্যধিক কেতাবী হওয়ায় এবং প্রতিপক্ষের তর্জন-গর্জনকে অতিরিক্ত সমীহ করায় তিনি প্রায় কখনোই নিজের ধ্যান-ধারণাগুলিকে বাস্তবায়িত করতে পারেননি। এর ফলে রক্ষণশীল ভাবাদর্শের শক্ত ভিতের উপর দাঁড়ানো মিন্টো এবং কূটকৌশলী মুসলমান নেতাদের কাছে তাঁকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল।

১৯০৯ সালে প্রবর্তিত শাসন-সংস্কার কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব অল্প মানুষকেই খুশী করতে পেরেছিল। ১৯০৮ সালে মাদ্রাজ অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস মর্লের মিশ্র-নির্বাচিক-মণ্ডলী পরিকল্পনার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। মদনমোহন মালব্য এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, "আমাদের কর্তব্য লর্ড মর্লের প্রস্তাবগুলি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করা এবং প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে ভিন্নতর কোনও নীতির দাবী না তোলা।"

ঐ সময় একমাত্র গোখলেকেই অহেতুক উদারতার আস্ফালন করতে দেখা গিয়েছিল। নির্বাচনে হিন্দুদের দ্বারা পর্যুদস্ত হবার 'অমূলক-আশঙ্কা' থেকে মুসলমানদের মুক্তি দেবার জন্য পৃথক-নির্বাচক মণ্ডলীর সমর্থনে তিনিই এগিয়ে এসেছিলেন।[১৩৩] কিন্তু 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ বিলে'র উপর দ্বিতীয় দফায় আলোচনার সময় মর্লে যখন 'মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলী'র পরিকল্পনা বর্জন করে সর্বস্তরে পৃথক নির্বাচনের একেবারে উল্টো সুর ধরলেন এবং কমন্স-এ অ্যাস্‌কুইথ্‌কেও তাঁকে সমর্থন করতে দেখা গেল, তখন কংগ্রেসের পক্ষে তীব্র প্রতিবাদ জানানো ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। সুরেন্দ্রনাথ এবং মদনমোহন মালব্য ভারত-সচিবের এই পশ্চাদপসরণকে গোটা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক বলে নিন্দা করলেন। মিন্টোও ভারত-সচিবের এই অকস্মাৎ মত পরিবর্তনের রুষ্ট হয়েছিলেন, কেন না অসংরক্ষিত আসনের জন্য যৌথ নির্বাচনে মুসলমানদের বঞ্চিত করায় তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। সন্দেহ নেই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং (মুসলমানদের) 'ওয়েটেজ' দানের প্রতিশ্রুতি তিনিই দিয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলি ঠিক কী ভাবে বাস্তবায়িত করা হবে সে বিষয়ে আগাম কোনও আশ্বাস দিতে তিনি রাজী ছিলেন না।

নির্বাচনের বিধানাবলীতে অতিপ্রকট পক্ষপাতিত্বের অশোভনতা কিছু পরিমাণে প্রশমিত হয়েছিল। তবু ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস 'ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় তীব্র অসন্তোষ' প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়াও একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অত্যধিক পরিমাণে প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়ায় আপত্তি জানিয়েছিল। নির্বাচনের ব্যাপারে ভারত সম্রাটের মুসলমান ও অমুসলমান প্রজাদের মধ্যে অযৌক্তিক, অসন্তোষ উদ্রেককারী ও অবমাননাকর ভেদাভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াসেরও নিন্দা করা হয়েছিল। তা ছাড়া নির্বাচন-প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিরূপণের বিধান প্রভৃতি

নির্বাচন-সংক্রান্ত অন্যান্য নিয়মকানুনে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি যে অবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছিল তা-ও কংগ্রেস অধিবেশনে সমালোচিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল তাতে তাঁরা যে পঙ্গু এবং অক্ষম হয়েই থাকতে বাধ্য হবেন সে বিষয়েও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।[১৫৬] মতিলালের মতে এসব পরিষদ হবে "জী হুজুরদের সভা"।[১৫৭] গোখ্‌লে মর্লেকে অত্যধিক বিশ্বাস করায় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও কৃষ্ণস্বামী আয়ার বিরক্ত হয়েছিলেন।[১৫৮] লাজপৎ জানিয়েছিলেন পঞ্জাবের প্রতিবাদ। মুসলমানদের যে ভাবে "অন্যায়, দৃষ্টিকটু, পক্ষপাতিত্বপূর্ণ" প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তাতে গোখলেও ওয়েডারবার্ন-এর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[১৫৯]

লর্ড মর্লে কিছুমাত্র না রেখে-ঢেকেই ঘোষণা করেছিলেন, "শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের এই পর্ব যদি স্বাভাবিক বা প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারী শাসন প্রতিষ্ঠার পথ করে দেয় তাহলে অন্তত আমি নিজেকে এ বিষয় থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত রাখবো।" এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে এই সংস্কারের ফলে প্রতিটি প্রাদেশিক পরিষদ এবং ইম্পিরীয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রে ৬০ জন অতিরিক্ত সদস্যের মধ্যে ২৭ জন হবেন নির্বাচিত (মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে ৬টি) এবং ৩৩ জন মনোনীত সদস্যের মধ্যে অনধিক ২৮ জন হবেন সরকারী কর্মচারী। মর্লে ও মিন্টোর বাসনা অনুযায়ী কেন্দ্রের সরকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষার বন্দোবস্ত এভাবেই করা হয়েছিল। কেন্দ্রের আইনপরিষদে চার শ্রেণীর নির্বাচক-মণ্ডলী দেখা যায় : (১) প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, (২) সাম্প্রদায়িক (যেমন মুসলমান) (৩) ভূম্যধিকারী (৪) বিশ্ববিদ্যালয়, বণিক সমিতি প্রভৃতি বিশেষ শ্রেণী। ভূম্যধিকারী ও মুসলিম শ্রেণী থেকে কোন প্রদেশ কতজন পাঠাবে তাও ঠিক করে দেওয়া হয়। অধিকাংশ প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০ করা হয় (পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে ৩০), প্রতিটি ক্ষেত্রে বেসরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং বাংলায় নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রবর্তিত হলো। তবে প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে মনোনীত সদস্যরা যে সকলেই প্রায় সর্বক্ষেত্রে সরকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে হাত মেলাবেন তা ছিল নিশ্চিত।[১৬০] বাংলার আইন পরিষদে ৪ জন সদস্য ছিলেন ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধি, আর এঁরা যে সবসময় আমলাদের পক্ষ নেবেন তাও ছিল সুবিদিত। নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার দাবীটা যে একটা ছলনামাত্র তা বুঝতে কারো দেরী হবার কথা নয়। অ্যাস্‌কুইথের ভাষায়, "এই ব্যবস্থা সরকার নিয়েছিলেন ভারতীয় প্রজাদের কাছে এ ধারণা সৃষ্টির জন্য যে প্রাদেশিক পরিষদগুলি পুতুল নয়।" মুসলমান, ভূস্বামী শ্রেণী এবং ইউরোপীয়দের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র 'সেকেণ্ডারী' নির্বাচনের (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, মিউনিসিপ্যাল এবং ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডের সদস্যদের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে নির্বাচন) পদ্ধতিও চালু হয়। জমিদার কেন্দ্রে প্রার্থী হবার জন্য ন্যূনতম রাজস্বের পরিমাণ কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে আলাদা ছিল। মাঝামাঝি আয়ের জমিদারদের একেবারেই বাতিল করে দেওয়া হয়। ভারতীয় বণিকদের থেকে প্রার্থী নির্বাচন সম্পূর্ণরূপেই বড়লাটের ইচ্ছাধীন ছিল। বেশীর ভাগ কেন্দ্রে সম্পত্তি থাকা ছিল আবশ্যিক এবং তার পরিমাণ ছিল যথেষ্ট বেশী। শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপে হিন্দুর উপর যে সমস্ত শর্ত আরোপ করা হয় মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা কিন্তু উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শিথিল করা হয়েছিল। প্রার্থীদের বয়স-সীমা নির্ধারিত হয়েছিল ২৫ এবং মহিলাদের নির্বাচন-প্রার্থী

হবার অধিকার স্বীকার করাই হয়নি। 'অবাঞ্ছিত' ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করার জন্য যে বিধান রচিত হয়েছিল তার বয়ানটা ছিল এই রকম : "পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য নির্বাচনে অংশ নেওয়ার থেকে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের নিবৃত্ত করা হবে যাঁদের ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং আচার-আচরণ সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের বিচারে জনস্বার্থবিরোধী বলে বিবেচিত হবে।" আর, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে দেশবাসীর মনে যে রঙিন আশার সঞ্চার হয়েছিল ভাইসরয়ের আগাম ভেটো প্রয়োগের অধিকার তা পুরোপুরি নিরর্থক করে দেয়। চরমপন্থী তো বটেই, আমলারা যাঁদের অপছন্দ করতেন এমন বহু স্বাধীনচেতা নরমপন্থীকেও মর্লের 'নতুন বিধানে'র পরিমণ্ডলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, যদিও বহু বিজ্ঞাপিত এই বিধানের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় প্রশাসনের সঙ্গে আরও বেশি সংখ্যক দেশীয় মানুষের সংযোগ স্থাপনের পথ প্রশস্ততর করা।

লর্ড কার্জনের আশঙ্কা ছিল ভারতবর্ষের নবগঠিত পরিষদগুলি অচিরে পার্লামেন্টের ক্ষুদ্রতর সংস্করণে পরিণত হবে। কিন্তু 'দরবারে'র থেকে বেশী কার্যকর হওয়ার উপায় ছিল না সদ্যোজাত পরিষদের। ১৯০৮ সালে গোখলে এই আশায় উৎফুল্ল হয়েছিলেন যে "অর্থদপ্তর এবং সাধারণ প্রশাসনের উপর বিতর্কের মাধ্যমে আমারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হব এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণই বলবৎ হবে...নতুন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশ গৌণ ভূমিকা নিতে থাকবে, প্রাদেশিক সরকারগুলির গুরুত্বও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর প্রাদেশিক প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার উপায়গুলিও সহজে আমাদের হাতে এসে যাবে।"[১৪১] কিন্তু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে গোখলে যে কতো ব্যর্থ তা এক বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। বিরোধীপক্ষের ঝানু রাজনীতিবিদদের সুতীক্ষ্ণ সমালোচনার হাত থেকে আমলাদের রক্ষা করার জন্য 'সম্পূরক প্রশ্ন' করার অধিকার সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। প্রশ্ন যিনি উত্থাপন করেছেন একমাত্র তিনিই তা বিশদ করতে পারতেন। রাজস্ব ও ঋণ, ধর্ম, প্রতিরক্ষা বিদেশী রাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কর বিষয়ে বিতর্কের অধিকার পরিষদের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল। এখন জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ থেকে পরিষদকে বঞ্চিত করা হলো। অনুরূপ বিধিনিষেধের আওতার মধ্যে ছিল দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে আলোচনার স্তরে-আবদ্ধ বিষয় এবং বিচারালয়ের কর্তৃত্বাধীন বিষয়গুলি। কোনও একটা বিষয় জনস্বার্থ বিরোধী বা অন্যত্র উত্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—এই অজুহাতেও পরিষদকে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক থেকে নিবৃত্ত করা হল। নরমপন্থীরা বাক-স্বাধীনতা এবং সরকারী নীতি আলোচনার অধিকার নিয়ে রাজা প্রথম জেমস-এর প্রজাপুঞ্জের মতোই তুমুল হৈ চৈ শুরু করেছিলেন, গভর্নর জেনারেল অথবা গভর্নরগণ তাঁদের 'মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন 'ডিভাইন রাইট অফ রেগুলেশনস্'।

বাজেট তৈরীর মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অংশ নিতে খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলেন গোখলে, কিন্তু নতুন বিধান সে বিষয়ে তাঁকে খুব অল্প সুযোগই দিয়েছিল। ১৯০৯-এর আগে প্রদেশগুলির জন্য ব্যয়-বরাদ্দের হিসেব, অর্থ-দপ্তর কর্তৃক রীতিমতো পরীক্ষিত ও পরিমার্জিত করে, ভারতসরকারের কাছে পেশ করার প্রথা ছিল। পরে এগুলিই সাধারণ বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হতো। তারপর বাজেট ইম্পিরীয়াল কাউন্সিলে উত্থাপিত হতো (সমালোচনায় উল্লেখযোগ্য অংশ নিতেন গোখলে) এবং প্রদেশগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য অংশগুলিও প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে আলোচিত হতো। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও প্রস্তাব

গ্রহণ বা তার উপর ভোটগ্রহণ হতো না। নতুন বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশের 'বাজেটে'র খসড়াটা, ভারতসরকার কর্তৃক পরীক্ষান্তে (নতুন কোন পরিকল্পনার জন্য উর্ধ্বতন ব্যয়ের অঙ্ক নির্ধারিত হয়েছিল ৫০০০ টাকা), প্রাদেশিক পরিষদের একটা ছোট কমিটি (যার সদস্যদের অন্তত অর্ধেকের নির্বাচিত-সদস্য হওয়া ছিল আবশ্যিক) এটি আলোচনা করতেন। বাজেট পাশ করার আগে সরকার অবশ্য এঁদের মতামতটা বিচার-বিবেচনা করতে রাজী ছিলেন। এরপর গোটা দেশের জন্য বাজেটের খসড়াটা ইম্পিরীয়াল কাউন্সিলের কাছে পেশ করা হতো। কাউন্সিল সদস্যগণ প্রদেশগুলিতে অনুদানের জন্য নতুন কর প্রবর্তন এবং কেবলমাত্র ইম্পিরীয়াল ব্যয়-বরাদ্দ (প্রাদেশিক নয়) বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করতে পারতেন। এরপর বাজেটের দফা ওয়ারি আলোচনা হতো এবং প্রত্যেক দফার উপর সদস্যরা প্রস্তাব আনতে পারতেন। তারপর তা আলোচিত হতো ও ভোটে দেওয়া হতো। সব দফার আলোচনা হয়ে গেলে অর্থ বিষয়ক কাউন্সিল সদস্য (Finance Member) সমগ্র বাজেটটি পেশ করতেন এবং তখন কোন প্রস্তাব নিলেন কোনটা বাদ দিলেন তা ব্যাখ্যা করতেন। এসময় অবশ্য কোনও ভোট নেওয়া চলতো না। প্রদেশে আলোচনার অবকাশ ছিল ব্যাপকতর এবং বাজেট বিষয়ে প্রস্তাব আনা যেত, ভোটাভুটিও হতো। এতো বিধিনিষেধের বেড়াজালের মধ্যে কোনও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা সম্ভব ছিল না।

গোখ্‌লে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষীণতম পরিবর্তন সাধনও তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি। ১৯১০ সালের ১৮ই মার্চ তিনি বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের একটা প্রস্তাব আনেন এবং এই উদ্দেশ্যে একটা কমিশন গঠনের কথা বলেন। হোম মেম্বার তাঁকে প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করতে এবং তাঁকে নিজেই একটা বিল রচনা করতে বলেন। পরের বছর আনীত গোখ্‌লের বিলে বলা হয়েছিল এ বাবদ ব্যয়ভারের দুই তৃতীয়াংশ ইম্পিরীয়াল গভর্নমেন্টের বহন করা উচিত। ১৯১১-র শেষের দিকে তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেন যে "পরবর্তী শীতের আগেই সুপ্রীম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বিলটি বাতিল করে দেবে। আমি এটাও বুঝতে পারলাম যে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যই এই প্রস্তাবটির বিরোধিতায় উৎসাহী।" সিভিল সার্ভিসের ক্ষমতাগর্বী সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনেরও কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। মোহমুক্ত গোখ্‌লে বিলটা একটা সিলেক্ট কমিটির সামনে পেশ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন যে এটা তাঁর জানা আছে যে বিনা বাক্যব্যয়ে, অতিতৎপরতার সঙ্গে সেটি বাতিল করা হবে। সখেদে তিনি লিখেছিলেন : "আমি সব সময়েই এই সত্যটা অনুভব করেছি এবং সে কথা স্বীকারও করেছি যে আমরা কেবল ব্যর্থতা দিয়েই ভারতবর্ষের সেবা করতে পারি।" দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশগুলিকে ভারতবর্ষ থেকে 'ইন্ডেন্‌চারড্' শ্রমিক সংগ্রহের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য গোখ্‌লে যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন তাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। 'সিডিশাস মীটিংস্ বিল' (৬ই অগষ্ট, ১৯১০) এবং প্রেস অ্যাক্ট-এর নির্বিচার ও নির্মম প্রয়োগের যে সমালোচনা তিনি করেছিলেন তা কারো মনেই বিশেষ রেখাপাত করেনি।[১৮২] আসল কথা, সরকারের প্রতি দেশবাসীর সক্রিয় আনুগত্য প্রদর্শনের একটা ভাবগত পরিবেশ গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা তাঁর মতো নরমপন্থীরা করতে চেয়েছিলেন সরকার স্বয়ং তার সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিলেন। ব্যর্থমনোরথ 'প্রিন্স অফ দ্য মডারেটস' শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক জীবনের চূড়ান্ত অসাফল্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১৮৩]

গোখলের বেদনায় বহু ঘোষিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পিছনে সরকারের আসল মনোভাব সম্পর্কে নরমপন্থীদের হতাশা ধ্বনিত হয়েছে। কানাডায় প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন যে গোখলের জন্মভূমির পক্ষে একটা মহার্ঘ স্বপ্ন-মাত্র—সে কথা স্বয়ং মর্লেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।[১৪৪] ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ উদারনৈতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন আশা করে নরমপন্থীরা রাজনীতির একটা কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে বাঙালীদের কোনও অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত করা হয়নি—এই কারণে সুরেন্দ্রনাথ সংস্কারোত্তর অধ্যায়ের প্রথম নির্বাচন থেকে দূর সরে ছিলেন। তা ছাড়া সংস্কারগুলি সম্পর্কেও তাঁর প্রতিক্রিয়া মোটেই অনুকূল হয়নি। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন. "আমরা যে সমস্ত সুযোগসুবিধা বারবার সরকারের কাছে চেয়ে এসেছি এই পরিকল্পনার মধ্যে তার কোনোটার পূরণের চেষ্টা নেই। কোনও অর্থেই একে উদার বলা যাবে না। জাতীয় জীবনের অতীব জরুরী বহু সমস্যার সমাধান ব্যাপারে এই সংস্কার-প্রস্তাব আমাদের হতাশ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে আমরা চেয়েছিলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণাধিকার। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির মধ্যে কোনও কোনওটির উপরে—যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত বিভাগ—আমরা কিছু ক্ষমতালাভের আশা করেছিলাম। অর্থদপ্তরের উপর কিছু অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চেয়েছিলাম স্বশাসন কায়েম করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার পত্তন। আমরা সে সব কিছুই পাইনি।"[১৪৫] তিনি ভেবেছিলেন যে এর দ্বারা হয়তো সরকারের উপর প্রত্যক্ষ নয়, সামান্য কিছু নৈতিক চাপ সৃষ্টি করা যাবে। কিন্তু পরিসংখ্যানই বলে দেয় যে সুরেন্দ্রনাথকথিত এই নৈতিক-চাপের কোনও গুরুত্ব ছিল না। সংস্কারোত্তর পরিষদে ৫৯ শতাংশ বিধান রচিত হয়েছিল কোনও বিতর্ক ছাড়াই, মাত্র ৮টি বিলকে কেন্দ্র করে কিছুটা প্রতিবাদের উত্তাপ সৃষ্টি হয়, আর বেসরকারী উদ্যোগে উপস্থাপিত এবং গৃহীত বিলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫। ১৯১০-১৭'র মধ্যে ১৬৮টি প্রস্তাব আনা হয়। তার মধ্যে সরকার গ্রহণ করেন মাত্র ২৪টি। আইন তৈরীর কাজে প্রতি পদে কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগরক্ষা এবং কেন্দ্রের নির্দেশের প্রতীক্ষা প্রাদেশিক পরিষদগুলির কাজকর্মের মধ্যে এক ধরনের অনড়তা ও অবাস্তবতা সৃষ্টি করেছিল।[১৪৬]

আর কেন্দ্রে সরকারপক্ষের নিশ্ছিদ্র সংহতির সামনে বিরোধী পক্ষের সমস্ত তৎপরতাই ব্যর্থ হয়ে যায়। সরকারী সদস্যেরা প্রশাসন-রথের মসৃণ, অনায়াস পরিক্রমার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বিনা বাধায় বিধান তৈরী হয়েছিল একের পর এক ; এ বিষয়ে বিরোধীপক্ষের ভূমিকা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই অক্ষমতাই নরমপন্থীদের মনে জন্ম দিয়েছিল গাঢ় এক হতাশার। সম্ভবত এটা উপলব্ধি করেই মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, "মর্লে-মিন্টো সংস্কার যে নতুন কোনও নীতির সূত্রপাত করেছিল তা বলা যায় না। পরিবর্তন যেটুকু হয়েছিল তা মাত্রার, চরিত্রের নয়।" সম্প্রদায়-শ্রেণী-গোষ্ঠীস্বার্থ প্রতিনিধিত্বের যে পদ্ধতি ১৮৯২ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল তারই একটা ব্যাপকতর রূপ দিতে চেষ্টা করেছিল ১৯০৯-এর এই সংস্কার। কিন্তু এই কাজ করার সময় সংস্কারকগণ এশিয়ার নবজাগরণের তথ্যটি খেয়াল রাখেননি,উপেক্ষা করেছিলেন ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান আশা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলিকে। তাছাড়া মর্লে-মিন্টো সংস্কার এ দেশে নরমপন্থীদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ভীষণভাবে দুর্বল করে দেয়, অথচ চরমপন্থী উগ্রতা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় তাঁদের আন্তরিকতা ও আগ্রহের অভাব ছিল না। অধ্যাপক সি এইচ· ফিলিপস মন্তব্য করেছিলেন :মডারেটরা উন্মুখ ছিলেন সরকারের সেবার জন্য কিন্তু কার্যত তাঁদেরই খেদিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"[১৪৭] মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রকৃত ব্যর্থতা

নিহিত আছে এখানেই। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ককে সহযোগিতার দৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে তোলার এমন মোক্ষম সুযোগ ব্রিটেনের সামনে আর কখনো আসেনি। এদিক থেকে ১৯০৯-এ আমলাশাহীর জয় নিতান্ত শূন্যগর্ভ,[১৪৮] এমন কি ব্যর্থতার নামান্তর বলে মেনে না নিয়ে উপায় নেই।[১৪৯] এই অধ্যায়ের অব্যবহিত পরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এমন এক নাটকীয় পালা-বদল শুরু করেছিল যাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটা হয়ে ওঠে সর্বজনীন এবং তার সমাধান হয়ে ওঠে মর্মান্তিক।